বৈষ্ণবধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের সমালোচনা।

(সমালোচনা।)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-তত্ত্ব-প্রচারিণী সভার

সম্পাদক

ডাক্তার শ্রীপ্রিয়নাথ নন্দী-প্রণীত

কলিকাতা,

১১ নং আপার সার্কুলার রোড হইতে

ডাক্তার শ্রীনগেন্দ্রনাথ নন্দী।

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১৩১৮ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

"এতাং স আস্থায় পরাত্ম-নিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্ম্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমোমুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব॥"

সন্ন্যাসের অনতিপরেই ভাবে-বিহ্বল শ্রীশ্রীমহাপ্রভুকে নিত্যানন্দ প্রভু জাহ্নবী
যমুনা ভ্রম জন্মাইয়া শান্তিপুরের ঘাটে লইয়া যাইতেছেন।

পরম সুহৃদ্বর

উপনিষদ্‌-শাস্ত্রজ্ঞ, অকৃত্রিম ভগবদ্ভক্ত

শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী

মহাশয়ের শ্রীকরকমলে

প্রণয়োপহার স্বরূপ

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ

প্রগাঢ় শ্রদ্ধা

সহকারে

উৎসর্গ

করা

হইল।

প্রিয়নাথ

ভূমিকা।

দেবালয়ে আছে খ্রীষ্টিয়দিগের ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য একটা বক্তৃতা-মন্দির আছে। দেশ-সেবাব্রত ভক্তাস্পদ শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত দেবালয়ের স্থাপয়িতা। ভারতবর্ষ বহুকাল হইতে নানাবিধ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মে পরিপূর্ণ, এজন্য প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্বানুসন্ধানীদিগের পক্ষে আজ কাল কোন্ সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত শ্রেষ্ঠ, কোন্ সম্প্রদায়ের মত নিকৃষ্ট, তাহা নির্ব্বাচন করা নিতান্ত কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ধর্ম্মগত অবস্থার বিচার করিতে গেলে দেখা যায় যে, ইউরোপ ও আমেরিকার প্রধান প্রধান স্থানেও এই সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের সংখ্যা অত্যধিকরূপে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাই আজ কালকার সুসভ্য জগতের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বুঝিয়াছেন যে, ধর্ম্মের বন্ধনই একতার মূল, এই ধর্ম্মবন্ধন শিথিল হইয়া এই প্রকার সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাইতেছে, সভ্যজাতির মধ্যে একতা বা ভ্রাতৃভাব বা সখ্যভাব ততই বিনষ্ট হইয়া, এক সম্প্রদায়ের অপর সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতি হ্রাস হইতেছে, বরং এক অপরকে ঘৃণার চক্ষে দৃষ্টি করিতেছেন; ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলেই আজকাল সভ্যজগতে এত মতভেদ ও বিবাদ চলিতেছে। তাই আজকাল সর্ব্বদেশে সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় করিবার জন্য সুশিক্ষিত সমাজ বিপুল উদ্যোগ করিতেছেন। শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবুও এই মহদুদ্দেশ্য সাধনের একজন উদ্যোগকর্ত্তা। তিনি এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছেন অথচ যুবকের ন্যায় উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া নানা সম্প্রদায়ের লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়া তাঁহার দেবালয়ে বক্তৃতা দিবার জন্য লোক সংগ্রহ করিয়া থাকেন। তাঁহার এই কর্ত্তব্যানুষ্ঠান উপলক্ষে, তিনি এক দিবস আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বাঙ্গলা অথবা ইংরাজি [illegible] দেবালয়ে বক্তৃতা প্রদান করিতে অনুরোধ করেন। ঘটনাক্রমে আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য [illegible] প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় সেই সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি শশিপদ বাবু ও আমার মধ্যকার [illegible]। তাই [illegible] ভাষা দিয়া বিদেশে যোগ করিয়া বলিলেন, "বাঙ্গ কিম্বা ইংরাজিতে [illegible] বক্তৃতা না

করিয়া 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব' সম্বন্ধে আমাকে বক্তৃতা করিতেই হইবে। অতঃপর উহাই স্থির হইল। আমি তদনুযায়ী, "ব্রাহ্ম ধর্ম্ম এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের তুলনার সমালোচনা" নামে একটী প্রবন্ধ লিখিয়া যথাসময়ে দেবালয়ে পাঠ করিয়াছিলাম। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন; তাঁহাদের প্রায় সকলেই উহা শ্রবণ করিয়া বিশেষ সুখী হইয়াছিলেন, কিন্তু কয়েকজন ব্রাহ্মবাবু তাহাতে অসন্তুষ্ট হন এবং শ্রদ্ধাস্পদ শশিবাবুকেও তাঁহাদের নিকট হইতে কিছু গঞ্জনা সহ্য করিতে হয়, কেননা, উক্ত ব্রাহ্মবাবুরা প্রবন্ধ শুনিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়কে আমি ইচ্ছা করিয়া, তাঁহাদের 'পুল্‌পিটে' বসিয়া তাঁহাদিগকেই গালি দিয়াছি, এই প্রকার এক বাক্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হয় এবং ইহার সত্যতা নির্দ্ধারণের জন্য একটি নিরপেক্ষ ভদ্রলোক, শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র রায় মহাশয় নির্ব্বাচিত হইয়া পরদিন প্রাতে উক্ত প্রবন্ধের দোষকর অংশ দেখিবার জন্য আমার নিকট আইসেন। তিনি প্রবন্ধের আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলেন যে, ব্রাহ্মদিগকে কোন প্রকার নিন্দা করা হয় নাই। তাহাতেও উক্ত ব্রাহ্মবাবুগণ সন্তুষ্ট হইলেন না। সুতরাং শশিপদ বাবু বাধ্য হইয়া তাঁহার দেবালয় নামক সংবাদ-পত্রে ঘোষণা করিলেন যে, তাঁহাদের দেবালয়-মন্দিরে' প্রবন্ধ পাঠ করিবার যে নিয়ম আছে, তাহা আমি (গ্রন্থকার) অতিক্রম করিয়াছি। এই প্রসঙ্গে ইহাও বক্তব্য যে, শ্রীল প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত সভায় সভাপতির আসনগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রবন্ধ পাঠের শেষে, তিনি এই প্রবন্ধে কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গুহ্যভাব থাকাতে, উপস্থিত বিজ্ঞ সভ্যগণের মধ্যে কয়েকজনকে ইহার সমালোচনা করিবার জন্য আহ্বান করেন, কিন্তু উহা দেবালয়ের নিয়মবিরুদ্ধ বলিয়া কার্য্যে পরিণত হইল না।

এদিকে শ্রীল শিশির বাবু উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়া একখানি সূচনা পত্র লিখিয়া আমাকে এই প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। শ্রীল শিশির বাবুকে আমি নিজ অগ্রজের ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা করিতাম এবং তিনিও আমাকে তদনুরূপ স্নেহ করিতেন। আমার এবং আমার চিকিৎসা-প্রণালীর উপর তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। তাঁহার তিরোভাবের প্রায় তিনমাস পূর্ব্ব হইতে তিনি আমার

চিকিৎসাধীন ছিলেন এবং প্রত্যহই আমার সহিত ভগবৎ-প্রসঙ্গ হইত। এক-দিন এই পুস্তকের ৪৮।৪৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত "শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস-মাহাত্ম্য" সম্বন্ধে বৈদিক ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া, তিনি ভাবে এতই অভিভূত ও উত্তেজিত হইলেন যে, সবেগে আমার নিকট আসিয়া গলা জড়াইয়া ধরিয়া, আমার মুখে চুম্বন দিয়া, দরবিগলিতনয়নে নিতান্ত আর্ত্তির সহিত বলিতে লাগিলেন যে, "আমার প্রাণনাথের অন্যান্য লীলাবিলাসের এই প্রকার বৈদিক ব্যাখ্যা তোমায় করিতেই হইবে।" আমিও তাঁহার ভাবাবেগে নিতান্ত অধীর হইয়া উক্ত প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইলাম। এই পুস্তকে ১ হইতে ১৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত অর্থাৎ "শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক প্রস্তাব" পর্য্যন্ত দেবালয়ে পাঠ করা হয়। অতঃপর শ্রীল শিশির বাবুর অনুজ্ঞা প্রতিপালন করিবার জন্য ঐ প্রবন্ধ পুস্তকাকারে পরিবর্দ্ধিত করা হইল।

আমি ভগবদ্ভক্তিবিহীন এবং বৈষ্ণবাচার প্রতিপালনেও অক্ষম। ভগবদ্ভাবে অভিভূত হইয়া গ্রন্থ লেখা আমার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে সম্ভবপর নহে। কৃপাসিদ্ধ ব্যক্তিগণ ভগবদিচ্ছানুসারে কার্য্য করেন, সুতরাং আমার ন্যায় ঘোর বিষয়ী লোকের ভগবৎ-কৃপাপ্রাপ্তির আশা করা মরুভূমিতে পিপাসাতুরের জল অনুসন্ধানের ফলে মায়ামরীচিকা দর্শন করা মাত্র। এই পুস্তক আমার নিজের চিন্তা ও বিবেকপ্রসূত। যদি সুধীজনের নিকট ইহাতে কোন ভ্রমপ্রমাদ পরিলক্ষিত হয়, এবং শাস্ত্রযুক্তির দ্বারা যদি তাঁহারা আমাকে উহা অনুগ্রহ করিয়া বুঝাইয়া দেন, তাহা হইলে আমি কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা সংশোধন করিয়া লইব। আর সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিবার জন্য যে সমস্ত তীব্র সমালোচনা করা হইয়াছে, তাহা যদি বৈদিক শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইয়া থাকে, তবে তাহাও আমাকে জ্ঞাত করিলে, বিশেষ ধন্যবাদের সহিত বিরুদ্ধ অংশ পরিবর্ত্তন করিয়া দিব।

এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করা; তাহার মধ্যে বিশেষত্ব এই যে. শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু ভক্তিমার্গের যে পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, সেই পথ আধুনিক বিজ্ঞান এবং দর্শনসম্মত। শাস্ত্রানুসারে বিচার করিতে গেলে দেখা যায় যে, মহাপ্রভু-প্রদর্শিত ভক্তিমার্গ বা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম, বেদ, উপনিষদ্ এবং সমগ্র বৈদিক শাস্ত্রসম্মত। ইহার মধ্যে আর একটী

জটিল বিষয় বুঝিতে হইবে যে, আধুনিক অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তি শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণাদি সমস্ত পুরাণ এবং সর্ব্বপ্রকার তন্ত্রশাস্ত্র ঋক্, যজুঃ এবং সামবেদের ক্রিয়াকাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া মাত্র জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক্, মাণ্ডুক্য, শ্বেতাশ্বতর, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক্ ইত্যাদি কয়েকখানি উপনিষদ্ গ্রন্থ স্বতঃপ্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন ; ইহা ব্যতীত গোপাল তাপনী কিম্বা শ্রীকৃষ্ণোপনিষদের বাক্য, প্রমাণ-মধ্যে গণ্য করিতে চাহেন না। আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিগণের এই প্রকার বিশ্বাস, তর্ক ও বিচার দ্বারা বিদূরিত করা সহজসাধ্য নহে, কেননা, কালের অনুকূল স্রোতের শিক্ষার ফলে এই বিশ্বাস তাঁহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে ; এজন্য তাঁহাদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধ বিচার না করিয়া, আপত্তি-জনক শাস্ত্রের প্রমাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরাপত্তিজনক গ্রন্থের প্রমাণ দ্বারা, মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা হইয়াছে। ইহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হওয়া গিয়াছে, তাহা সুধীগণের বিচার সাপেক্ষ। আমার মনে এক দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, যাহা "সত্য", তাহা যে প্রকারেই পরীক্ষিত হউক না কেন, তাহা "সত্য" থাকিবেই থাকিবে (Facts cannot be lies) এবং সকল পরীক্ষাতেই "সত্যের" প্রতিষ্ঠালাভ হইবেই হইবে। এজন্য পৃথিবীস্থ সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মসম্প্রদায়-ভুক্তগণের সম্মুখে বজ্রনির্ঘোষে প্রচার করিব যে, শ্রীশ্রীমহাপ্রভু যদি পূর্ণ-পুরুষ হন এবং তাঁহার প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম যদি পূর্ণ-ধর্ম্ম হয়, তবে জগতের যে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মান্তর্গত ব্যক্তি যে কোন প্রকার জটিল তর্কবিতর্ক করিয়া, মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মই পূর্ণ-ধর্ম্ম।

এই প্রসঙ্গে আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ বহু পুরাতন বন্ধু শ্রীল প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট আমি বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। তিনি একজন অকপট ভগবদ্ভক্ত, সাম্প্রদায়িক হিসাবে তাঁহার সহিত মতভেদ থাকা স্বত্বেও, আমি তাঁহাকে শাস্ত্রানুসারে শান্ত-ভক্ত জ্ঞান করিয়া বিশেষ ভক্তি করি। এই পুস্তক প্রণয়ন-কালে তিনি অনেক বেদ ও উপনিষদ্-বাক্যের শঙ্কর ও সায়ন ভাষ্যের মর্ম্মানুবাদ করিয়া দিয়াছিলেন এবং

ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের যে যে বিষয় বৈষ্ণবধর্ম্মের সহিত মতভেদ আছে, তাহার অনেক বিষয় তিনি আমাকে অবগত করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত আমি সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করিতেছি যে, শাস্ত্রী মহাশয়ের প্ররোচনায়, প্রথমে প্রবন্ধাকারে আমি পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করি এবং শ্রীল শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের অনুজ্ঞানুসারে উক্ত প্রবন্ধসকল পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিবার জন্য ব্রতী হইলাম। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, শ্রীল শিশির বাবু এক্ষণে গোলোকগত, এজন্য আমার পরম-সুহৃদ্ শ্রীল শাস্ত্রী মহাশয়কে আমার অকৃত্রিম ভক্তির উপহার স্বরূপ এই ক্ষুদ্র পুস্তক উৎসর্গ করিয়াছি।

পরিশেষে বক্তব্য যে, পরম ভক্তিভাজন, প্রভুপাদ শ্রীল বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের নিতান্ত অনুরাগী-শিষ্য স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া গোস্বামী মহোদয়ের প্রদর্শিত"নাম-ব্রহ্ম"স্থাপন এবং ইহার উপকারিতা জনসাধারণকে বুঝাইবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় গুরুবলে বলীয়ান্ এবং অকপট ভগবদ্ভক্ত অতি বিরল; তাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছায় এবং আমার চেষ্টায়, যতদূর সম্ভব, 'হরিনাম' এবং 'নাম-ব্রহ্মের' বৈদিক ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সমালোচনা গ্রন্থে কোন বিষয়ের অবতারণা করিতে গেলে, ভাষা কিছু তীব্র হইয়া পড়ে, এজন্য গোস্বামী মহোদয়ের শিষ্যগণের নিকট বিনীত নিবেদন যে, মহদুদ্দেশ্যে তীব্র ভাষা প্রয়োগ করায় কোন দোষ গ্রহণ করিবেন না।

যাহা হউক, আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকের দ্বারা সাধারণের কিছুমাত্র উপকার দর্শিলে আমার শ্রম সফল জ্ঞান করিব, ইতি—

কলিকাতা,
সন ১৩১৮ সাল,
৫ই আশ্বিন।

শ্রীপ্রিয়নাথ নন্দী।

সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা
সূচনা	১
বৈষ্ণব ধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের তুলনায় সমালোচনা; শাক্ত, শৈব, গাণপত্যাদি সম্প্রদায় শ্রীভগবানের উপাসক নহেন; উহাদিগকে প্রাকৃতিক বন্ধনে পতিত হইতে হইবে; পরিণামবাদ; দুগ্ধের দৃষ্টান্ত;	২
সৃষ্টির কোন পদার্থ ভগবৎ-রূপে পরিণত হইতে পারে না; ব্রহ্মা, নারায়ণ ও মহাদেবকে কখনও শ্রীভগবান্ বলিয়া আখ্যাত করা যায় না;	৩
নবীন বেদান্তীদিগের মতে স্বর্ণের বিকার; বিজ্ঞান মতে পরিণাম দুই প্রকার; বিরুদ্ধ পরিণামের সহিত তাড়িতের দৃষ্টান্ত;	৩
স্বরূপ-পরিণতির সহিত চুম্বক ও জীবের তুলনা; ঈশ্বরের বিবর্ত্তবাদ বিজ্ঞানবিরুদ্ধ; পরিণাম-বাদ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের দৃষ্টান্ত;	৫
জীবের স্বরূপ-তত্ত্ব; তত্ত্বমসি বাক্যের বিচার; ছান্দোগ্যোপনিষদের দৃষ্টান্ত;	৬
বৃহদারণ্যকোপনিষদের দৃষ্টান্ত; ব্রাহ্মধর্ম্মে পরমেশ্বর-তত্ত্ব, জীব-তত্ত্ব ও প্রকৃতি-তত্ত্বের কোন বিচারগ্রন্থ নাই; আত্ম-প্রত্যয়ের কথা;	৭
প্রত্যক্ষ অনুমান-প্রমাণ অগ্রাহ্য; শব্দ-প্রমাণই স্বতঃপ্রমাণ;	৭
বেদ-প্রমাণ স্বতঃ প্রমাণ, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের দৃষ্টান্ত;	৯
সাকার নিরাকারের বিচার; ভগবদ্বস্তু সাকার, তাহার বৈজ্ঞানিক বিচার;	১০
দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ; অচিন্ত্যা ভেদাভেদ;	১৫
শ্রীকৃষ্ণ; শ্রীকৃষ্ণ শব্দের ধাত্বর্থ এবং ইহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা;	১৬
বৈদিক বচন;	১৭
শ্রীভগবানের অনন্ত নামের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণনামই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ;	১৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রীভগবান্‌কে স্থান এবং কালে আবদ্ধ করা যায় কেন?	১৯
শ্রীভগবান্‌ রসের স্বরূপ; শ্রীল শঙ্করাচার্য্যের মত; ব্রহ্মানন্দ ও ভগবদানন্দের ভেদ;	২০
জীব এবং ব্রহ্মের পার্থক্য; মনের বিজ্ঞান;	২১
মন; বুদ্ধিতত্ত্ব এবং অহঙ্কার-তত্ত্বের বিচার; ব্রহ্মানন্দ এবং ভগবদানন্দ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার-তত্ত্বের গম্য নহে; চিন্ময়তত্ত্ব প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে; শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের দৃষ্টান্ত;	২২
তুরীয় তত্ত্ব-বিচার; স্বপ্নের বিজ্ঞান;	২৩
মিথ্যা স্বপ্ন: একটী মেয়ের দৃষ্টান্ত;	২৪
সত্য স্বপ্ন; সর্ব্বদর্শীবৃত্তি; সাত্ত্বিক বিকার ও বিজ্ঞান;	২৫
সনাতন ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের দৃষ্টান্ত; চিন্ময়-রাজ্যে প্রবেশের পন্থা;	২৬
চিন্ময়-রাজ্যের সাধকগণের সাধন-প্রণালীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব;	২৭
সান্ত জীব কখন শ্রীভগবান্‌কে আকর্ষণ করিতে পারে না; দেব বা প্রেতযোনিকে আকর্ষণ করিবার সম্ভাবনা	২৮
কৃষ্ণ-প্রেম নিত্য-সিদ্ধ, শ্রীশ্রী-চৈতন্যচরিতামৃতের উপদেশ ও বিজ্ঞান; জীব মায়াবদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি ভুলিয়া যায়; শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের দৃষ্টান্ত;	২৯
মায়ামোহের বৈজ্ঞানিক বিচার;	৩০
যে বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, বিচার দ্বারা যাহার সত্তা মাত্র জ্ঞান হয়, তাহা সর্ব্ব-ইন্দ্রিয়ের বিষয় কি প্রকারে হইবে? ভগবদ্ভক্তির ক্রম-বিকাশ;	৩১
ভক্ত বিচার বুঝে না	৩২
ভক্তের তিনটী দশা;	৩৩
ব্রজের ভাবে ভগবত্তত্ত্বের সাধনা; শান্ত দাস্যাদি রসের বিচার;	৩৪
মধুর রসের কারণ স্থানীয় বাৎসল্য রস;	৩৮
বিভিন্ন রসের আদর্শ-ভক্ত-গণের নাম	৪০
শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং-ভগবান্‌ কিনা? মহাভারতের কলেবর বৃদ্ধি; বঙ্কিম বাবু 'বৃন্দাবনের কৃষ্ণ' মহাভারতে নাই বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন; যশোদা-	

সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা
নন্দন-কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্; নব্য মতে শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ ব্যাসকৃত নহে;	৪১
ব্যোপ্দেব ভাগবতের প্রণেতা; একই ভাগবতের অর্থ পরিবর্ত্তন করিয়া নানা প্রকার বৈষ্ণব সম্প্রদায় জন্মিয়াছে; শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থে কোন গোপিকার নাম নাই; গৌর-সুন্দরের আবির্ভাব ও তাঁহার মত; বেদ প্রমাণ স্বতঃ-প্রমাণ; বেদ ও বৈদিক শাস্ত্র ঈশ্বর-প্রণীত;	৪২
শঙ্করাচার্য্যের আবেশ হইতে পারে না, কারণ তিনি নির্ব্বিশেষ ঈশ্বরবাদী;	৪৩
শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ বেদমূলক; সনাতন গোস্বামী, মহাপ্রভুর আবেশে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের টীকা করিয়াছেন; শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, তিনি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করেন না;	৪৪
শ্রীবৃন্দাবনের কৃষ্ণ ও গোপ-গোপী সাধ্যবস্তু;	৪৫
শ্রীকৃষ্ণ এবং বৃন্দাবনের বিভুত্ব;	৪৬
উপনিষদে ব্রজের সাধন ভজন নাই কেন? বৃহদারণ্যকোপনিষদের প্রমাণ; মহাপ্রভু, সর্ব্বোৎকৃষ্ট বেদ-বিহিত ভজন সাধন শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন;	৪৭
রামানন্দ রায়ের নিকট মহাপ্রভু রাধাকৃষ্ণের বিলাসমাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করিলেন; লীলা-বিলাস নাট্যশালার সহিত তুলনা;	৪৮
ধীরললিত নায়ক-নায়িকার বৈদিক অভিপ্রায়;	৪৯
যেবা প্রেমবিলাস বিবর্ত্ত এক হয় অর্থাৎ না সো রমণ না হাম্ রমণী ভাব;	৫০
শ্রীরাধার অধিরূঢ় মহাভাব; বেদে অনেক দেবতার নামোল্লেখ আছে, বৈষ্ণবগণ তাহাদিগকে পূজা করিবে না কেন? তাহার বেদ-প্রমাণ; শ্রীভগবানের প্রতিমা হয় না, তাহার বেদ প্রমাণ;	৫১
বেদে দেবতার নাম; ভক্তগণ দেবতাকে ভক্তি করিবে, তাহার যুক্তি;	৫৩
স্বয়ং ভগবান্ পূর্ণ এবং সমস্ত প্রাকৃতিক পদার্থ তাঁহার আংশিক বিভূতি; ঋষিগণ	

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া স্বয়ং ভগবান্‌কে নানা প্রকার প্রাকৃতিক নামে অভিহিত করিয়াছেন ; ওঁ শ্রীভগবানের মুখ্য নাম, অন্য নাম গৌণ ; তাহার বেদ-প্রমাণ ; নাম এবং নামী অভেদ ;	৫৪
ওঁকারের অর্থ বেদ হইতে গ্রহণ করিতে হইবে ; ওঁকারের অর্থ গায়ত্রী ;	৫৫
ওঁ খং ব্রহ্ম—ইহার অর্থ ; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্রাদি দেবতা বেদানুসারে পূজ্য নহেন ; এই সমস্ত দেব-বাচক শব্দ শ্রীভগবানের গৌণ নাম ; বেদ পাঠ করিবার অধিকারী কে ? তাহার বেদ প্রমাণ ;	৫৬
ওঁকারের অর্থ ;	৫৭
গায়ত্রী মন্ত্র এবং তাহার অর্থ ;	৫৯
তৈত্তিরীয়োপনিষদের বর্ণিত গায়ত্রীর অর্থ ;	৬০
ওঁকার তত্ত্বের নানাবিধ উপনিষদের বর্ণিত ভাষ্য	৬৩
ওঁকার নামক শ্রীভগবানের মুখ্যনাম আশ্রয় করিয়া সকাম ও নিষ্কাম পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় ;	৬৪
ওঁকার তত্ত্বের বিভিন্ন মাত্রার উপাসনার ফল ; ওঁকার অর্থাৎ নামের মহিমায় সর্পের খোলস ত্যাগের ন্যায় সর্ব্ব-পাপ হইতে মুক্ত হয় ;	৬৫
নামের মহিমায় ব্রহ্মলোকে বা গোলোকে গমন করে ; নামের মহিমায় ভগবদ্দর্শন হয় ; নাম করিতে করিতে শরের লক্ষ্যের ন্যায় ব্রহ্মে তন্ময় হইতে হয় ;	৬৬
ওঁকার তত্ত্বের চারিটী পদ বা অবস্থা এবং প্রত্যেক পদের বর্ণনা ; বৈশ্বানর বা বিরাট পুরুষ ;	৬৮
চতুর্থ বা তুরীয় আত্মা ; ওঁকার-তত্ত্বের পদের অর্থ অর্থাৎ নামের মহিমা জানিলে তাঁহাদের কুলে অভক্ত জন্মে না ;	৬৯
সর্ব্বকার্য্যের প্রারম্ভেই ওঁকার উচ্চারণ করিয়া কার্য্যারম্ভ করিতে হয় ; ওঁকার পূজার বৈদিক বিধি ;	৭১

বিষয়	পৃষ্ঠা
মহাপ্রভুর মতে শ্রীভগবানের নামের উপাসনাই প্রধান ;	৭২
নামের উপাসনা কি প্রকারে হইবে? উদ্গীথ অর্থাৎ সামস্বর-সংযুক্ত নামের এবং উহার বিভূতির উচ্চ কীর্ত্তন করাই নামের উপাসনা ;	৭৩
ওঁকার তত্ত্বে, স্ত্রী এবং পুরুষ তত্ত্বের মিথুনীভাব ;	৭৫
মিথুনীভূত যুগল নাম জীবের একমাত্র উপাস্য ;	৭৭
ওঁকারের উপাসনা ঋক্, যজু, সাম এবং অথর্ব্ব বেদের আশ্রয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ,	৭৮
কৃষ্ণ নাম এবং স্বরূপ উভয়ে সমান ;	৭৯
গায়ত্রী মন্ত্র যে প্রকার ভগবন্নাম-বাচক, সেই প্রকার ভগবল্লীলাবাচক ;	৮০
ভূঃ ভূবঃ এবং স্বঃ, ইহার লীলাবাচক অর্থ ; অধিকারী ভেদে গায়ত্রীর অর্থ ; সিদ্ধাবস্থার পূর্ব্বলক্ষণ—বিকৃত-মস্তিষ্ক হইয়া নানা প্রকার প্রাকৃতিক পদার্থে ভগবদ্দর্শন ও তাহার বেদপ্রমাণ ;	৮১
কৃপাসিদ্ধ ভক্তকে শ্রীভগবান্ স্বীয় তনু দেখান, তাহার বেদ প্রমাণ ;	৮২
শ্রীভগবান্ বাক্য এবং মনের অতীত ; শ্রীভগবানকে সাধন করিতে হয় ; ওঁকারের তান্ত্রিক অর্থ ;	৮৩
তান্ত্রিক অর্থে ওঁকার মন্ত্র জপ করিলে ঘোর নরকে পতিত হইতে হয় ; ওঁকার-সংসৃষ্ট মিথুন-যুগল রাধাকৃষ্ণ নামে অভিহিত হইলেন কেন? শ্রীভগবান্‌কে বৈষ্ণবেরা নন্দ-সুত বলিলেন কেন ?	৮৪
স্বয়ং ভগবান্ তন্ত্র এবং পুরাণ প্রকাশ করেন না ;	৮৮
স্বৎ স্বরূপ তুরীয় যুগল পূর্ণানন্দ-ময় ও পূর্ণানন্দময়ীকে রাধাকৃষ্ণ বলিয়া অভিহিত করেন ; ওঁকার মিথুনস্থ বাক্-প্রাণ, জড়শক্তি নহে ;	৮৯
গৌণ-প্রাণ ; মুখ্য-প্রাণ ; মন ভাবময় ;	৯০
ওঁ-সংসৃষ্ট স্ত্রীতত্ত্ব এবং পুরুষতত্ত্ব সর্ব্ব-ইন্দ্রিয় ও মনের আশ্রয় ; সমস্ত বিশ্বের সার এই স্ত্রীতত্ত্ব স্বধা নামে তুরীয় মিথুনে অবস্থিতি করে ;	৯১

বিষয়	পৃষ্ঠা
স্বধা কাহাকে বলে; ইচ্ছা শব্দের ব্যাখ্যা;	৯৩
ওঁকার তত্ত্বের চরমবিজ্ঞান; 'হরে কৃষ্ণ' নামের ব্যাখ্যা; 'হরে কৃষ্ণ নামের' রাধা-তন্ত্রের ব্যাখ্যা;	৯৪
তুরীয় অবস্থায় শ্রীভগবান্ ওঁকার নামে অভিহিত হন, তাহার বেদপ্রমাণ;	৯৮
ভাগবতে নন্দসুত বলিল কেন?	৯৯
ভাগবতে বেদের ভাষ্য; গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ পুরাণ ও তন্ত্রের প্রমাণ অগ্রাহ্য করে;	১০০
ভাগবত একটী বৈদিক ইতিহাস; বৃন্দাবন-লীলায় ভগবত্তত্ত্ব; ভগবৎ সাধনার প্রয়োজন;	১০১
বেদ এবং পুরাণে শ্রীভগবানের প্রকাশ-বিশেষে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম হইয়াছে; প্রথম পুরুষ; দ্বিতীয় পুরুষ; তৃতীয় পুরুষ; তুরীয় ভগবান্;	১০২
ভগবদ্ধর্ম্ম ও লীলা যখন জীব বুঝিল না, তখন মহাপ্রভুর আবির্ভাব; গুরুর প্রয়োজন;	১০৩
মায়ামোহাবদ্ধ ভক্তের কখন ভগবদাবেশ হয় না বা ভগবদাদেশ প্রাপ্তি হয় না; রাসের রাধাকৃষ্ণ তুরীয় ভগবান্; গোপীগণ অনন্ত ভাবময়ী;	১০৪
সর্ব্বজগতের সার শ্রীভগবান্; মাণ্ডুক্যোপনিষদের বচন; অভিন্ন নিমিত্ত-উপাদান-কারণ-স্বরূপ তুরীয় ভগবান্; বেদ-প্রকাশক ঋষিদিগের প্রতি ভক্তি না থাকিলে বেদার্থ বুঝা যায় না;	১০৫
বৃহদারণ্যকোপনিষদের বচন; জ্ঞানে যোগকর্ম্মে ভগবান্ পাওয়া যায় না;	১০৬
হরিভক্তি-বিলাসে রাসপূজার বিধি নাই;	১০৮
আত্ম-তত্ত্ব-বিচার; সন্ন্যাসী, ভৈরবী, অধ্যাপক পণ্ডিতাদির বিচার;	১০৯
চক্রস্থিত তান্ত্রিক দিগের আচার ব্যবহার; কপটাচারীগণ যে সমাজের নেতা, তাহার সংস্কার বড় দুরূহ কার্য্য;	১১০
যে তত্ত্ব সপ্রকাশ নহে, তাহা পরমাত্মা নহে, অহং জ্ঞানের বিষয় জীব;	১১১
অবতার বাদ; অবতার যুক্তি-	

বিষয়	পৃষ্ঠা
তর্কের বিষয় নহে, উহা জ্ঞান এবং কৃপা সাপেক্ষ ;	১১৩
অবতারের কারণ	১১৫
পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আর্য্য জাতির বাস ছিল না ; বৌদ্ধ এবং জৈনধর্ম্মের বহু পূর্ব্বে তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত ছিল ;	১১৬
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থানুসারে তান্ত্রিক আচার গ্রহণ করিলে কেহ পতিত হয় না ; নব্য যুবকদিগের নিকট কপটাচারীদিগের কার্য্য প্রত্যক্ষ করিতে উপদেশ ;	১১৭
নাটকে কামকে প্রেম বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে ;	১১৮
জৈন ধর্ম্মের আবির্ভাবের কারণ ; অজ্ঞানতা বশতঃ কর্ম্মকাণ্ডের প্রাধান্য বোধে জীবহিংসা প্রবল হয় ;	১১৯
পুরাণের আবির্ভাব ; বিষ্ণু পুরাণের সৃষ্টি ; সুধন্বা রাজার সভায় শঙ্করাচার্য্যের বিচার ; মায়াবাদ বেদবিরোধী ; বুদ্ধ শব্দের অর্থ ; বৌদ্ধমত ;	১২০
সর্ব্বশূন্য-বাদী ; যোগাচারী—বস্তুর জ্ঞান অন্তরে হয় ; সৌত্রান্তিক—পদার্থের একদেশ প্রত্যক্ষ হয় ;	১২১
বৈভাষিক—পদার্থের বাহ্যজ্ঞান হয়, আভ্যন্তরিক জ্ঞান হয় না ; বৌদ্ধদিগের পুরাণের গল্প ; শঙ্করাচার্য্যের সহিত বৌদ্ধদিগের বিচার ; বৌদ্ধমত নির্ব্বাণমুক্তি ;	১২২
শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণ দ্বারা অন্যান্য সম্প্রদায় কলুষিত হইয়াছে ;	১২৩
বৌদ্ধ-তান্ত্রিক; বল্লাল সেন প্রথমে বৌদ্ধ-তান্ত্রিক হন, পরে হিন্দু-তান্ত্রিক হন ; বল্লালের সময় ব্রাহ্মণেরা কথন কথন যজ্ঞোপবীত ফেলিয়া দিলেন ? লক্ষ্মণ সেন আইন দ্বারা তাহা নিবারণ করেন ;	১২৪
মুসলমান রাজাগণ হিন্দুদিগের দ্বারা রাজ্যশাসন করিতেন ; লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের পর মহাপ্রভুর আবির্ভাব পর্য্যন্ত তান্ত্রিকদিগের বীভৎস আচার ;	১২৫
চক্রের সর্ব্ববর্ণ এক ; তন্ত্রবচনের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হয় না ;	১২৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
‘জ্ঞানসংকলনী’ মতে বেদ পুরাণকে বেশ্যা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে ;	১২৭
বৌদ্ধদেশে স্ত্রীলোকের সতীত্ব ধর্ম্মের গৌরব নাই ;	১২৯
মহারাজা আদিশূরের পিতার ঠিক নাই ; বল্লাল সেন ক্ষেত্রজ পুত্র ; কলিকালে ক্ষেত্রজ পুত্র নিষেধ ;	১৩০
তান্ত্রিক বিপ্লব	১৩১
আধুনিক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ কেহ পরমেশ্বরের উপাসনা করেন না ; নবদ্বীপে বিদ্যা পাঠ ;	১৩২
বৈষ্ণবগণও এক প্রকার দক্ষিণাচারী তান্ত্রিক ছিলেন ; বৈষ্ণবগণ এখনও তান্ত্রিক ভাবে পূজা করেন ;	১৩৩
মহাপ্রভু তন্ত্র এবং পুরাণ অবলম্বন করিয়া ভগবদ্ভক্তি জগৎকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন; গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মে সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় আছে ;	১৩৪
অবতারগণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের উপাস্য নহে ,	১৩৫
প্রকৃতি জগৎ-কারণ নহে , পুরাণ তত্ত্ব [illegible]	১৩৬
অবতার সম্বন্ধে মহাপ্রভুর মত ,	১৩৭
অবতার সম্বন্ধে ঋগ্বেদের মত ;	১৩৮
অবতার বেদ, উপনিষদ ও যুক্তিসঙ্গত ;	১৪০
তত্ত্ববিচার বা বাদ প্রতিবাদ	১৪৩
বৈদিক শাস্ত্র এক অপর হইতে বিভিন্ন নহে ;	১৪৪
কোন কোন শাস্ত্রের সহিত কোন্ কোন্ শাস্ত্র পড়িলে বৈদিক শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ বুঝা যায় ; শাস্ত্রে শাস্ত্রে বিরোধ ;	১৪৫
মনুষ্যের জ্ঞান স্বতঃ প্রমাণ হয় না ; আদর্শ সত্য নির্ণয় ; ষড়দর্শনের মীমাংসা ;	১৪৬
ঈশ্বর তত্ত্ব ও বৈদিক প্রমাণ	১৪৮
প্রকৃতির লক্ষণ ; একদেশদর্শী কি প্রকারে শাস্ত্রে শাস্ত্রে বিরোধ উপস্থিত করে ?	১৫০
মীমাংসকদিগের মীমাংসা; “সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” ;	১৫১
ইহা দুইটি উপনিষদের অসংলগ্ন বচন ,	১৫২
কারণ তত্ত্ব বিচার ;	১৫৩
মাকড়সার দৃষ্টান্ত ;	১৫৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
নানাবিধ নাস্তিকবাদ ;	১৫৫
মনুষ্য একশত বৎসর জীবিত থাকিয়া কার্য্য করিবে ;	১৫৭
সৃষ্টির আরম্ভ সম্বন্ধে বিভিন্ন উপনিষদ, বেদ ও দর্শন শাস্ত্রের মত ও ইহার মীমাংসা	১৫৮
হিরণ্যগর্ভ এবং পুরুষ শব্দের ধাত্বর্থ ; দর্শনে দর্শনে বিরোধ নাই ;	১৫৯
নবীন বৈদান্তিক প্রচ্ছন্ন নাস্তিক ;	১৬০
জীব ব্রহ্মের সহচর ; ব্রহ্ম মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া কর্ম্মফল ভোগ করে, ইহা বেদ-বিরুদ্ধ ; শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ যুক্তি ও বিজ্ঞানবিরুদ্ধ ; নবীন বেদান্তীগণ বেদের বিকৃত ব্যাখা করিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছেন ;	১৬১
বামদেব্য সাম উপাসনা	১৬২
ক্ষেত্রজ পুত্র-উৎপাদনের বিধি ; কলিকালে তাহার নিষেধ ;	১৬৩
সাধারণ ও বিশেষ বিধির বিচার ; আনন্দ গিরির বিকৃত অর্থ ;	১৬৪
সন্ন্যাসীগণ বেদাচার-বিরোধী ভক্ত ; পুলিশ-কোর্টে মোকদ্দমা ; তারকেশ্বরের এলোকেশীর মোকদ্দমা; সীতাকুণ্ডের মোহন্তের মোকদ্দমা ; ভৈরবীদিগের পরপুরুষগমনে দোষ নাই ;	১৬৬
কুম্ভমেলার দৃষ্টান্ত ; তান্ত্রিক এবং মায়াবাদিগণ কেবল যে তাহাদের সম্প্রদায়কে বেদাচার বিরোধী করিয়াছে, তাহা নহে; ভারতের সর্ব্বপ্রকার উপাসক-সম্প্রদায়কে ইহারা কমবেশী পরিমাণে বেদাচার-বিরোধী করিয়াছে :	১৬৭
মাধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত ; বল্লভাচারী সম্প্রদায় ; বল্লভাচার্য্যের জীবনী নিন্দনীয়, সমর্পণ প্রথার দোষ ;	১৬৮
সহজীয়া, কিশোরী-সাধক, বাউলাদি বেদাচার-বিরোধী যে সমস্ত বৈষ্ণব আছে, তাহারা মহাপ্রভুকে শিক্ষাগুরু বলিয়া বাহ্যিক স্বীকার করে কিন্তু অন্তরে নহে ; রামকৃষ্ণ পরমহংস এবং কেশব বাবুর মত ;	১৭২
নববিধান শব্দের বিচার ;	১৭৩
নববিধানের আদেশবাদ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে প্রবেশ করি-	

বিষয়	পৃষ্ঠা
তেছে; কেশব বাবুর গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব; পরমহংস দেবের গুরু কে, তাহা অনুসন্ধান করা উচিত নহে; আউল, বাউল, সাঁই, দরবেশ, সহজীয়া ইত্যাদি সম্প্রদায় আদেশবাদী;	১৭৪
সহজীয়া-সম্প্রদায় বড় তেজোবান্; তন্ত্রানুসারে ইহারা সাধন করে, ইহারা প্রথমতঃ শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া পরে কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করে; ত্রিপুরা-দেবী ইহাদের আদর্শশক্তি;	১৭৫
পরমহংস দেব সহজীয়া ছিলেন; বিষয়ী লোকের সাধুসঙ্গ বৃথা; সাধনতত্ত্ব-বিচার;	১৭৬
নামের প্রতীক্; আংশিক আবেশ জীবধর্ম্ম, পূর্ণ আবেশ ভগবদ্ধর্ম্ম; ১৮৮১ সালে আমরা কেশব বাবুর সহিত আলাপে জানিয়াছিলাম যে, তাঁহার আদেশবাদ শাস্ত্রবিরুদ্ধ;	১৭৭
কেশব বাবুর ঈশ্বরদর্শন ও আদেশপ্রাপ্তি; যোগের ক্রম;	১৭৮
পরমহংসদেব জীবন্ত কালীর উপাসনা করিতেন; গোপীভাবের সাধনায় তাঁহার মাসিক ঋতু হইত;	১৭৯
হনুমান-মন্ত্রের সাধনা কালে পরমহংসদেবের লেজ বাহির হয়; বিবেকানন্দ বলিতেন যে, তিনি ঈশ্বর দর্শন করিতেন; ঈশ্বর-তত্ত্বের শ্বাস-প্রশ্বাস নাই, তাহার বেদ প্রমাণ;	১৮০
চিন্ময়ের ঋতুস্রাব হয় না, তাহার শাস্ত্র প্রমাণ; ঈশ্বরদর্শন হওয়ার লক্ষণ ও বেদ প্রমাণ;	১৮১
সাধন সময় কাল্পনিক পদার্থ দর্শন হয়, তাহার বেদ প্রমাণ	১৮২
পরমহংস দেবের কর্কট (cancer) রোগে মৃত্যু হয়; কেশব বাবুর উৎকট রোগ হয়; শ্রীল বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী; নামব্রহ্ম; ইহার অর্থ যাহা মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে আছে, তাহা সঙ্গত নহে; ওঁ হরি এবং নামব্রহ্ম ইহা বৈদিক মন্ত্র, সুতরাং বেদে ইহার অর্থ আছে;	১৮৩
মহানির্ব্বাণ তন্ত্র বেদবিরোধী;	১৮৪
দেশের বিগ্রহ-উপাসকগণ প্রাকৃতিক বন্ধনে পতিত হইতেছে	১৮৫
হরিনাম জপের কথা; হরিনামের অর্থ; হরেকৃষ্ণ নামের অর্থ;	১৮৬
মহাপ্রভু বাল্যকালে ব্রহ্মগায়ত্রী-	

বিষয়	পৃষ্ঠা
মন্ত্রে দীক্ষিত হন; পরে তান্ত্রিক দশাক্ষর মন্ত্র গ্রহণ করেন এবং এই মন্ত্রের শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন; মহাপ্রভু নানা ভক্তের নিকট নানারূপে প্রকাশিত ছিলেন;	১৮৯
তান্ত্রিক মন্ত্র-জপে ভগবত্তত্ত্ব জানা যায় না; মহাপ্রভু হরিনামের মাহাত্ম্য জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য গোপীনাম জপ করিয়াছিলেন;	১৯০
হরি এবং ওঁকার একই তত্ত্ব; গোপীভাব;	১৯১
শ্রীল বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্যগণের নিকট গ্রন্থকারের নিবেদন; গুরুকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে দেখা এবং অন্যের নিকট অবতার বলিয়া প্রকাশ করা একই নহে; অবতারের লক্ষণ বিচার	১৯২
শাস্ত্রদ্বারা অবতার বিচার করিতে হয়; শ্রীমদ্ভাগবতের দৃষ্টান্ত;	১৯৩
গুরুদেবের আজ্ঞা কি প্রকারে প্রতিপালন করিতে হয়? "শেষ আজ্ঞা" বলবান;	১৯৪
কামবীজ এবং কাম-গায়ত্রী; মন্ত্রই দেবতা রূপে পরিণত হয়;	১৯৬
ইহা বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের বিষয়; কলিকালে মন্ত্র শক্তিবিহীন হয়, মহাপ্রভুর উপদেশ; গীতার উপদেশ—জ্ঞানকর্ম্মত্যাগ;	১৯৭
মহাপ্রভু উপনিষদের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়াছেন; শ্রীভগবানে সর্ব্বতোভাবে আসক্ত হওয়াই জীবের পরম পুরুষার্থ; মন্ত্রের শক্তিতে জীবকে বা দেবতাকে আসক্ত করা যাইতে পারে, কিন্তু ভগবান্ বশীভূত হয়েন না;	১৯৮
শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের বশ অর্থাৎ তিনি নিজের দয়া-গুণে বাধ্য হইয়া ভক্তকে কৃপা করেন; ইহার বেদ প্রমাণ,	১৯৯
সাত্ত্বিক ভাবে ভগবদ্পূজা করিবার প্রণালী; রঘুনাথ দাসের প্রতি মহাপ্রভুর উপদেশ	২০০
গুরু-আজ্ঞা মিথ্যা নহে; প্রতীকের পূজা-প্রণালী; বিগ্রহের সেবা করিলেই যে প্রাকৃতিক বন্ধনে পতিত হইতে হয় এমত নহে; ভাষার দোষে, অর্থের দোষে কিম্বা অন্য প্রকারের দোষে মন্ত্র যদি	

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভগবদ্ভক্তির বাধক হয়, তবে এই প্রকার মন্ত্র সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য ;	২০১
ভূতশুদ্ধি এবং প্রাণায়াম ভগবদ্‌-ভক্তির বাধক ; ভক্তি-সাধনার প্রণালী ;	২০২
রামপ্রসাদের চারিটী গান ;	২০৩
ভক্তির আধিক্যের সঙ্গে ভক্তের বাহ্য আড়ম্বর দূর হইতে থাকে ; ক্রমে রতি জন্মিলে ভক্তের আর বাহ্যাড়ম্বর করিয়া পূজা করিবার প্রবৃত্তি হয় না ;	২০৫
গোপীদিগের বস্ত্রহরণ লীলার দৃষ্টান্ত ; কি প্রকারের পূজায় ভগবৎ-প্রেম উদয় হয় ? মহাপ্রভুর উপদেশ ;	২০৬
রূপসনাতন আদি আদর্শ গোস্বামী-গণকে তন্ত্রোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া পূজা করিতে মহাপ্রভু বিধি দিলেন কেন ?	২০৭
মহাপ্রভু ভিন্ন ভিন্ন ভক্তের নিকট তাঁহাদের ভাবের অনুরূপ মূর্ত্তিতে প্রকাশ ছিলেন ;	২০৮
মহাপ্রভু "হরে-কৃষ্ণ" ইতি মন্ত্রের অর্থ পরিবর্ত্তন করিয়া যে প্রকার ব্রহ্মগায়ত্রীতে পরি-বর্ত্তন করিয়াছিলেন, ঠিক সেই প্রকার কামগায়ত্রীর অর্থ পরিবর্ত্তন করিয়া ব্রহ্মগায়ত্রী রূপে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন ;	২০৯
ক্লীং-তত্ত্ব-বিচার ; শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র ; স্বয়ং-ভগবানের ধ্যান-মন্ত্র কোন তন্ত্রে নাই ;	২১০
শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান ; হরিভক্তিবিলা-সের দৃষ্টান্ত ;	২১১
মন্মোহন তন্ত্রের কৃষ্ণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের উপাস্য নহে ; শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন কৃষ্ণকে ধ্যান ধারণা করিবে, তদ্ব্যতীত কাহাকেও পূজা করিলে মহাপ্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয় ;	২১২
মহাপ্রভু, তন্ত্রের এবং পুরাণের প্রতিপাদ্য দেবতাপূজার অর্থ পরিবর্ত্তিত করিয়া ভগবন্মুখী করিয়াছেন ; স্বয়ং ভগবান্‌ রাসবিহারী কৃষ্ণের পূজার প্রকরণ আদর্শ গোস্বামী-দিগকে প্রদর্শন করিয়াছেন ;	২১৩
শ্রীকৃষ্ণের সাধারণ পঞ্চাশটী গুণ ;	২১৫
ওঁ, ক্লীং ও কামগায়ত্রী বিচার ; মন্ত্রের পাঠ পরিবর্ত্তন করিলে	

মন্ত্র নিষ্ফল হয়, ইহা ভ্রম; ভগবান্ ভক্তির অধীন, মন্ত্রের অধীন নহেন; ২১৭
সম্ভূতির উপাসনা করিলে নরকে যাইতে হয় না, তাহার বেদ প্রমাণ; ২১৮
মহাপ্রভু এবং বেদ; ২১৯
মূল বেদ এবং বেদাঙ্গ বিচার; মহাপ্রভুর উক্তি; ২২০
বেদের অর্থ মনুষ্যে বুঝে না; উপনিষদ এবং ভাগবত এক অর্থ প্রকাশ করে; ২২৫
বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়; ইহারা বাসুদেব কৃষ্ণের উপাসক; এই বাসুদেব কৃষ্ণ ও বৃন্দাবনের কৃষ্ণ এক; এই সম্প্রদায় দুই শাখায় বিভক্ত; অনুভাষ্য; ২২৬
এই সম্প্রদায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের শাস্ত্র জ্ঞাত নহে; ২২৭
শ্রীল শিশিরকুমার ঘোষের জীবনী; ২২৮

শুদ্ধিপত্র।

—*—

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
১৩	৯	করি। তাহা	করি, তাহা
১৪	২৪	করিয়	করিয়া
১৫	১০	বুঝা যায়	বুঝা যায়,
১৬	৪	নামীয়	ন্যমীর
১৭	২২	অসম্ভেদা	অসম্ভেদায়
২১	২	বৈছে	বৈছে
৩৬	৫	ন্যায়	ন্যায়,
৩৬	১৩	প্রকৃতি	প্রাকৃতিক
৪০	৬	শাস্ত্ররীতি	শাস্ত্ররতি
৪০	১১	সাধ্য রতিতে	সখ্য রতিতে
৪৮	১২	যক্ষা	রক্ষা
৪৯	১৭	স্থানীয়	স্থানীয়া
৫৮	১২	ঐশ্বর্য্যে	ঐশ্বর্য্য
৭৬	৩	পরীক্ষায়	পরিষ্কার
৭৭	৮	সূক্ষ্মতত্ত্ব	সূক্ষ্মতত্ত্ব
৮০	৯	নয়	নন,
৮৪	৮	অসম্ভূতিকে	সম্ভূতিকে
৮৪	১৬	রাধাকৃষ্ণ	রাধাকৃষ্ণ
৮৯	১৭	সর্ব্বপ্রধান কারণ।	সর্ব্বপ্রধান, কারণ
১০২	৮	সতন্ত্র	স্বতন্ত্র
১০৩	১০	চর্ম্মায়	চর্চ্চায়
১০৪	৫	তাঁহারের	তাঁহাদের
১০৪	১৮	স্থানীয়	স্থানীয়া
১০৪	১৯	কয়ব্যূহ	কায়ব্যূহ
১১০	১৬	অবস্থিত	অবস্থিত আছে।
১২১	১০	এববিধ	এবম্বিধ
১২৩	১৭	অধ্যায়নের ও অধ্যাপনের	অধ্যয়নের ও অধ্যাপনের ব্যবস্থা
১৩১	১৬	প্রচলিভ	প্রচলিত
১৮৯	৮	নানারূপ দোষপূর্ণ	নানারূপ ভাষার দোষপূর্ণ
১৭০	২২	সাক্ষা	সাক্ষাৎ
১৭৫	১	তেজবিহীন	তেজবান
১৭৭	১৭	রাধাকৃষ্ণ	রামকৃষ্ণ
১৮৩	১০	নিত্যানন্দ	অদ্বৈত
২০৮	২৪	তাঁহারা	তিনি
২১৬	১৬	তাঁহাকে	তাঁহার

বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব।

(সমালোচনা।)

সূচনা।

ডাক্তার শ্রীমান্ প্রিয়নাথ নন্দীর নিকট মহাপ্রভুর ভক্তগণ বিক্রীত হইয়াছেন। অতি পবিত্র যে মহাপ্রভুর ধর্ম্ম তাহাতে অপবিত্রতা প্রবেশ করায় তিনি ব্যথিত হইয়া কায়িক ও মানসিক যে পরিশ্রম করিয়াছেন, যত অর্থব্যয় করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলে পুলকিত হইতে হয়।

ব্রাহ্মদিগের 'দেবালয়' বলিয়া যে মন্দির আছে, সম্প্রতি সেখানে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম সমালোচনা করিয়া একটি বক্তৃতা করেন। প্রিয়নাথ বাবু নিতান্ত লাজুক, কিন্তু দেবালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজাচার্য্যগণের অনুরোধ অবহেলা করিতে না পারিয়া এই বক্তৃতা দিয়াছিলেন। আমরা একদিন পাকা ব্রাহ্ম হইয়া হিন্দু-সমাজ ত্যাগ করিয়াছিলাম, কিন্তু পরে দেখিলাম যে ব্রাহ্মধর্ম্মে যাহা আছে, তাহা বৈষ্ণব ধর্ম্মে আছে, কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্মে যে মাধুর্য্য, ভজন ও নিগূঢ় ব্রজের রস আছে, তাহা জগতের কোন ধর্ম্মে নাই।

যাঁহারা কৃপা করিয়া শ্রীমান্ প্রিয়নাথের বক্তৃতা পাঠ করিবেন, তিনি বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের বুদ্ধির প্রভাব ও প্রাখর্য্য দেখিতে পাইবেন। দেখিবেন যে, অতি সূক্ষ্মতম তত্ত্বগুলি তাঁহাদের খেলার সামগ্রী ছিল। এই অকাট্য তত্ত্বগুলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শ্রীমান্ প্রিয়নাথের দ্বারা এই প্রথমে বাঙ্গালা-সাহিত্যে প্রচারিত হইল। সুতরাং আমি কর্ত্তব্যানুরোধে বাধ্য হইয়া স্বেচ্ছায় এই প্রস্তাব লিখিলাম। অনুরোধ করি যে, সাধারণে এই বক্তৃতা পাঠ করিবেন।

বৈষ্ণব-দাসানুদাস,

শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ দাস।

বৈষ্ণবধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের সমালোচনা।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবপ্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মৌলিক নীতির তুলনায় সমালোচনা করিলে দেখা যায় যে, উভয় ধর্ম্ম-সম্প্রদায় একমাত্র পরমেশ্বর উপাসক, ইহার ভাবার্থ এই যে, শাক্ত, শৈব, গাণপত্যাদি যতগুলি সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত হইয়া প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে কোনও সম্প্রদায় একমাত্র পরমেশ্বরের উপাসক নহেন, পরন্তু তাঁহারা কোন না কোন একটী প্রাকৃতিক দেবতা বা উচ্চজীবের আরাধনায় অনুরত আছেন, সুতরাং শাস্ত্র অনুসারে ইহাদের প্রাকৃতিক বা দৈহিক বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইবেই হইবে। আমার এই প্রকার সমালোচনায় অনেকে মনে করিতে পারেন যে, কালী, দুর্গা, শিবাদি দেবতাদিগকে পরমেশ্বর জ্ঞান করিয়া যে অনুরাগী ভক্তগণ পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের দৈহিক বা প্রাকৃতিক বন্ধনে পতিত হইতে হইবে না, এই যুক্তি সুসঙ্গত বলিয়া গ্রাহ্য করা যায় না। কেননা, অবস্তুকে বস্তু জ্ঞান করা বা এক বস্তুকে অপর বস্তু বলিয়া প্রতীতি বা আরোপ করা অজ্ঞানতা বা মায়ার কার্য্য। পুনরায় প্রশ্ন উত্থাপন হইতেছে যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় পরিণামবাদী অর্থাৎ এই উপাসক-সম্প্রদায় ব্যাসদেবপ্রণীত প্রাচীন বেদান্তবাক্য স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ বলিয়া বিশ্বাস করেন। এই বেদান্তবাক্য অনুসারে সমগ্র বৈষ্ণব এবং অন্যান্য হিন্দুসম্প্রদায় স্বীকার করেন যে, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে স্থাবর-জঙ্গমাদিক্রমে যাহা কিছু আছে, তাহা সমস্তই শ্রীভগবানের পরিণতি। এই বিচারে কালী, দুর্গা, শিবাদি কেন, জগতের প্রত্যেক বস্তুকে শ্রীভগবান্ বলিয়া পূজা করিলে দোষ কি? ইহাতে অনেক দোষ; মনে করুন,—দুগ্ধ একটি পরিণামী পদার্থ। এই দুগ্ধ, দধি, মাখন, ঘৃত, ছানা, ঘোল, সর, ক্ষীর, পনির, সন্দেশ, রসগোল্লা ইত্যাদি নানাবিধরূপে পরিণত হইতেছে। এই স্থানে দুগ্ধ—শ্রীভগবান্ স্থানীয় পরিণামী, আর দই, মাখন, ছানা আদি দেবতা ও জীবাদি স্থাবর জঙ্গমাদির স্থানীয় পরিণত বস্তু। এইক্ষণ পরিণামী এবং পরিণাম এই দুই বস্তুর তারতম্য, গুণকর্ম্মের দ্বারা বুঝিতে গেলে অভ্রান্তভাবে বুঝা যাইবে যে,

পরিণাম কখন পরিণামী হইতে পারে না অর্থাৎ দুগ্ধ, দধি, মাখন, ছানাদিরূপে পরিণত হইতে পারে, কিন্তু দধি মাখন ছানাদি কখন দুগ্ধরূপে পরিণত হইতে পারে না, ইহার ভাবার্থ এই যে, শ্রীভগবান্ জগংরূপে পরিণত হইতে পারেন, তাই বলিয়া জাগতিক সামান্য কীটাণু বা পরমাণু হইতে, বৃহৎ হইতে বৃহত্তর স্থাবর জঙ্গমাদি এবং দেবতারাও কখন শ্রীভগবদ্রূপে পরিণত হইতে পারেন না ; সুতরাং সামান্য তৃণ হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদি গুণময় দেবতা পর্য্যন্ত সমগ্র সৃষ্টির কোন পদার্থ শ্রীভগবদ্রূপে পরিণত হইতে পারে না, সুতরাং তাহারা কখন শ্রীভগবানের স্থানীয় হইতে পারে না ; অধিকন্তু সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোকেরা শ্রীভগবান্‌কে বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী অসীম অনন্ত বলিয়া এবং স্থান ও কালে কখন তিনি আবদ্ধ নহেন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ; আর জীবকে সান্ত অর্থাৎ সসীম স্থান এবং কালে আবদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এই বিচারেও ব্রহ্মলোক-বাসী ব্রহ্মা, বৈকুণ্ঠ-বাসী নারায়ণ, কৈলাস-পর্ব্বতবাসী মহাদেবকে কখনও শ্রীভগবান্ বলিয়া আখ্যাত করা যায় না। এইক্ষণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের এই প্রকার পরিণাম-বাদের অবতারণা করায়, নবীন বৈদান্তিক দল অর্থাৎ শ্রীল শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বী মায়াবাদিগণ মায়া, মোহ বা অজ্ঞানতায় জড়ীভূত হইয়া এক আশঙ্কা করেন যে, শ্রীভগবান্ পরিণামী হইলে তিনি প্রাকৃতিক সৃষ্ট পদার্থের ন্যায় বিকারী হইয়া পড়েন। কেননা নবীন বেদান্তিগণ এই পরিণামী শব্দ বিশেষ বিকৃত অর্থে প্রয়োগ করেন, তাঁহাদের মতে স্বর্ণখণ্ড যদি স্বর্ণবলয়রূপে পরিণত হয়, তবে এই নবীন বেদান্তিগণ শ্রীল শঙ্করাচার্য্যের দোহাই দিয়া চীৎকার করিয়া বলিবেন যে ইহাতেও স্বর্ণের বিকার হইল। সুতরাং এই নবীন মায়াবাদিদিগকে যুক্তি প্রমাণ দ্বারা 'পরিণাম বাদে ঈশ্বরের বিকার হয় না' তাহা বুঝান যায় না। তবে যদি তাঁহারা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিতে এই বিষয়টা বুঝিতে চাহেন, তবে তাঁহারা বুঝুন যে, 'বিজ্ঞান অনুসারে পরিণাম দুই প্রকার—একটী বিরুদ্ধ পরিণাম, অপরটি স্বরূপ পরিণাম। ভগবত্তত্ত্ব-বিচারে প্রকৃতি শ্রীভগবানের বিরুদ্ধ পরিণাম, জীব শ্রীভগবানের স্বরূপ পরিণাম ; এই দুই প্রকার পরিণামে শ্রীভগবানের কোন প্রকার বিকার হয় না, তাহা একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত দ্বারা অনায়াসে বুঝা যায়। এই কলিকাতা সহরে তড়িৎ-শক্তি দ্বারা ট্রামগাড়ী চলিতেছে, পাখা ঘুরিতেছে, বাটীতে আলো জ্বলিতেছে,

ট্রাম চলিবার তড়িৎপ্রবাহী তার কাটিয়া রাস্তায় পড়িয়া গেলে, ঐ তার সংস্পর্শমাত্র মনুষ্য, ঘোড়া, গরু ইত্যাদি জীব তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়। এই প্রভূত কার্য্যকরী শক্তিশালিনী তড়িৎ কি প্রকারে উৎপন্ন হয়? ইহা বিচার করিয়া বুঝিতে গেলে বুঝা যায় যে, কয়েকটি চুম্বক সমাবেশ করিয়া ডাইন্যামো নামক যন্ত্র হইতে এই প্রকার তড়িৎ-প্রবাহ উৎপন্ন হইতেছে, অর্থাৎ চুম্বকের শক্তি তাড়িৎরূপে পরিণত হইতেছে। ইহা চুম্বক শক্তির বিরুদ্ধ পরিণতি, তড়িৎ এবং চুম্বক এই উভয়ের গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাব, এক অপর হইতে বিভিন্ন। তড়িৎ-প্রবাহ, কাচ, রবার, ইবনাইট ইত্যাদি অপরিচালক (non-conductor) পদার্থের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিতে পারে না, কিন্তু চুম্বকশক্তি সমস্ত পদার্থের মধ্য দিয়া পরিচালিত হয়। প্রভূত শক্তিসম্পন্ন তড়িৎ স্পর্শ মাত্রেই জীবের মৃত্যু হয়, প্রভূত শক্তিসম্পন্ন চুম্বকে জীবশরীরের কোন অনিষ্ট হয় না, এমন কি জীবশরীরে ইহার কোন প্রকার অনুভূতি পর্য্যন্ত হয় না। ইহা দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারি যে, পরিণামী অর্থাৎ যাহা হইতে পরিণাম উৎপন্ন হয়, তাহা সর্ব্বস্থানে পরিণামী বা পরিণত পদার্থের তুলনায় একই প্রকার গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাবযুক্ত হয় না। দ্বিতীয়তঃ, পরিণামীর পরিণাম হইলেই যে সর্ব্বস্থানে তাহার বিকার হইবেই হইবে, তাহাও নহে। ইহার প্রমাণস্বরূপ উপরোক্ত প্রভূত শক্তিশালী তড়িৎ উৎপাদক ডাইন্যামো নামক চুম্বকযন্ত্রস্থ চুম্বকগুলি পরীক্ষা করিলে অভ্রান্ত ভাবে বুঝা যায় যে, চুম্বকের শক্তি তাড়িৎরূপে যতই পরিণত হউক না কেন, চুম্বকের কখন কোন প্রকার বিকার বা চুম্বক শক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হয় না। ইহাদ্বারা বুঝিতে হইবে যে, যদি কার্য্যস্থানীয় সামান্য প্রাকৃতিক পদার্থে এই প্রকার নিজে বিকৃত না হইয়া বিরুদ্ধ পরিণামরূপ অচিন্ত্যশক্তি বর্ত্তমান থাকিতে পারে, তবে সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বকারণকারণ শ্রীভগবানের এই প্রকার নিজে বিকৃত না হইয়া বিরুদ্ধ পরিণামরূপ অবিচিন্ত্য শক্তি নাই, এই প্রকার সন্দেহ কখন গ্রাহ্য হইতে পারে না। অতএব শ্রীভগবানের বিরুদ্ধ পরিণতি শক্তি, বহিরঙ্গ শক্তি প্রকৃতি বা মায়ারূপে পরিণত হওয়াতে তাহার কোন প্রকার বিকার হয় নাই বা হয় না, ইহা বিজ্ঞান এবং যুক্তিসম্মত। এক্ষণে স্বরূপ পরিণতির দৃষ্টান্তের কথা—একখণ্ড চুম্বক-লৌহে যত সংখ্যক লৌহখণ্ড সংঘর্ষণ করা যায়, মৌলিক চুম্বকের কিম্বা তাহার চুম্বকীয় শক্তির কিছুমাত্র

হ্রাস না হইয়া এই চুম্বকীর শক্তি, পরিণত হইয়া, তৎখণ্ড স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চুম্বকে উৎপন্ন হয়, তবে মূল চুম্বক হইতে তদুৎপন্ন চুম্বকসকল শক্তিতে কিছু কম হইয়া থাকে, আবার উৎপন্ন চুম্বকখণ্ডসকলের মধ্যে উহাদের উপাদানভূত লৌহখণ্ডসকলের শুদ্ধি অশুদ্ধি অনুসারে কোমল বা soft এবং কঠিন বা hard অর্থাৎ উহাদের পাইনের তারতম্যানুসারে এই উৎপন্ন চুম্বকসকলের মধ্যে এক অপরের তুলনায় শক্তিতে কমবেশী হয়। এক্ষণে এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারি যে, যদি প্রাকৃত পদার্থ চুম্বক নিজে বিকৃত না হইয়া তাহার শক্তি পরিণত হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হীনশক্তিসম্পন্ন চুম্বক উৎপন্ন করিতে পারে, তবে সর্ব্বশক্তিমান্ অসীম সচ্চিদানন্দবিগ্রহস্বরূপ শ্রীভগবান্, নিজে বিকৃত না হইয়া তাহার তটস্থাখ্য জীবশক্তি পরিণত হইয়া সসীম সচ্চিদানন্দস্বরূপ এক অপর হইতে বিভিন্ন প্রকৃতিযুক্ত অসংখ্য জীবরূপে পরিণত হইতে পারিবে না, এই প্রকার সংশয় কখনও হইতে পারে না। অতএব মায়াবাদিদিগের কল্পিত বিবর্ত্তবাদ স্থাপন না করিয়াও পরিণামবাদে ঈশ্বরের বিকারী হইবার আশঙ্কা নাই।

এক্ষণে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তাঁহার শ্রীমুখে পরিণামবাদ সম্বন্ধে জগৎকে কি প্রকারে বুঝাইতেছেন শ্রবণ করুন :—

"বস্তুতঃ পরিণাম বাদ সেইত প্রমাণ।
দেহে আত্মবুদ্ধি এই বিবর্ত্তের স্থান॥
অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম॥
তথাপি অবিচিন্ত্য শক্ত্যে হয় অবিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাতে দৃষ্টান্ত ধরি॥
নানারত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপঅবিকৃতে॥
প্রাকৃত বস্তুতে অবিচিন্ত্য শক্তি হয়।
ঈশ্বরে অবিচিন্ত্য শক্তি এ কোন্ বিস্ময়॥"

ইহার ভাবার্থ এই যে, শ্রীভগবান্ অবিকৃত অবস্থায় বা পূর্ণ অবস্থায় বর্ত্তমান থাকিয়াও তিনি জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীভগবানের

স্বরূপ পরিণতি যে জীব তাহার স্বরূপতত্ত্ব শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব কি প্রকারে জগৎকে বুঝাইয়াছেন শ্রবণ করুন, যথা :—

"ঈশ্বরের তত্ত্ব যৈছে জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥
জীবতত্ত্ব হইতে কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান্।
গীতা বিষ্ণুপুরাণাদি ইথে পরম প্রমাণ॥"

ইহার ভাবার্থ এই যে, শ্রীভগবান্ প্রজ্জ্বলিত বৃহৎ অগ্নি স্থানীয় এবং জীব অর্থাৎ জীবাত্মা অগ্নিস্ফুলিঙ্গস্থানীয় অর্থাৎ অনন্ত শ্রীভগবান্ অতি বৃহৎ, শুদ্ধ, মুক্ত, সচ্চিদানন্দবিগ্রহস্বরূপ, আর লিঙ্গদেহঅভিমানী সান্ত জীব বা জীবাত্মা মায়া-বদ্ধ সচ্চিদানন্দবিগ্রহস্বরূপ। এক্ষণ শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দধর্ম্ম বা ঈশ্বরত্ব ধর্ম্মের সহিত জীবের সচ্চিদানন্দধর্ম্ম বা ঈশ্বরত্বধর্ম্মের তুলনায় সমালোচনা করিয়া শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব জগৎকে বুঝাইয়াছেন যে, শ্রীভগবানের ঈশ্বরত্বধর্ম্ম অতি বৃহৎ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিবৎ, আর, জীবের ঈশ্বরত্বধর্ম্ম অগ্নির স্ফুলিঙ্গবৎ ; ইহাতে বুঝিতে হইবে যে,উভয়েতে সমধর্ম্ম বর্ত্তমান আছে বটে, তবে, শ্রীভগবানে তাহার ঈশ্বরত্বধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশ আছে, আর জীবে অতি সামান্যভাবে প্রকাশ পায়।*

*এই প্রসঙ্গে "অহং ব্রহ্মাস্মি" "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি জীব এবং ব্রহ্মের একত্বসূচক বেদের ব্রাহ্মণ অংশের বাক্যের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হইবে। মায়াধীন ক্ষুদ্র জীব কখন অসীম অনন্ত, শুদ্ধ, নিত্যমুক্ত,মায়াধীশ মূলপরিণামী শ্রীভগবান্‌রূপে পরিণত হইতে পারে না। তবে জীব শ্রীভগবানের স্বরূপ-পরিণতি বলিয়া কতক পরিমাণে তাঁহার স্বধর্ম্মযুক্ত হয়,ইহাই, এই সকল বাক্যে অর্থ প্রকাশ করিতেছে। ইহার বিপরীত যাঁহারা 'তত্ত্বমসি" বাক্যের বিপরীত অর্থ করিয়া "জীব এবং ব্রহ্ম" এক করিতে চাহেন, তাঁহারা "ছান্দোগ্যোপনিষদ" ভাল করিয়া পাঠ করুন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, তাহাতে—

'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।" ছান্দোঃ ৬৷২

এই প্রকার পাঠ আছে, ইহা যদি সত্য হয়, তবে তৎ-ব্রহ্ম ; ত্বং—তুমি (জীব) অসি—হও অর্থাৎ "জীব তুমি ব্রহ্ম হও" এই প্রকার অর্থ কখনও হইতে পারে না, কেন না, তৎশব্দে ব্রহ্ম গ্রহণ করা একেবারে অসঙ্গত, যেহেতু "ব্রহ্ম" শব্দ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বচন হইতে গ্রহণ করা যায় না। পরে ঐ ছান্দোগ্যোপনিষদে নিম্নলিখিত বচন আছে, যথা—

"স য এষোণিমা। ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং
তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি॥"

ছান্দোঃ। প্রঃ ৬৷খঃ ৮৷মঃ ৬৷৭॥

দুগ্ধ-বিকার ছানা মাখনাদির গুণকর্ম্ম বিচার করিয়া বুঝিলে দেখা যায়, ইহারা কখন দুগ্ধে পরিণত হইতে পারে না; তদ্রূপ, জাগতিক সমগ্র পদার্থ শ্রীভগবানের পরিণতি হইলেও কখনই ইহারা শ্রীভগবদ্রূপে পরিণত হইতে পারে না; সুতরাং জাগতিক সৃষ্ট পদার্থ কখন ভগবদ্রূপে আরাধ্য হইতে পারে না, কেননা ইহা বেদ এবং যুক্তিবিরুদ্ধ।

এজন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের কঠোর শাসন এই যে,

"না ভজিবে দেবা দেবী"

ব্রাহ্ম-সম্প্রদায় কোন দেব দেবীর উপাসক নহেন, পরন্তু একমাত্র পরমেশ্বরের উপাসক। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, ব্রাহ্ম-সমাজে বহুসংখ্যক কৃতবিদ্য লোক বর্ত্তমান থাকা সত্বেও পরমেশ্বর-তত্ত্ব কি, জীবতত্ত্ব কি, বা প্রকৃতি-তত্ত্ব কি, ব্রাহ্মগণের সর্ব্বসম্মত, ইহার কোন মীমাংসা গ্রন্থ নাই। এজন্য পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্রাহ্মগণ এই ত্রিতত্ত্বের বিচারের সময় আপন আপন আত্ম-প্রত্যয় অনুসারে নানারূপ উত্তর-প্রত্যুত্তর প্রদান করেন,ইহাঁদিগের মধ্যে কেহ বেদপ্রমাণকে স্বতঃপ্রমাণ বা স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না, অথচ বেদবাক্য যদি তাঁহাদের আত্ম-প্রত্যয়ের অনুরূপ হয়,তখন এই ব্রাহ্ম-পণ্ডিতেরা এই সমস্ত বেদবাক্য প্রমাণ বলিয়া গণ্য করেন। ইহার বিপরীত গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা প্রত্যক্ষ এবং অনুমান প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়া একমাত্র শব্দ বা বেদপ্রমাণ গ্রাহ্য করেন, তাই, শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তাঁহার শ্রীমুখে উপদেশ দিয়াছেন যে :—

"স্বতঃপ্রমাণ বেদ প্রমাণশিরোমণি।
লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রমাণতা হানি॥"

ইহার অর্থ এই যে, উক্ত পরমাত্মা জানিবার যোগ্য; তিনি অতি সূক্ষ্ম এবং এই সমস্ত জগৎ এবং জীবের আত্মা। তিনিই সত্য স্বরূপ এবং নিজেই নিজের আত্মা। হে শ্বেতকেতো প্রিয়পুত্র! আবার দেখা যায়—

"তদাত্মকস্তদন্তর্য্যামী ত্বমসি॥"

এই বচনেও "তত্ত্বমসি" বাক্য আছে, ইহার অর্থ—তুমি সেই, অন্তর্যামী পরমাত্মা যুক্ত। 'তত্ত্বমসি' বাক্যের এই প্রকার অর্থ না করিলে অন্যান্য উপনিষদ্ বাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহার পর বৃহদারণ্যক উপনিষদে জীবাত্মা এবং পরমাত্মার অর্থাৎ জীব এবং ব্রহ্মের স্বরূপ পরিষ্কার আছে—

"য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোহন্তরোয়মাত্মা ন বেদ যস্যাত্মা শরীরম্।
আত্মনোহন্তরোয়মযতি স ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ॥"

ইহাতে অনেক নব্য-সম্প্রদায় এক ঘোর আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন। এক্ষণ বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, সুসভ্য জাতি আজ কাল নানাবিধ বিষয়ের জ্ঞানে জ্ঞানী হইতেছে বিজ্ঞান শাস্ত্রের বহু চর্চ্চা হইতেছে, অনেকে বিজ্ঞানবিদ্ হইতেছেন, সকলেই স্বীয় স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে সর্ব্বকার্য্য পরিচালন করিতেছেন, এই প্রকার জ্ঞান বা বিজ্ঞানের উন্নত অবস্থায় সে কালের বেদবাক্য অনুসারে চলিব কেন? এই গুরুতর সমস্যার মীমাংসা করিতে গেলে নব্য সম্প্রদায়ের "আত্ম-প্রত্যয়" বা নিজবুদ্ধির বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ভাল করিয়া বিচার করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বহুকালব্যাপী পরীক্ষায় প্রাচ্য দর্শনের সহিত একমত হইয়া বুঝিয়াছেন যে, বাহ্য জগতের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সন্নিকর্ষে আমাদের অন্তঃকরণে বা লিঙ্গদেহে যে সকল সংস্কার জন্মে, তাহাদের সমবায়ে আমাদের আত্মপ্রত্যয় বা আত্মপ্রতীতি হয়। ইহা দ্বারা যাঁহারা আত্ম-প্রতীতিকে স্বতঃপ্রমাণ বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহাদের ভাল করিয়া বুঝা উচিত যে, যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের বাহ্য-প্রতীতি থাকিবে, ততদিন আমাদের কখন Absolute Knowledge—নিরপেক্ষ জ্ঞান হইতে পারে না। সুতরাং আত্ম-প্রত্যয় বা নিজবুদ্ধি বলিয়া আমরা যে জ্ঞানের আখ্যা দিয়া থাকি, তাহা সমস্তই

ইহা বৃহদারণ্যকের বচন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য আপনার স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে কহিতেছেন যে, হে মৈত্রেয়ি! পরমেশ্বর আত্মা এবং জীবে স্থির এবং জীবাত্মা হইতে ভিন্ন। মূঢ় জীবাত্মা জানিতে পারে না যে পরমাত্মা আমার আত্মার ব্যাপক আছে। জীবাত্মা পরমেশ্বরের শরীর অর্থাৎ শরীরে যেরূপ জীব রহে, তদ্রূপ জীবে পরমেশ্বর ব্যাপক থাকেন। তিনি জীবাত্মা হইতে ভিন্ন থাকিয়া জীবের পাপ পুণ্যের সাক্ষী হইয়া জীবদিগকে তাহার ফল প্রদান করতঃ নিয়ম রক্ষা করেন। তিনিই অবিনাশী স্বরূপ, তোমারও অন্তর্য্যামী আত্মা অর্থাৎ তোমার ভিতর ব্যাপক আছেন, ইহা তুমি জান।

এই সমস্ত শাস্ত্রযুক্তিবিরোধী হইয়াও যদি মায়াবাদিগণ 'তত্ত্বমসি" বাক্যকে মহাবাক্য বলিয়া স্থাপনা করিতে চাহেন, তবে তাঁহারা বুঝুন যে :—

"শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী।"

ইহার ভাবার্থ এই যে, বেদ ঈশ্বর-বাক্যস্বরূপ স্বতঃপ্রমাণ, আর উপনিষদ ঋষিবাক্য, এজন্ত ইহা বেদের প্রাদেশিক বাক্য, সুতরাং পরতঃ প্রমাণ, এজন্ত শ্রুতি অর্থাৎ বেদের সহিত স্মৃতি অর্থাৎ উপনিষদাদি শাস্ত্রের বিরোধ হইলে বেদ প্রমাণ গ্রহণ করিতে হইবে। এই যুক্তি অনুসারে 'তত্ত্বমসি' বাক্যের অর্থে জীব এবং ব্রহ্ম সধর্ম্মী ব্যতীত এক বস্তু বুঝিতে হইবে না, কেন না,—

Relative Knowledge—সাপেক্ষ জ্ঞান বা খণ্ডজ্ঞান। অতএব আত্মপ্রত্যয় কখন কোন তত্ত্ববিচারে প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না।

আবার বৈদিক শাস্ত্রে শ্রীভগবান্‌কে চিৎ, চৈতন্য, জ্ঞান, অখণ্ডজ্ঞান, বা আত্ম-প্রত্যয়-সার ইত্যাদি অনেক প্রকারে অভিহিত করিতে দেখা যায়; তাই বলিয়া কেহ যেন নিজবুদ্ধি বা 'আত্মপ্রত্যয়" এবং "আত্মপ্রত্যয়ের সারকে" এক বলিয়া বুঝিবেন না। কেন না, আত্মপ্রত্যয় অর্থে ক্ষুদ্র শান্ত জীবের সাপেক্ষ জ্ঞান বুঝায়। আত্ম-প্রত্যয়-সার অর্থে অখণ্ড অর্থাৎ পূর্ণ ভগবান্ বুঝায়। ইহা দ্বারা নিজবুদ্ধিপ্রবল নব্য-সম্প্রদায়গণ ভাল করিয়া বুঝুন যে, জীবের আত্ম-প্রত্যয় যদি স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য না হইল, তবে শাস্ত্র প্রমাণ ব্যতীত কেহ কখন ভগবৎ-তত্ত্ব বিচার করিতে পারে না। এই নীতির অনুবর্ত্তী হইয়া খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা বাইবেল, মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীরা কোরাণ, হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীরা বেদবাক্যকে স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাতেও নব্য মতাবলম্বিগণ পুনরায় আর এক আপত্তি উত্থান করিতে পারেন যে, এই বেদবাক্যের অনেক প্রকার ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে কোন্‌টী "স্বতঃপ্রমাণ" কোন্‌টী "পরতঃপ্রমাণ" বলিয়া বুঝিব? শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-দেব তাঁহার শ্রীমুখে এই প্রকারে তাহার মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন :—

"ভ্রমপ্রমাদবিপ্রলিপ্সা করণাপাটব,
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব।"

ইহার ভাবার্থ এই যে, মনুষ্যের কোন বিষয়ে প্রমত্ততাপ্রযুক্ত পক্ষপাতিত্য

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভি চাকশীতি॥

ঋঃ মঃ ১। সূঃ ১৬৪। মঃ ২০॥

এই ঋগ্বেদের বাক্য এবং "শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥ এই যজুর্ব্বেদের বাক্যে জীব এবং ব্রহ্ম চির স্বতন্ত্র বলিয়া প্রকাশ করিতেছে।

এই ঋগ্বেদের বচনের অর্থ—"(দ্বা) ব্রহ্ম এবং জীব এই উভয় (সুপর্ণা) চেতনতা এবং পালনাদি গুণ বশতঃ সদৃশ, (সযুজা) ব্যাপ্য ব্যাপকতা ভাব হইতে সংযুক্ত এবং (সখায়া) পরস্পর মিত্রতাযুক্ত হইয়া যেরূপ সনাতন ও অনাদি, এবং (সমানম্) তদ্রূপ (বৃক্ষম্) অনাদি মূলরূপ কারণ এবং শাখারূপ কার্য্যযুক্ত বৃক্ষ অর্থাৎ যাহা স্থূল হইয়া প্রলয়কালে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, উহাও তৃতীয় অনাদি পদার্থ। এই তিনের গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাবও অনাদি। জীব

দোষ থাকিতে পারে। সাম্প্রদায়িক শ্রেষ্ঠতা রক্ষা করিবার জন্য মনুষ্য কুতর্ক করিতে পারে, ইন্দ্রিয়গণের বিষয়-গ্রহণ শক্তি হ্রাসতা প্রযুক্ত অতি সূক্ষ্ম তত্ত্বের বিচার বোধগম্য না হইতে পারে, এই সমস্ত দোষে মনুষ্যের 'আত্ম-প্রত্যয়' ভ্রমশূন্য হইতে পারে না, কিন্তু স্বতঃপ্রমাণ বা ঈশ্বর-বাক্যে এই সকল দোষের কোন দোষই নাই। অর্থাৎ স্বতপ্রমাণ সম্বন্ধে যে ব্যক্তি যে রকমের যতদূর সূক্ষ্ম বিচার করুন না কেন, সর্ব্বদাই তাহা অভ্রান্ত সত্য বলিয়া স্থির হইবেই হইবে।

তাহার পর চিৎ স্বরূপ বা চিন্ময়, বা আত্ম-প্রত্যয়ের সারস্বরূপ যে শ্রীভগবান্, তাঁহাকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবেরা সাকার চিৎ-বিগ্রহ বলিয়া তাঁহার সত্বা অনুভব করেন, আর ব্রাহ্ম পণ্ডিতেরা তাঁহাকে নিরাকার বলিয়া স্থির করেন। এক্ষণে সাকার এবং নিরাকারবাদের বিচার করিতে গেলে, ভগবদ্-বস্তু প্রাকৃতিক কি অপ্রাকৃতিক পদার্থ, ইহার বিচার প্রথম করা আবশ্যক। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা শ্রীভগবান্‌কে অপ্রাকৃতিক অর্থাৎ চিন্ময় কারণশরীরি ব্রহ্ম বা সর্ব্বকারণ-কারণ পরমেশ্বর কৃষ্ণ বলিয়া অভিহিত করেন।

ও ব্রহ্ম এই উভয়ের মধ্যে জীব এই বৃক্ষরূপ সংসারে পাপপুণ্যরূপ ফল (স্বাদ্বত্তি) উত্তমরূপে ভোগ করে এবং দ্বিতীয় পরমাত্মা কর্ম্মফল (অনশ্নন্) ভোগ না করিয়া চারিদিকে অর্থাৎ ভিতরে বাহিরে এবং সর্ব্বত্র প্রকাশমান হইয়া আছেন। জীব হইতে ঈশ্বর, ঈশ্বর হইতে জীব এবং উভয় হইতে প্রকৃতি ভিন্নস্বরূপ এবং এই তিনই অনাদি ॥"

এবং এই যজুর্ব্বেদের বচনের অর্থ "(শাশ্বতী) অর্থাৎ পরমাত্মা অনাদি সনাতন জীবরূপ প্রজাদিগের জন্য বেদদ্বারা বিদ্যার বোধ করিয়াছেন।" মায়াবাদীদিগের' এই প্রকার ভ্রমবুদ্ধি হইবার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে বুঝা যায় যে, তাঁহারা মুক্তিশব্দের শাস্ত্রীয় অর্থ স্বীকার করেন না। সর্ব্বশাস্ত্রে ত্রিবিধ দুঃখ-নিবারণের নাম মুক্তি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছে, এবং এই প্রকার দুঃখত্রয়ের আত্যন্তিক নিবৃত্তির জন্য সাধন-প্রণালী সর্ব্বশাস্ত্রে বর্ণিত আছে, তাহার গূঢ় অভিপ্রায় না বুঝিয়া মায়াবাদিগণ বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত একমত হইয়া নির্ব্বাণ মুক্তির পক্ষপাতী হইয়াছেন। এই প্রকার যুক্তি একেবারে বেদবিরুদ্ধ, ঋগবেদ এবং মুণ্ডকঃ উপনিষদ্ ইহা পরিষ্কার করিয়া জগৎকে বুঝাইয়াছেন যথা,—

কস্য নূনং কতমস্যামৃতানাং মনামহে চারু দেবস্য নাম।
কো নো মহ্যা অদিতয়ে পুনর্দাৎ পিতরং চ দৃশেয়ং মাতরং চ ॥

ইহা ঋগ্বেদের বচন। ইহার ভাবার্থ এই :—

(প্রশ্ন) আমরা কাহার নাম পবিত্র বলিয়া জানিব ? নাশরহিত পদার্থ মধ্যে বর্ত্তমান কোন

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের এই ভগবৎ-তত্ত্বের গূঢ় তাৎপর্য্য ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ যদি মনোযোগ দিয়া ভাল করিয়া বুঝেন, তবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব এবং ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ের ভগবৎতত্ত্ব-নির্ণয়বিষয়ক মতভেদ মিটিয়া যায়। সাকার এবং নিরাকারবাদ লইয়া বিজ্ঞানবিদ্ দার্শনিকদিগের মধ্যে কোন প্রকার মতভেদ হইতে পারে না; কেননা, জাগতিক ক্ষিতি অর্থাৎ কঠিন, জলীয়, তৈজস, বায়ব্য, ব্যোম্ বা আকাশবৎ বা etherial এই প্রকার পঞ্চবিধ পদার্থসকলের মধ্যে মাত্র কঠিন পদার্থকে বিজ্ঞান অনুসারে প্রত্যক্ষগোচর প্রকৃত সাকার বলিয়া বুঝিতে হইবে। তরল পদার্থ সকল যে পাত্রে রাখা যায়, সেই পাত্রের আকার ধারণ করে, তাহার পর অক্‌সিজেন, হাইড্রোজেন্ নাইট্রোজেন্ আদি বায়ব্য পদার্থ, আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, গুণ কর্ম্ম দ্বারা আমরা তাহাদের আকার অনুমান করিতে পারি। কারণ এই সকল পদার্থ যে পাত্রে

দেব সর্ব্বদা প্রকাশ স্বরূপ হইয়া আমাদিগকে মুক্তিসুখ ভোগ করাইয়া পুনরায় এই সংসারে জন্ম প্রদান করেন এবং মাতা এবং পিতার সহিত দর্শন করান?

এই প্রশ্নের উত্তরে ঋগ্বেদ বলিতেছেন:—

অগ্নের্ব্বয়ং প্রথমস্যামৃতানাং মনামহে চারু দেবস্য নাম।
স নো মহ্যা অদিতয়ে পুনর্দাৎ পিতরং চ দৃশেয়ং মাতরং চ॥

ইহার ভাবার্থ এই:—

আমরা উক্ত স্বপ্রকাশস্বরূপ, অনাদি, সদামুক্ত পরমাত্মার নাম পবিত্র বলিয়া জানিব, যিনি আমাদিগকে মুক্তির অবস্থায় আনন্দভোগ করাইয়া পৃথিবীতে পুনরায় মাতা ও পিতার সম্বন্ধ দ্বারা জন্ম প্রদান করতঃ মাতা পিতার দর্শন করান। সেই পরমাত্মা মুক্তির ব্যবস্থা করেন এবং সকলের স্বামী। কেবল ইহা নহে, মুক্তির স্থায়ীকাল মুণ্ডক উপনিষদে এই প্রকার স্থির করিয়াছেন যথা,—

তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ
পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে॥ মুণ্ডকঃ ৩খঃ ২মঃ ৬॥

ইহার ভাবার্থ এই:—এই মুক্তজীব মুক্তিলাভ করিয়া তৎকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মে আনন্দভোগ করিয়া পুনরায় মহাকল্পের পর মুক্তিসুখ ত্যাগ করতঃ সংসারে আগমন করে। ইহার সংখ্যা এইরূপ:—৪৩২০০০০ তেতাল্লিশ লক্ষ ও বিংশতি সহস্র বৎসরে একচতুর্যুগী হয়, দুই সহস্র চতুর্যুগীতে এক অহোরাত্র হয়, ত্রিংশৎ অহোরাত্রে এক মাস হয়, তাদৃশ দ্বাদশ মাসে

রাখ. যায়, ঐ পাত্রের আকার অনুসারে বায়ব্য পদার্থের আকার হইয়া থাকে ; কিন্তু বায়ব্য পদার্থ পাত্রস্থ না করিলে তাহাদের আকার মনুষ্যে কল্পনা করিতে পারে না। মনে করুন, এক বোতল, দুই বোতল বা কোটী বোতল হাইড্রোজেন বাষ্প যদি আমরা এই স্থানে ভগ্ন করিয়া দেই। যখন এই বায়ু বিকীর্ণ হইয়া দিগ্দিগন্তর দিয়া নভোমণ্ডল ব্যাপিয়া পড়ে, তখন তাহার আকার মনুষ্য কখন কল্পনা করিতে পারে না। তাহার পর etherial ব্যোম্ বা আকাশবৎ পদার্থের সূক্ষ্মতা একবার বিচার করিয়া বুঝুন, জলস্থানে এবং শূন্যমার্গে এমন কোন স্থান নাই, যে স্থানে ব্যোম্ নাই ; ব্যোমের ওজন নাই, স্থান-অবরোধতা গুণ নাই ; ব্যোম সর্ব্বব্যাপী। এই স্থূলভেদের বিস্তৃতি একবার চিন্তা করিয়া বুঝুন, আমাদের একটী সৌরজগতে একটী সূর্য্যকে, পৃথিবী আদি গ্রহগণ আপন আপন উপগ্রহ সহ প্রতিনিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে, এই প্রকার অনন্ত সৌরজগৎ অনন্ত গ্রহ উপগ্রহ সহ অনন্তকাল পর্য্যন্ত অনন্ত ব্যোমের রাজ্যে পরিভ্রমণ করিতেছে। এক্ষণ বিচার করিয়া বুঝুন, এই ব্যোম বা আকাশবৎ স্থূল পদার্থসকলের আকার কি ? যাঁহারা এই আকাশবৎ পদার্থ বা ব্যোমকে নিরাকার বলিবেন, তাঁহারা বিশেষ ভ্রমে পড়িবেন। কেন না, কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ লইয়া বিচার করিলে ব্যোম পদার্থের নিশ্চয়ই আকার স্বীকার করিতে হইবেই হইবে। দৃষ্টান্ত স্থলে দেখা যায় যে, একখণ্ড বরফ আমাদের সম্মুখে আছে, ইহার আকার আমরা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিতে পারি, বরফের কারণ জল, এই জলের কোন বিশেষ আকার নাই, অবস্থা বিশেষে উহার আকার আমরা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করি। আবার জলের কারণ হাইড্রোজেন্ এবং অক্সিজেন্ ; দুই ভাগ হাইড্রোজেন্ ও এক ভাগ অক্সিজেন্ সংযোগে জল ও বরফ রূপে সাকার পদার্থ উৎপন্ন হইতেছে, ইহাতে বুঝিতে হইবে

এক বৎসর এবং তদ্রূপ শতবর্ষে এক পরান্তকাল হয়। মুক্তির সুখভোগের এই সুদীর্ঘ সময় শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। এই জন্য বেদাদি সংশাস্ত্রে পরমেশ্বরের সহিত জীবের তটস্থ অর্থাৎ সহচর সম্বন্ধ আছে। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, জীব শ্রীভগবানের নিত্য দাস বা চির-সহচর। যে শঙ্করাচার্য্যের দোহাই দিয়া মায়াবাদিগণ মায়ামোহে জড়ীভূত হইয়া বিচার-বুদ্ধি লোপ করেন সেই শঙ্করাচার্য্য নিজমুখে স্বীকার করিয়াছেন যে—

"মুক্তাপি লীলায়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তি।

হাইড্রোজেন্ এবং অক্সিজেন্ অর্থাৎ কারণে, আকার না থাকিলে কার্য্য স্থানীয় বরফের কথনও আকার হইতে পারে না। এই প্রকার বায়বীয় পদার্থের কারণ ব্যোম বা আকাশবৎ পদার্থ। যে সমস্ত আকাশবৎ পদার্থ সংযুক্ত হইয়া বায়বীয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে বা হাইড্রোজেন্ এবং অক্সিজেন্ পদার্থ উৎপন্ন হইতেছে, তাহাদের আকার না থাকিলে কার্য্য স্থানীয় হাইড্রোজেন্, অক্সিজেন্ জল আদি ক্রমে বরফের আকার হইত না। ইহাদ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারি যে, কার্য্যে বা কার্য্যস্থানীয় পদার্থে, যে সমস্ত গুণের সমবেশ, আমরা গুণ এবং কর্ম্মের বিচারের দ্বারা প্রত্যক্ষ করি। তাহা নিশ্চয় কারণে বা কারণ স্থানীয় পদার্থে স্থূল অথবা সূক্ষ্ম রূপে নিহিত আছে। অতএব নিরাকারবাদের স্থাপনা করা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। অধিকন্তু দেখা যায়, সর্ব্বদেশব্যাপী ঈশ্বরবাদী পণ্ডিতগণ পরমেশ্বরকে প্রাকৃতিক সৃষ্ট পদার্থ, সান্ত জীব বলিয়া স্বীকার করেন না, পরন্তু তাঁহাকে সর্ব্বকারণের প্রধান কারণ বলিয়া অভিহিত করেন; ইহার ভাবার্থ এই যে, পরিদৃশ্যমান কার্য্যস্থানীয় জগৎ, সর্ব্বকারণ স্থানীয় "কারণ-শরীরি ব্রহ্ম" বা শ্রীভগবান্ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহার দ্বারা আরও বুঝিতে হইবে যে, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে স্থানে যে ভাবে স্থূল সূক্ষ্ম, সাকার নিরাকার, চিত্র বিচিত্র, যাহা কিছু আমরা দেখি, শুনি, অনুভব করি বা কল্পনা করি, তাহা বীজরূপে কারণ বা কারণশরীরি ব্রহ্মে বর্ত্তমান না থাকিলে কার্য্যে বা কার্য্য-ক্ষেত্রে তাহার বিকাশ কখন হইতে পারে না, সুতরাং জাগতিক সর্ব্বসৃষ্টি-তত্ত্ব শ্রীভগবানে কারণরূপে বিরাজিত আছে, ইহা যদি সত্য বলিয়া মনে হয়, তবে প্রাচ্য দর্শন এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানানুসারে বিচার করিলে পরিষ্কার বুঝা যায়, evolution প্রণালী বা পরিণাম-প্রণালী অনুসারে জগৎ ক্রমশঃ ক্রমশঃ বিকসিত হইয়াছে, ইহার ভাবার্থ এই যে, মনে করুন; জল একটি বস্তু, এই জলের সৃষ্টির যখন আবশ্যক হইল, তখন ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন জল হউক, তৎক্ষণাৎ জলের সৃষ্টি হইল; ইহা যুক্তি, বিজ্ঞান এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

ইহার অর্থ এই যে, মুক্ত জীবেরাও শ্রীভগবানের বিগ্রহ স্বীকার করিয়া তাঁহার ভজন করেন। অতএব শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শ্রীমুখে বলিয়া গিয়াছেন যে, জীব শ্রীভগবানের চিরদাস, তাহা বেদ এবং যুক্তিসঙ্গত।

ইহার বিপরীত জল একটী পরিণত বস্তু; বায়ব্য পদার্থ পরিণত হইয়া জলের সৃষ্টি হইয়াছে। ঠিক এই প্রকার বায়ব্য পদার্থ একটী পরিণত বস্তু, সুতরাং ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী সৃষ্ট পদার্থসকল সমবায়ে পরিণত হইয়া নিশ্চয় বায়ব্য পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। এই প্রকার জগতের যে কোন পদার্থ লইয়া আমরা বিচার করি না কেন, উহাদের সমস্তই, পূর্ব্ব পূর্ব্ববর্ত্তী পদার্থসকলের সমবায়ের পরিণতি। আধুনিক বিজ্ঞান বহুকালব্যাপী পরীক্ষায় বুঝিয়াছেন যে, মনুষ্য-সৃষ্টি—শেষ পরিণাম বা শেষ সৃষ্ট বস্তু। যাহা হউক, ইহাকে evolution বা পরিণাম বা কার্য্যকারণ প্রণালী বলা যায়। এই প্রণালী অনুসারে বিচার করিলে পরিষ্কার বুঝা যাইবে যে, সর্ব্বকারণের কারণ চিন্ময় শ্রীভগবান্ বা কারণ-শরীরী ব্রহ্ম, মূলপরিণামী এবং তাঁহা হইতে পরিণত সৃষ্টির বীজস্বরূপ তত্ত্বসকল, আকাশ, বায়ু আদি ক্রমে পরবর্ত্তী সৃষ্ট পদার্থে ক্রমশঃ বিকসিত হইয়া পর পর সর্ব্বসৃষ্টির পরিশেষে মনুষ্য-সৃষ্টিতে পূর্ণভাবে বিকসিত হইয়াছে। এই বিষয়টা এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, শ্রীভগবান্ জগৎ-সৃষ্টির আদি মূল পরিণামী বা মূল-কারণ এবং সৃষ্ট জগতের অনন্ত পরিণামের বা কার্য্যের মধ্যে মনুষ্য শেষ-পরিণাম বা কার্য্য। এক্ষণ বিচার করিয়া বুঝিলে অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে, সৃষ্টিতত্ত্বসকল সামঞ্জস্য রূপে সমাবিষ্ট হইয়া হাত, পা, চক্ষু, মুখাদি নির্ম্মাণ করিয়া মনুষ্যরূপ কার্য্যে, যখন একটী সাকার দেহ, বিগ্রহ বা শরীর নির্ম্মাণ করে, সর্ব্বকারণকারণ শ্রীভগবানের ও কারণ-রূপ চিন্ময় দেহ নিশ্চয় আছে, কেন না, কারণে যাহা না থাকে, কার্য্যে তাহার বিকাশ হয় না, কারণ-স্বরূপ আম্রবীজে কার্য্যরূপ আম্রবৃক্ষই উৎপন্ন হয়, আম্রবীজে কখন কাঁটাল বৃক্ষ জন্মে না। অতএব শ্রীভগবান্ যে বেদোক্ত কারণশরীরী বা চিৎবিগ্রহ, তাহাতে আর মতভেদ হইতে পারে না। এই প্রসঙ্গে আমরা আর এক সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারি যে, ঈশ্বরবাদীদিগের মধ্যে দ্বৈত অদ্বৈত বিশিষ্টা দ্বৈত ইত্যাদি নানাপ্রকার ভেদাভেদবাদ প্রচলিত আছে; চিন্তা করিয়া বুঝিতে গেলে দেখা যায় যে, ইহার কোন বাদ শ্রীভগবানে অসম্ভব নহে, এজন্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব জগৎকে বুঝাইয়াছেন যে, যে ভক্তগণ আপন আপন অধিকার অনুসারে জীব এবং প্রকৃতিকে শ্রীভগবান্ হইতে চির স্বতন্ত্র মনে করিয়া দ্বৈতবাদ প্রচার করিতেছেন, এবং যে সমস্ত ভক্তেরা শ্রীভগবান্‌কে জীব

প্রকৃতি আদি সর্ব্বজগতের সর্ব্বকারণকারণ বলিয়া অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতেও কোন দোষ হয় না, কেননা এই অদ্বৈতবাদীরা শ্রীভগবান্‌কে অনন্ত শক্তিমান্ একোমেবাদ্বিতীয়ং বলিয়া অভিহিত করিয়া দ্বৈতবাদকে এই বলিয়া অদ্বৈতবাদে সমাধান করেন যে, কারণ-শরীরী ব্রহ্ম বা শ্রীভগবানের অনন্ত শক্তির মধ্যে অন্তরঙ্গ বা চিৎশক্তি, বহিরঙ্গ বা প্রকৃতি শক্তি, তটস্থা বা জীবশক্তি সর্ব্বপ্রধান অর্থাৎ এই শ্রেণীর অদ্বৈতবাদীরা জীব এবং প্রকৃতিকে শ্রীভগবানের শক্তিমধ্যে পরিগণিত করেন; সুতরাং "দ্বা সুপর্ণা"* ইতি ঋগ্বেদের বচনে, "অজামেকাং" † ইতি উপনিষদ্ বচনে যাঁহারা জীব প্রকৃতি এবং পরমেশ্বর এই তিন নিত্য এবং এক অপর হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বুঝেন, তাঁহাদের মত খণ্ডন না করিয়া, বুঝা যায় যেরূপ, শক্তি এবং শক্তিমান্ চিরস্বতন্ত্র হইলেও উভয় সমসাময়িক বলিতেই হইবে। আবার শক্তি এবং শক্তিমানের মধ্যে ভেদও বটে, অভেদও বটে, অর্থাৎ অচিন্ত্য ভেদাভেদ। ঠিক সেই প্রকার সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবানের জীবশক্তি ও প্রকৃতিশক্তি নিত্য অর্থাৎ তাঁহারা সমসাময়িক এবং চিরস্বতন্ত্র হইয়াও অভেদ অর্থাৎ জীবশক্তি এবং প্রকৃতি-শক্তি শ্রীভগবান্ হইতে অচিন্ত্য ভেদাভেদ। ইহাতে ঋগ্বেদ এবং উপনিষদ্ বচনের সহিত কোন বিরোধ রহিল না, অদ্বৈতদ্বৈত স্থাপনাও রহিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় এই প্রকার অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদী। কোন কোন ব্রাহ্ম পণ্ডিতও এই প্রকার অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদ স্বীকার করেন।

---

* এই বচন এবং ইহার অর্থ ৯ পৃষ্ঠায় দেখ।

† অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাম্।
অজোহ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি। অঃ ৪। মঃ ৫।

ইহার ভাবার্থ এই যে, "প্রকৃতি, জীব এবং পরমাত্মা এই তিনই অজ অর্থাৎ ইহাদিগের কখন জন্ম হয় না এবং ইহারা কখন জন্মগ্রহণ করে না। অর্থাৎ এই তিনই সমস্ত জগতের কারণ এবং ইহাদিগের কোন কারণ নাই। অনাদি জীব এই অনাদি প্রকৃতি ভোগ করতঃ আসক্ত হয়, কিন্তু উক্ত পরমাত্মা ইহার ভোগও করেন না এবং ইহাতে আসক্তও হয়েন না।"

শ্রীকৃষ্ণ।

বৈষ্ণব-সম্প্রদায় শ্রীভগবান্‌কে শ্রীকৃষ্ণনামে অভিহিত করেন, ইহাতে অনেকে অনেক রকম আপত্তি করিয়া থাকেন। পণ্ডিতেরা বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ শব্দ, বেদে দেখিতে পাওয়া যায় না। আবার কেহ কেহ এই বলিয়া আপত্তি করেন যে, কোন বস্তু বা ব্যক্তির নাম করিলে সেই নামের নামীর গুণকর্ম্ম এবং স্বভাব আমাদের হৃদয়ে উদয় হয়, এজন্য শ্রীকৃষ্ণ নাম করিলে তাঁহার বৃন্দাবন-লীলা মনে পড়িয়া তাঁহার লম্পট এবং ধূর্ত্তস্বভাব আমাদের হৃদয়ে উদিত হয়.কিন্তু ইহার অপর পক্ষে পবিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণ অনেক ভাবে শ্রীকৃষ্ণনামে নামীর অনেক প্রকার গুণকর্ম্ম এবং স্বভাব অনুভব করিয়া থাকেন। তাহার মধ্যে ওঁ বোধিত সর্ব্বাশ্রয় এবং সর্ব্বাকর্ষক ভাবে শ্রীকৃষ্ণ নাম করিলে তাঁহার নামীতে কি প্রকার গুণকর্ম্ম এবং স্বভাব মনে হয়,তাহা বিচার করিয়া বুঝিতে গেলে বুঝা যায় "কৃষ্" ধাতু হইতে কৃষ্ণ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে।"কৃষ্ ধাতুর" অর্থ আকর্ষণ। এই শ্রীকৃষ্ণ কি প্রকার আকর্ষক,তাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব গ্রন্থে এই প্রকার লিখিত আছে—

"ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ, স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব-অবতারী, সর্ব্বকারণ প্রধান ॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার ॥
পুরুষ যোষিত কিংবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্বচিত্ত-আকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন ॥"

ইহার ভাবার্থ এই যে, সবেগে চলিতেছে এপ্রকার গাড়ীর চাকায় কর্দ্দম সংলগ্ন থাকিলে তাহা যেরূপ দূরে বিক্ষিপ্ত হয়, ইহা আমরা সকলেই দেখিয়াছি, কিন্তু আমাদের আশ্রয় পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতি, ঘূর্ণয়মান গাড়ীর চাকার গতির তুলনায় লক্ষ লক্ষ গুণে প্রচণ্ড বেগে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিয়ত সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, অথচ নদ, নদী, পাহাড়, পর্ব্বত, বৃক্ষ, লতা, জীব, জন্তু আদি সকলের আশ্রয় পৃথিবী, কাহাকেও দূরে নিক্ষেপ করিতেছে না, সকলকেই আকর্ষণ

করিয়া আপন আশ্রয়ে রাখিয়াছে। আবার বিজ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিতে গেলে আমরা বুঝিতে পারি যে, একটী ব্রহ্মাণ্ডে একটী সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়া এবং তাহার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া বহুসংখ্যক গ্রহ, আপন আপন উপগ্রহ সহ প্রচণ্ডবেগে সেই একটী সূর্য্যকে পরিভ্রমণ করিতেছে। সূর্য্য এই সমস্ত গ্রহ এবং উপগ্রহদিগের আশ্রয় এবং আকর্ষক। আবার আধুনিক বিজ্ঞান প্রাচ্য বিজ্ঞানের সহিত একমত হইয়া বুঝাইয়াছেন যে, একটি ব্রহ্মাণ্ডের একটি সূর্য্য কেন, এই প্রকার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত সূর্য্য অনন্ত গ্রহউপগ্রহসহ অনন্তকাল ধরিয়া নভোমণ্ডলে স্বীয় স্বীয় স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া নিয়ত প্রচণ্ড বেগে পরিভ্রমণ করিয়া আপন আপন কার্য্য করিতেছে। এক্ষণে চিন্তা করিয়া বুঝুন যে, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডসমষ্টি কাহাকে আশ্রয় করিয়া এবং কাহার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, আপন আপন স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া প্রতিনিয়ত স্বীয় স্বীয় কার্য্য করিতেছে? এই প্রশ্নের উত্তরে ঈশ্বরবাদিগণের হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। যজুঃ। অঃ ১৩। মঃ ৪॥ যজুর্ব্বেদের এই বচনের সহিত একযোগে বলিয়া উঠিবেন যে, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর সর্ব্বাশ্রয় এবং সর্ব্বাকর্ষক। উক্ত যজুর্ব্বেদের বাক্যের অর্থ এই যে, হে মনুষ্যগণ! যিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে সূর্য্যাদি সমস্ত তেজোবিশিষ্ট লোকের উৎপত্তি স্থান এবং আধার,—যত কিছু পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে এবং হইবে, তৎসমস্তের স্বামী এবং যিনি পৃথিবী হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত সকলের সৃষ্টি করিয়া ধারণ করিয়া আছেন, উক্ত সুখস্বরূপ পরমাত্মাকে আমি যেরূপ ভক্তি করি, তোমরাও তাদৃশ ভক্তি কর। এই বেদবাক্য এবং "স সেতুঃ বিধৃতি রেষাং লোকানাম সম্ভেদায়', ইহার ভাবার্থ এই যে, পরমেশ্বর, তিনি এই লোক সকল অর্থাৎ দ্যুঃলোক এবং ভূলোক এক কথায় এই জগৎ চূর্ণ চূর্ণ না হইয়া যায়, এজন্য তিনি অর্থাৎ শ্রীভগবান্ সেতু বিধৃতি অর্থাৎ সর্ব্বাকর্ষক হইয়া ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, এই ছান্দোগ্যোপনিষদের বচন অনুসারেই বৈষ্ণবগণ পরমেশ্বরকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া অভিহিত করেন। ইহা দ্বারা, যাঁহাদের কিছুমাত্র বিচারশক্তি আছে, তাঁহারা অনায়াসে বুঝিতে পারেন যে, পরমেশ্বরের এই সর্ব্বাশ্রয়ত্ব এবং সর্ব্বাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণ নামে সামান্ত কীটাণু

বা পরমাণু হইতে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর গ্রহউপগ্রহসহ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বভূতে তিনি গূঢ়ভাবে বিরাজিত. "সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্" এই বেদবাক্য শ্রীকৃষ্ণ নামে অভিব্যক্ত হয় ; কেবল তাহা নহে, নানা দেশে যে যে ভক্ত যে যে অবস্থায় পরমেশ্বরের যে যে ঐশ্বর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া যে যে নামে তাঁহাকে অভিহিত করিয়াছেন, বিচার করিয়া বুঝিলে বুঝা যায় যে, তাঁহার এই সকল নামের নামী শ্রীকৃষ্ণ শব্দে পর্য্যবসিত। ইহার ভাবার্থ এই যে, ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, কালী, দুর্গা ইত্যাদি নামের মধ্যে যে ভক্ত পরমেশ্বরকে যেভাবে, যে সকল নামে অভি-হিত করিবেন, সেই সকল নামের নামীর গুণ কর্ম্ম এবং স্বভাব সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বাকর্ষক পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নামের গুণ কর্ম্ম এবং স্বভাবের অংশমাত্র প্রকাশ করে, আর কৃষ্ণ নামে পরমেশ্বরের পূর্ণ গুণপূর্ণ কর্ম্ম এবং পূর্ণ স্বভাব প্রকাশ করে। এই বিষয়টা বৈজ্ঞানিক ভাবে বুঝিতে গেলে দেখা যায় যে, physic, chemistry এবং physiology বিজ্ঞানের সাহায্যে যে সমস্ত তত্ত্ব এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার হইয়াছে, তাহার সর্ব্বত্রই আকর্ষণ বিরাজিত রহিয়াছে। বিজ্ঞান বুঝাইয়াছেন, এই জগৎ পরমাণুর সংযোগে সৃষ্ট হইয়াছে। আমরা সকলেই জানি যে, পরমাণুসকল অতি ক্ষুদ্র বস্তু—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান বলিতেছেন, আকর্ষণে বিভিন্ন পরমাণুসকল আকৃষ্ট হইয়া এই চিত্র বিচিত্রময় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। জীব-সৃষ্টি এই নিয়মের বহির্ভূত নহে ; ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে ভৌতিক সৃষ্টিতে যে প্রকার আমরা আণুবিক আকর্ষণ, কৈশিক আকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ, রাসায়নিক আকর্ষণ ইত্যাদি এক আকর্ষণের অনেক বিভিন্ন অবস্থা প্রত্যক্ষ করি, তদ্রূপ জীবসৃষ্টিতে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, দাম্পত্যাদি আকর্ষণ দেখিতে পাই, ইহা ব্যতীত রাগ, দ্বেষ, অহঙ্কার, যশ, মান ইত্যাদি অসংখ্য মনোবৃত্তিও এক আকর্ষণের বিভিন্ন অবস্থা মাত্র। ইহাদ্বারা বুঝিতে হইবে, আমরা এজগতে যাহা কিছু করি বা প্রত্যক্ষ করি বা চিন্তা করি, তাহার সর্ব্বত্রই আকর্ষণ বিরাজিত। এই আকর্ষণের নামান্তরকে আসক্তি বলে ; সুতরাং ভগবানের সর্ব্বাকর্ষক এবং সর্ব্বাশ্রয় নাম শ্রীকৃষ্ণ নামের নামীতেই মাত্র পর্য্যবসিত হয়, অন্য নামে নহে। অতএব যাঁহারা সাধন ব্যতীত সাধ্য বস্তু পাওয়া যায় না, ইহা বুঝিয়াছেন,

এবং সাধন-বস্তু পূর্ণভাবে পাওয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধনা বলিয়া যাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে পরমেশ্বরের অনন্ত নামের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ নাম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; কেননা, শ্রীকৃষ্ণ নামে এই প্রকার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র তত্ত্ব এবং তাহার অনন্ত মহিমা সাধকের মনে জাগরুক হয়। এই কথাটী বৈষ্ণবদিগের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, শ্রীকৃষ্ণনাম জপ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত লীলাবিলাস সাধকের হৃদয়-পটে সমুদিত হইয়া জীবাত্মায় অধিষ্ঠিত শ্রীভগবানের হ্লাদিনী নাম্নীয় স্বরূপ-শক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া সাধকের শরীরস্থ চিন্ময়বৃত্তিনিকল উত্তেজিত করিয়া ভগবদ্ভক্ত-গণকে কখন পুলক, কখন হাস্য, কখন ক্রন্দনাদি অষ্ট সাত্ত্বিকী ভাবে অভিভূত করে; ইহাকেই ভগবৎ-প্রেম বলা যায়; শ্রীভগবানের চিরদাস জীবের ইহাই চরম পুরুষার্থ।

এক্ষণে আর এক গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন হইতেছে যে, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্ব-ব্যাপী, স্থান এবং কালে অপরিচ্ছন্ন স্বয়ং শ্রীভগবান্ যদি বৈষ্ণবদিগের আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণ হন, তবে তাঁহারা এই স্বয়ং ভগবান্কে, মথুরা জেলার অন্তঃপাতী বৃন্দারণ্যবাসী নন্দনন্দন বলিয়া, সান্ত জীবের ন্যায় স্থান এবং কালে আবদ্ধ করেন কেন?

এই গুরুতর প্রশ্নের প্রত্যুত্তর সভাসমিতি করিয়া, তর্কবিতর্ক দ্বারা বা প্রবন্ধ লিখিয়া কেহ কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে পারেন না; তবে যাঁহাদের বিচারশক্তি আছে, তাঁহারা যদি তত্ত্বানুসন্ধিৎসু হইয়া আদর্শ গোস্বামীদিগের গ্রন্থ-সকল ভক্তিপূর্ব্বক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমালোচনা করিয়া পাঠ করেন, তবে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, বৃন্দাবনের "রাধাকৃষ্ণলীলা" সমস্তই অপ্রাকৃতিক, সাধন অঙ্গের চিন্ময় বিলাস; সাধারণ শান্ত এবং দাস্যরসের ভক্তের বোধগম্য নহে। ইহার তাৎপর্য এই যে, শান্তরসের প্রধান গুণ ইষ্টে অর্থাৎ শ্রীভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস, আর দাস্যরসের প্রধান গুণ ইষ্টে অর্থাৎ শ্রীভগবান্কে পরম ঐশ্বর্য্য-শালী জ্ঞান করা এবং নিজকে তাঁহার অকিঞ্চন চিরদাস জ্ঞান করা। হিন্দুদিগের মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় ব্যতীত অধিকাংশ ব্রাহ্ম, মুসলমান, খ্রীষ্টানাদি সভ্যজগতের ধর্ম্মসাম্প্রদায়িকগণ শ্রীভগবান্কে এই প্রকার শান্ত এবং দাস্যভাবে উপাসনা করেন।

"স্বতঃ প্রমাণ বেদ। রসোবৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।" * ইতি শ্রুতিবচন দ্বারা শ্রীভগবানকে সাধন অঙ্গে রসস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইহাতে বিচারক্ষম ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন যে, ভগবদ্ভক্ত, শান্ত, দাস্যাদি কোনভাবে, যত অধিকতর অবিষ্ট হইয়া অনন্ত ভগবৎ-রসের যতটুকু আস্বাদন করিতে সমর্থ হন, তাহাতেই তিনি "আনন্দাদ্ধ্যেব" খল্বিমানিভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি॥" † ইতি বেদবাক্যের সহিত একবাক্যে বলিয়া উঠিবেন যে, তিনি কেবল রসস্বরূপ নহেন পরন্তু শ্রীভগবান্ পরমানন্দ স্বরূপও বটেন, এবং তাঁহার সঙ্গগুণে জীব পরমানন্দ ভোগও করে। জীবের পক্ষে এই ভগবৎ আনন্দভোগ করা পরমপুরুষার্থ বলিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ স্বীকার করেন। শ্রীল শঙ্করাচার্য্য প্রথমতঃ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদী এবং নির্ব্বাণমুক্তির পক্ষপাতী থাকিয়া ভগবৎ চর্চ্চা-ফলে পরিশেষে স্বীকার করিয়াছেন যে,—

"মুক্তোপি লীলায়া বিগ্রহাং কৃত্বা ভগবদ্ভজন্তি।" ইহার ভাবার্থ এই যে, শনকাদি চিরমুক্ত মুনিগণ ব্রহ্মে লয় থাকিয়াও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানন্দভোগ পরিত্যাগ করিয়া, সবিশেষ ব্রহ্মকে অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌রূপে তাঁহার বিগ্রহ স্বীকার করিয়া "ভগবৎ-ভজন্তি" শ্রীভগবানের ভজনা করেন অর্থাৎ ভগবদ্ভজনানন্দ ভোগ করেন। ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে, ব্রহ্মানন্দ, ভগবৎ-ভজনানন্দের নিকট নিতান্ত তুচ্ছ পদার্থ। এক্ষণে ব্রহ্মানন্দী এবং ভগবদ্ভজনানন্দী এই দুইএর পার্থক্য বিচার করিয়া বুঝিতে গেলে, প্রথমতঃ যে ব্যক্তি এই দুইয়ের পার্থক্য বিচার করিবেন, তাঁহার নিজের স্বরূপ বা জীবতত্ত্ব কি প্রকার বস্তু, তাহা অগ্রে বিচার করিয়া তাহার নির্দ্ধারণ করা নিতান্ত আবশ্যক। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীমুখে বৈদিক শাস্ত্রের সহিত একমত হইয়া এইরূপে জীবের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া জগৎকে বুঝাইয়াছেন, যথা—

---

* ইহার ভাবার্থ এই যে আনন্দস্বরূপ শ্রীভগবান্ হইতে এই সমস্ত ভূত অর্থাৎ এই জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে এবং আনন্দস্বরূপ শ্রী কর্ত্তৃক জীবিত রহিয়াছে এবং প্রলয়কালে আনন্দ শ্রীভগবানে প্রতিগমন করে এবং তাহাতে প্রবেশ করে অর্থাৎ লয়প্রাপ্ত হয়।

† ইহার ভাবার্থ এই যে, সেই পরমাত্মা অর্থাৎ শ্রীভগবান্ রসস্বরূপ তৃপ্তি হেতু। সেই রসস্বরূপ বা রসরাজস্বরূপ শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিয়া জীব আনন্দিত হয়েন।

"ঈশ্বরের তত্ত্ব যৈছে জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥
জীবতত্ত্ব হইতে কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান্।
গীতা বিষ্ণুপুরাণাদি ইথে পরম প্রমাণ॥"

ইহার ভাবার্থ এই যে, সান্ত অর্থাৎ সসীম ক্ষুদ্র জীবের একাদশ ইন্দ্রিয়যুক্ত প্রাকৃতিক বা ভৌতিক সসীম ক্ষুদ্র একটি দেহ আছে, আর এই দেহে সসীম সচ্চিদানন্দ বিগ্রহস্বরূপ জীব, দেহীরূপে বিরাজিত আছে, আর শ্রীভগবান্ অসীম অনন্ত সৎ-চিদানন্দ বিগ্রহস্বরূপ। জীব প্রাকৃতিক এবং চিন্ময় দেহদেহী-সম্বন্ধযুক্ত অর্থাৎ জীব প্রকৃতি বা মায়ার অধীন। আর শ্রীভগবানে এই প্রকার দেহদেহী সম্বন্ধ নাই, সুতরাং তিনি মায়ার অধিপতি।

এক্ষণে ইহার দ্বারা আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারি যে, মনুষ্যাদি জীবের, প্রাকৃতিক দেহবৃত্তি ও অপ্রাকৃতিক বা চিন্ময়দেহবৃত্তি আছে, ইহার মধ্যে প্রাকৃতিক শারীরিক বৃত্তি বা ইন্দ্রিয়সকল বাহ্য বিষয়ের সহিত সন্নিকর্ষে বাহ্য-প্রতীতি হয়, আর চিন্ময়বৃত্তির সহিত চিন্ময় বিষয়ের সন্নিকর্ষে, চিন্ময়বিষয়ের প্রতীতি হয়। সর্বদেশবাসী দার্শনিক পণ্ডিতগণ একবাক্যে স্বীকার করেন যে, মনই ইন্দ্রিয়াদি সমস্ত বৃত্তির পরিচালক, তাই তাঁহারা মনের বাহ্য এবং আভ্যন্তরিক কার্য্য পরিলক্ষিত করিয়া জীবের প্রাকৃতিক দেহের একাদশ ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মনকে একটী প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয় বলিয়া স্থির করিয়াছেন, এবং অন্তঃকরণের মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার, এই তিনটী প্রাকৃতিক বৃত্তির মধ্যে মনও একটী বৃত্তি বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। এক্ষণে মনের বাহ্য এবং আভ্যন্তরিক ক্রিয়া পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, মন, বাহ্য-ইন্দ্রিয়সকলকে পরিচালন করিয়া বাহ্যজগতের সন্নিকর্ষে বাহ্য বিষয়সকল গ্রহণ করিয়া অহঙ্কার-তত্ত্বে, মন, বাহ্য প্রতীতিসকলকে যেভাবে প্রতিফলিত করে, তদনুরূপ জীবের লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ আদি অধর্ম্মবৃত্তি বা পশুবৃত্তি, এবং স্নেহ, দয়া, ভক্তি, আদি ধর্ম্মবৃত্তি বা দেববৃত্তিসকল উত্তেজিত হয়। জীবের মহৎ-তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব বিচারের স্থান, মন উকীল মোক্তারের স্থানীয়, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম বৃত্তিসকল সাক্ষীর স্থানীয়, মন তাহার বাহ্য প্রতীতি অনুসারে এই সকল বৃত্তিকে যেভাবে উত্তেজিত করিবে বা শিক্ষা দিবে, বুদ্ধিতত্ত্বের বিচার সময় প্রায় তদনুরূপ বিচার হয়।

প্রায় শব্দ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, বুদ্ধিতত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্বরূপ নিম্ন আদালতের আপীল আদালত স্বরূপ আর অহঙ্কারতত্ত্বরূপ নিম্ন আদালতের মোক্তার স্বরূপ মন। ইহাতে বুঝিতে হইবে, বুদ্ধিতত্ত্ব কোন প্রকার সাক্ষ্য গ্রহণ করে না। অহঙ্কার-তত্ত্বের দ্বারা পেশকরা নথিপত্র দেখিয়া বুদ্ধিতত্ত্বের বিচার হয়। ইহার ভাবার্থ এই যে, অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে উত্তেজিত অনেক প্রবৃত্তিকে বুদ্ধিতত্ত্ব বিচার করিয়া সাম্য করিয়া দেয়, আবার কোন কোন নিস্তেজ বৃত্তিকে বিচার করিয়া উত্তেজিত করিয়া দেয়, ইহাই বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহৎ-তত্ত্বের কার্য্য। মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এবং একাদশ ইন্দ্রিয় ইহাদের মধ্যে কেহই জীবের চিন্ময়বৃত্তি উত্তেজিত করে না। ইহার দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, আমাদের প্রস্তাবিত বিষয় "ব্রহ্মানন্দ" এবং "ভগবৎ-ভজনানন্দ" এই আনন্দের কোন আনন্দ, সাধারণ জীব কিছুমাত্র অনুভব করিতে পারে না। যে বস্তুর অনুভূতি হয় না, তাহার তুলনায় সমালোচনা করা একেবারে অসম্ভব; ইহার ভাবার্থ এই যে, শ্রীভগবান্ চিৎ-স্বরূপ বা চিন্ময় বস্তু; সুতরাং ভগবৎ নাম বা ভগবৎ নামের নামী, ভগবৎ-স্থান অর্থাৎ যে স্থানে শ্রীভগবান্ অবস্থিতি করেন, এবং ভগবৎ-পরিবার অর্থাৎ যাহাদের উপলক্ষ্য করিয়া তিনি লীলাবিলাস করেন, ইত্যাদি ভগবৎ সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় চিদানন্দময়, সুতরাং প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ্য নহে।

এই বিষয়টী শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব তাঁহার শ্রীমুখে কিভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা একবার শ্রবণ করুন,—

"অতএব কৃষ্ণের নাম—দেহ বিলাস
প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে হয় সপ্রকাশ॥
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ॥
ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ লীলারস।
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ॥
ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ।
অতএব আকর্ষয়ে আত্মরামের মন॥"

ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, শ্রীকৃষ্ণনাম, স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ-

লীলার পরিবার নন্দ, উপনন্দাদি গোপ ও যশোদা, রোহিণী, শ্রীরাধাদি গোপীগণ এবং বৃন্দাবনাদি শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থান প্রাকৃত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে; কেন না, ইহারা সমস্তই চিন্ময়।

এক্ষণে বিচার করিতে হইবে—চিন্ময় বস্তু কি? আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভাষায় ইহাকে Fourth dimensional পদার্থ বলে। আর প্রাচ্য দার্শনিক তত্ত্ববিদেরা ইহাকে তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থ অবস্থা বলে। ইহার ভাবার্থ এই যে, কোন চাক্ষুস প্রত্যক্ষগোচর পদার্থ যখন আমরা দর্শন করি, তখন আমাদের উক্ত পদার্থের একটী দেশের দর্শনমাত্র হয়, আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, চক্ষুরীন্দ্রিয় দ্বারা আমরা পদার্থের surfaceএর দর্শন করি মাত্র অর্থাৎ বিজ্ঞানমতে দীর্ঘ এবং প্রস্থ, এই দুই প্রকার বিস্তারের Dimension দর্শন হয় মাত্র; কিন্তু এটী ঘোড়া, এইটী গাধা, এই গরু, বা কোন্ পদার্থ বড়, তাহার দৈর্ঘ্য কত, বিস্তার কত, তাহার বেধ (defth) কত, ইহার পরিণাম স্বাভাবিক জ্ঞানের অতীত, কিন্তু এই সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান বিচারবুদ্ধি বা বিজ্ঞান দ্বারা জানা যায়। এই প্রকার গানের শব্দ আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বটে, কিন্তু, সুর, তাল, মান, সম, ফাঁক ইত্যাদি গানের অঙ্গের কোন জ্ঞান স্বাভাবিক শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে; পরন্তু বিজ্ঞান দ্বারা ইহা জানা যায়। এই প্রকার ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা বস্তুর আঘ্রাণ গ্রহণ করিতে পারি, কিন্তু কোন্ বিশেষ বস্তুর আঘ্রাণ, ইহা সাধারণ ঘ্রাণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে, পরন্তু বিজ্ঞান দ্বারা ইহা জানিতে পারি, এই প্রকার স্পর্শ এবং আস্বাদজ্ঞান বুঝিতে হইবে। স্পর্শ এবং আস্বাদ, ইন্দ্রিয়ের কার্য্য বটে, কিন্তু কোন্ বিশেষ বস্তুর জ্ঞান হইল, ইহার জ্ঞান হওয়া বিজ্ঞানের কার্য্য।

এক্ষণে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, বিজ্ঞান বা বিচার দ্বারা আমরা যে জ্ঞানলাভ করি, তাহা অনুশীলন সাপেক্ষ অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে বিষয় বা বিষয়সকলের চর্চ্চা যত অধিক করিবেন, তিনিও সেই বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞানে তত অধিক, বিজ্ঞানবিদ্ হইবেন। আমাদের এই বিজ্ঞান বা বিচারবুদ্ধি জাগ্রত, সুষুপ্ত, এবং স্বপ্ন এই ত্রিবিধ অবস্থায় অনেক তারতম্য হয়। জাগ্রত অবস্থায় এই বিজ্ঞানের বা বিচারশক্তির পূর্ণবিকাশ থাকে, সুষুপ্তি অবস্থায় বিজ্ঞানের কোন বিকাশ থাকে না, আর আমাদের স্বপ্ন অবস্থা অতি জটীল অবস্থা;

এই অবস্থায় বিজ্ঞান বা বিচার-শক্তি নানাপ্রকার চিত্রবিচিত্র হইয়া যায়। পণ্ডিতেরা স্বপ্ন বিষয়ের গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া, অনেক রকম সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন, ইহাদের মধ্যে মতভেদ থাকা সত্বেও সর্ব্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, স্নায়ুমণ্ডলে বা মনে কোন প্রকার irritation বা উত্তেজনা বর্ত্তমান না থাকিলে কখন স্বপ্ন হয় না। ইহার ভাবার্থ এই যে, উদরে ক্রিমি বর্ত্তমান থাকিলে বা রোগজনিত স্নায়ুমণ্ডলের দুর্ব্বলতা থাকিলে, মল, মূত্র, আদি শারীরিক মল আবদ্ধ থাকিলে, মনে কোনপ্রকার চিন্তা থাকিলে বা অন্য কোন কারণে স্নায়ু-উত্তেজিত হইলে, স্বপ্ন এবং অনেক প্রকার মস্তিষ্কবিকার উপস্থিত হয়। আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বহুকালব্যাপী পরীক্ষায় বুঝিয়াছেন যে, মস্তকের স্থান-বিশেষের উত্তেজনায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মস্তিষ্কবিকার উৎপন্ন হয় এবং মস্তিষ্কের স্থানবিশেষের পরিপুষ্টির তারতম্য অনুসারে আমাদের ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, এবং সাধারণবৃত্তির অনেক প্রকার তারতম্য হয়, এই কারণেই অহিফেন, সিদ্ধি, গাঁজা, ধুতুরা, হাইওসায়ামাস, কোকেন, এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সুরা সেবন করিলে মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন স্থান উত্তেজিত করিয়া বিশেষ বিশেষ মস্তিষ্কবিকারের লক্ষণ বা নেশা উৎপন্ন করে। সান্নিপাতিক বিকার রোগে, নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী, নানারকম প্রলাপ এবং মূর্চ্ছা হয়। হিষ্টিরিয়া, উন্মাদ, (Somnambulism) সম্‌নাম্‌বলিসম, ইত্যাদি অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জ্ঞানের বিকৃতি, মস্তিষ্কের স্থানবিশেষের উত্তেজনা উৎপন্ন হয়, কেননা, এই সমস্ত বিকার-রোগীর ক্রিয়া এবং প্রলাপ বা স্বপ্ন আদি সমস্তই অধিকাংশ স্থলে মিথ্যা বলিয়া জানা যায়। একটি ৮ বৎসরের মেয়ে, তাহাদের বাটীর প্রায় দশ হাত উচ্চ, একতলার ছাদ হইতে নিম্ন জমিতে পতিত হইয়া concussion of the brain অর্থাৎ মস্তিষ্কে ঝাঁকি লাগিয়া প্রায় ৩ দিন অজ্ঞান অবস্থায় থাকে, পরে ক্রমে ক্রমে জ্ঞান হয়। জ্ঞান হইয়া বলে যে, আমি এবং আমার অন্য একজন বন্ধু তাহাকে ছাদ হইতে ফেলিয়া দিয়াছি, তাহার এই বিশ্বাস ১৫ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত ছিল; তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ইহা আমরা জানিয়াছি। ইহার পর মেয়েটীর সহিত আর আমাদের সাক্ষাৎ হয় নাই। এই ঘটনার ৪।৫ দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমি কিম্বা আমার সেই বন্ধুটী, তাহাদের বাটী যাই নাই; তবে তাহার চিকিৎসা আমি করিয়াছিলাম। ইহার পূর্ব্বে মেয়েটীকে তাহার ছোটবেলা হইতে আমি অতি স্নেহ করিতাম।

আবার দেখা যায়, কতকগুলি লোক দিনের বেলা যে সমস্ত বিষয় কর্ম্ম করে, রাত্রে নিদ্রার সময় স্বপ্নে তাহাই আবৃত্তি করে; কোন কোন কুলটা স্ত্রীলোক নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে তাহার সমস্ত অভিসারের ঘটনাবলী প্রকাশ করিয়া থাকে; কোন কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তি স্বপ্নে তীর্থদর্শন, দেবদর্শন, সাধু-দর্শন ও গুরুদর্শন করে; ইহা সমস্তই বিকৃত মস্তিষ্কের ফল, সুতরাং এই প্রকার স্বপ্নকে মিথ্যা স্বপ্ন বলিয়া পণ্ডিতেরা অভিহিত করেন। ইহা ব্যতীত এক প্রকার সত্য স্বপ্ন আছে, তাহা আমাদের চিন্ময় বা তুরীয় বা চতুর্থ অবস্থায় বিকাশ হয়। পারলৌকিকতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা এই অবস্থাকে Hypnotic অবস্থা বলেন, যোগিগণ এই অবস্থাকে সমাধি অবস্থা বলেন। এই অবস্থায় পৌঁছিবার পূর্ব্বে ধ্যানের সময় সাধকের সর্ব্বদর্শীবৃত্তি সমুদিত হয়। আধুনিক ভাষায় ইহাকে Clarovoint বলে। এই প্রকার সর্ব্বদর্শী বৃত্তি বা (ক্লেরোভয়েণ্ট) হইবার বৃত্তি, চিন্ময়বৃত্তিবিকাশের প্রথম অবস্থায়, এই অবস্থায় স্বপ্নের বা প্রলাপের ঘটনাসকল, সত্য ঘটনা বলিয়া প্রত্যক্ষ করা যায়, বৈষ্ণবশাস্ত্রে ইহাকে আবেশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, ইহাই চিন্ময়-রাজ্যে প্রবেশের প্রথম সোপান। এই বিষয়টী আধুনিক পারলৌকিকতত্ত্ববিদ্‌দিগের ভাষায় বলিতে গেলে, এই ভাবে বলিতে হয় যে, যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের True Clarovoint বা True Hypnotic অবস্থা না আসিবে, ততদিন কেহ Spiritual বা চিন্ময়রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির, ভগবান্-নাম, শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ আদি সময়, পুলক, অশ্রু, অট্টহাস, রোমাঞ্চ, কণ্ঠরোধ বা গদগদভাষণ, মূর্চ্ছা, স্বেদ, কম্প, উদ্দণ্ড নৃত্য, দৈন, বিবর্ণ, ইত্যাদি অনেক প্রকার সাত্ত্বিক বিকারের মধ্যে যদি কোন প্রকার বিকার হয়, তবে তাহা প্রকৃত সাত্ত্বিক বিকার কিনা, তাহা অনায়াসে বিচারে বুঝা যায়; কেন না, প্রকৃত সাত্ত্বিক বিকারের এই প্রকার অবস্থায় উক্ত ব্যক্তি যাহা বলে বা দেখে, তাহা কথন মিথ্যা হয় না।

ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে, ভগবৎ-ভক্ত, প্রবর্ত্তক, সাধক, এবং সিদ্ধভেদে তিনপ্রকার। প্রবর্ত্তক ভক্তদিগের সাত্ত্বিক বিকারসকল সমস্তই প্রাকৃতিক, সাধক ভক্তদিগের সাত্ত্বিক বিকার সকল কখন প্রাকৃতিক, কখন চিন্ময় ভাবাপন্ন। আর সিদ্ধভক্তগণের সাত্ত্বিক বিকার সমস্তই অপ্রাকৃত বা চিন্ময়। বৈষ্ণব-

গ্রন্থপাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে, বৃন্দারণ্যবাসী শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণের চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়াও তাহাদের পরবর্ত্তী আচার্য্য শ্রীনিবাসাচার্য্য এবং শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ গোস্বামীদিগের চিন্ময় চেষ্টা "ভক্তি রত্নাকর" গ্রন্থে বর্ণনা আছে। শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর শ্রীভগবানের লীলার আস্বাদন করিতে করিতে প্রকৃত সাত্বিক বিকার প্রাপ্ত হইয়া ৫।৭ দিন পর্য্যন্ত মূর্চ্ছাগ্রস্ত থাকিতেন। একবার তাঁহার বাটীর পরিবারেরা এই প্রকার দীর্ঘ মূর্চ্ছা অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ গোস্বামীকে আহ্বান করিয়া, কতদিনে তাঁহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইবে জিজ্ঞাসা করায়, রামচন্দ্র কবিরাজ গোস্বামী সমাধিস্থ বা (Clarovoint) ক্লেরোভয়েণ্ট অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়া, ইহার প্রকৃত উত্তর এবং বিলম্বের প্রকৃত কারণ বলিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীল সনাতন গোস্বামীর এই প্রকার চিন্ময় জগতের কোন ঘটনা জানিবার জন্য কোন প্রকার প্রক্রিয়া আবশ্যক হইত না। তাঁহার চরিত্র পাঠ করিলে মনে হয়, তিনি সর্ব্বদাই যেন চিন্ময় অবস্থায় থাকিতেন।

এক্ষণে বিচার্য্য যে, চিন্ময় অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া বা চিন্ময়-রাজ্যে বিচরণ করিবার উপায় বা সাধনা কি? এই গুরুতর প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে গেলে, প্রথম বুঝিতে হইবে যে, সাধক, চিন্ময়-রাজ্যের কোন্ প্রদেশে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করেন? ইহার ভাবার্থ এই যে, যে প্রকার পরকালতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকে মাত্র, ভূত, প্রেত, এবং সাধারণ মৃতব্যক্তির প্রেতাত্মার অনুশীলনে অনুরক্ত আছেন, তান্ত্রিকদিগের মধ্যে অনেকে অনেক প্রকার, শক্তির উৎকর্ষবিধানের চেষ্টায়, কেহ কেহ কোন দেবদেবী বা মনুষ্য বশীকরণ, উচাটন, ইত্যাদি কার্য্যের উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত আছেন; আবার কেহ কেহ এই সমস্ত কর্ম্মকে মলমূত্রবৎ ত্যাগ করিয়া, একমাত্র ভগবৎ-ভক্তিসাধনায় নিযুক্ত আছেন। ইহার সমস্তই চিন্ময়-রাজ্যের এক এক প্রাদেশিক সাধনা; ইহার কোন সাধ্যই প্রাকৃতিক ভাবে অবস্থান করিয়া কেহ সাধনা করিতে পারে না। ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে—যে বস্তু অপ্রাকৃতিক, তাহা কখন আমাদের প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, এবং অহঙ্কার-তত্ত্বের গ্রাহ্য নহে; সুতরাং চিন্ময়-রাজ্যের যাঁহারা যে ভাবের সাধক, তাঁহারা আপন আপন পথদর্শক স্বতঃপ্রমাণ বাক্যানুসারে সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে, নিশ্চয়

তাঁহাদের কার্য্যসিদ্ধি হইবেই হইবে, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে ব্যক্তি (spirit) পারলৌকিক-তত্ত্বের অনুসন্ধিৎসু হইবেন, তিনি এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বা মহাজনদিগের উপদেশ-বাক্য বিশ্বাস করিয়া, তাঁহাদের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিলে পরিশেষে সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। যাঁহারা তান্ত্রিক, তাঁহারা শিববাক্যের উপর বিশ্বাস করিয়া, উপযুক্ত গুরুদেবের প্রদর্শিত পন্থা অনুযায়ী কার্য্য করিলে পরিশেষে তাঁহাদের অনেক প্রচ্ছন্নশক্তি বিকশিত করিতে পারেন,ইহা বিশেষ সম্ভব, অর্থাৎ নায়িকা সিদ্ধি, কালী সিদ্ধি, ভৈরবী সিদ্ধি ইত্যাদি হইতে পারে। তাহার পর, কর্ম্মী, জ্ঞানী এবং যোগীদিগের কার্য্যসিদ্ধির উপায় এইরূপ বুঝিবে, এবং স্বয়ং ভগবানের চিরসেবক ভক্তিপন্থী ভগবৎ-প্রেমপ্রার্থীগণের সাধন-প্রণালীও এই নিয়মের বহির্ভূত নহে। ইহাতে বুঝিতে হইবে, পারলৌকিক তত্ত্বানুসন্ধানী বা তান্ত্রিক দেবদেবী বশীকরণপ্রার্থী বা কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী বা ভগবৎ-প্রেমপ্রার্থী ইত্যাদি সাধকগণের সাধন এবং সিদ্ধি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। কেননা, ইহা চিন্ময়-রাজ্যের বিশেষ বিশেষ প্রদেশের বিশেষ বিশেষ বিষয়। পরন্তু ইহা গুরুগম্য অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রবাক্য এবং শাস্ত্রাজ্ঞা, উপযুক্ত গুরুদেবের উপদেশ অনুযায়ী পালন করিলে বা সাধন করিলে পরিশেষে ইহার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়; সুতরাং ইহা অনধিকারিগণের তর্কের বিষয় নহে।

এক্ষণে চিন্ময়-রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন সাধকদিগের সাধন-প্রণালীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বিচার করিয়া বুঝিতে গেলে বুঝা যায়, পারলৌকিক তত্ত্বজ্ঞগণ মৃতব্যক্তির গুণ কর্ম্ম এবং স্বভাব তন্ময় ভাবে চিন্তা করিতে করিতে যখন সাধকের প্রাকৃত জ্ঞানের লোপ হয়, তখন তাঁহার চিন্ময়-বৃত্তির প্রভাবে সাধক নিজেই মৃতব্যক্তির গুণকর্ম্ম এবং স্বভাবযুক্ত হয়। সাধারণতঃ ইহাকে আবেশ বলে। তান্ত্রিক দেবদেবীর মন্ত্রের সিদ্ধি ঠিক এই প্রকার অর্থাৎ দেবদেবীর গুণ, কর্ম্ম, এবং স্বভাব চিন্তা করিতে করিতে সাধক তাহাতে আবেশপ্রাপ্ত হন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মৃতব্যক্তির প্রেতাত্মাসকল বা প্রকৃত পক্ষে দেবদেবীগণ, সাধকের স্থূলদেহ আশ্রয় করিয়া আবির্ভাব হয় কিনা, তাহার বিচার, বৈজ্ঞানিক-গবেষণার সীমার বহির্ভূত; তবে বিচারে এইটুকু মাত্র বুঝা যায় যে, সর্ব্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ শ্রীভগবানের অংশ যখন জীব, তখন সর্ব্বশক্তি আংশিক ভাবে জীবে বিরাজিত আছে; সুতরাং জীবের ঐশ্বরিকশক্তিসকল

বিকসিত হইলে সসীম ভগবানের ন্যায় সর্ব্বপ্রকার অপ্রাকৃতিক কার্য্য সসীম কেন্দ্রের মধ্যে সুসম্পন্ন করিতে পারে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে, যদি "প্রেতযোনি" বলিয়া কোন সত্ত্বার অস্তিত্ব থাকে, তাহাকে নিশ্চয় সাধনের বলে আকর্ষণ করিতে পারা যায়। যদি ভৈরব ভৈরবী বা দেবদেবী বলিয়া কোন সত্ত্বার অস্তিত্ব থাকে, তবে পূর্ণ চিন্ময়বৃত্তি-সকল বিকশিত জীব তাহাকে আকর্ষণ করিতে বা তাঁহার আবেশ প্রাপ্ত হইতে অবশ্যই পারে; কিন্তু তাই বলিয়া অনন্ত শক্তিমান্ পরমেশ্বরকে, শান্তজীব, তাঁহার চিন্ময়বৃত্তিসকল পূর্ণ বিকসিত হইলেও কখন কোন সাধনার বলে আকর্ষণ করিতে পারিবে না; কেননা. সান্ত কখন অনন্তকে ধারণা করিতে পারে না বা লঘু গুরুকে কিংবা ক্ষুদ্র বৃহৎকে কখন আকর্ষণ করিতে পারে না, ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। ইহার দ্বারা আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারি যে, যাগ, যজ্ঞ, হোম, যোগ, মন্ত্র, তান্ত্রিক কার্য্য ইত্যাদি যত প্রকার দেবতা-বশীকরণের উপায় আছে, ভগবৎ-সাধনায় ইহার সমস্তই নিষ্ফল; কেননা, শ্রীভগবান্ একমাত্র শুদ্ধ ভক্তির অধীন, কখন তিনি কোন মন্ত্রের অধীন নহে। জীব শ্রীভগবানের চিরদাস এবং শ্রীভগবান্ জীবের চিরপ্রভু; এই চির-সম্বন্ধ যাঁহাদের মনে সর্ব্বদা বিরাজিত আছে, তাঁহারা অনায়াসে বুঝিতে পারেন, জীবের পক্ষে শ্রীভগবান্ বা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দাস্য ভাবই স্থায়ী ভাব, এবং জীবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য স্নেহ বিরাজিত রহিয়াছে, ইহাও স্থির-নিশ্চয়।

ইহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, সর্ব্বাশ্রয় এবং সর্ব্বাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজীবকে যেভাবে স্নেহাকর্ষণ করিতেছেন, জীবও ঠিক সেইভাবে প্রেমাকর্ষণে তাহাতে আকর্ষিত আছে, এই বিষয়টা বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, আকর্ষণ সর্ব্বস্থানে সাপেক্ষসম্বন্ধযুক্ত অর্থাৎ যে স্থানে আকর্ষণ বর্ত্তমান আছে, সেইস্থানে পরস্পরের আকর্ষণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। "Force can not exist until it is abstracted. Action and reaction must be equal. Love must be resiprocal." আধুনিক বিজ্ঞানের এই ধ্রুব সিদ্ধান্ত জগৎ-গুরু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব কি প্রকার সুমধুর ভাষায় আমাদিগকে বুঝাইয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন :—

"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম কভু সাধ্য নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করায় উদয়॥"

ইহার ভাবার্থ এই যে, শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বলিতেছেন, চিরসহচর জীবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাকর্ষণ নিত্যসিদ্ধ অর্থাৎ স্বাভাবিক,পরন্তু ইহা কখন সাধ্যবস্তু নহে, অর্থাৎ মন্ত্রতন্ত্রাদির প্রক্রিয়ার দ্বারা কখন ইহা সাধন করিতে হয় না। তবে ভগবৎ-গুণ, কার্য্য, স্বভাবাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, মনন, ইত্যাদি ভগবদ্ভক্তি-উদ্দীপক কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে করিতে, যখন জীবের সংসারিক মায়ামোহ যত পরিমাণে বিদূরিত হইতে থাকে, ততই চিত্তশুদ্ধি হইয়া শ্রীভগবানে প্রেমাকর্ষণ বা ভগবৎ-কৃপা অনুভব করিতে পারে। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব এই বিষয় আরও বিষদ্‌ভাবে সনাতনকে শিক্ষাচ্ছলে জগৎকে এই প্রকার শিক্ষা দিয়াছেন, যথা—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থশক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥
সূর্য্যাংশ কিরণ যেন অগ্নি জ্বালাচয়।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন শক্তি হয়॥
কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি।
চিচ্ছক্তি জীবশক্তি আর মায়াশক্তি॥
কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুখ॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নরকে চুবায়॥
সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে মায়া তাহারে ছাড়য়॥
মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণ স্মৃতি জ্ঞান।
জীবের কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥
শাস্ত্র, গুরু, আত্মারূপে আপনা জানান।
কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যতদিন জীব মায়ামোহে আবদ্ধ হইয়া এই

বিভীষিকাময় সংসারে ভুলিয়া থাকে, ততদিন জীবের শ্রীকৃষ্ণ স্মৃতি মনে থাকে না, অর্থাৎ জীব যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস এবং এই সংসার-বন্ধন হইতে তাঁহার কৃপা ব্যতীত মুক্ত হওয়া যায় না, তাহা ভুলিয়া গিয়া রাজসিক বা তামসিক শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া,কেহ স্বর্গে মায়ার সুবর্ণ-বেড়ী এবং কেহ বা নরকে মায়ার লৌহ-বেড়ী পরিধান করিয়া সংসার পাতাইতে ইচ্ছা করে। তাই শ্রীগৌরাঙ্গদেব বুঝাইতেছেন যে, সাধু অর্থাৎ ভগবৎ ভক্ত-দিগের সঙ্গগুণে এবং ভক্তিশাস্ত্রের উপদেশে যদি কোন ভাগ্যবান্ জীব শ্রীকৃষ্ণকে শুদ্ধ ভক্তি করিতে পারে, তবে সেই ব্যক্তি মায়া হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন।

এক্ষণে যাহা কিছু বর্ণনা করা হইল, তাহাতে আমরা পরিষ্কার বুঝিতে পারি যে, মায়ামোহই আমাদের "কৃষ্ণভক্তির" বাধক ; এজন্য মায়ামোহের বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব বিচার করিতে গেলে বুঝা যায় যে, আমাদের একাদশ ইন্দ্রিয়-গণের বাহ্যজগৎ বা সংসারাসক্তিই মায়া, অথবা ইন্দ্রিয়গণের বিষয় সন্নিকর্ষে আমাদের চিত্তে যে সকল ভগবৎবিমুখী বৃত্তি পরিপুষ্ট হয়, সেই সমস্ত বৃত্তি-গুলির সংসারাসক্তিকে মায়া বলে। ব্রহ্মজ্ঞানী বা যোগিগণ কঠোর তপস্যার দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া এই মায়া হইতে পরিত্রাণের চেষ্টা করিয়া থাকেন। এই প্রকরণে জীব মায়া হইতে মুক্ত হইতে পারেন বটে, কিন্তু এই কঠোর তপস্যার ফলস্বরূপ ভগবৎ-প্রাপ্তি ব্রহ্মজ্ঞানী বা যোগীদিগের ভাগ্যে কখন ঘটে না। কেননা, নির্ব্বিকল্প সমাধি অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞানী বা যোগীদিগের সর্ব্বতো-ভাবে চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইয়া নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ হয় ; তখন ব্রহ্মজ্ঞানী বা ব্রহ্মসাধকের নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান হয়। আর যোগসাধকের আত্মদর্শন বা স্বয়ংপ্রভা-জ্ঞানের উদয় হয়, কেহ কেহ সেই ব্রহ্মকে জ্যোতির্ম্ময় বলিয়া অনুভূতি করেন। কিন্তু এক্ষণে বিচার্য্য যে, অনন্ত-রূপগুণযুক্ত সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বকারণ-কারণ শ্রীভগবানের নিত্যদাসাভিমানী ভক্তগণের মায়া, কি উপায়ে বা কি প্রকার সাধনায় বিদূরিত করিতে হইবে?—এবং যদি এই মায়া বিদূরিত হয়, তবে নানাবিধ গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাবযুক্ত ভক্তগণ শ্রীভগবান্‌কে কি ভাবে প্রত্যক্ষ করিবে বা অনুভব করিবে ?

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, যোগীদিগের ন্যায় চিত্তবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে

নিরোধ করিলে জীবের ভগবদ্দর্শন বা শ্রীভগবানের নিত্যদাস অভিমান পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়, সুতরাং জ্ঞান, কর্ম্ম, এবং যোগ ভগবদ্ভক্তের কখন অনুষ্ঠেয় হইতে পারে না। কাজে কাজেই ভগবদ্ভক্তগণের চিত্তবৃত্তি বা সর্ব্ব-ইন্দ্রিয় বাহ্যবিষয় হইতে বিষয়ান্তরে আসক্ত না হইয়া ভগবদ্‌বিষয়ে যাহাতে আসক্ত হয়, তাহার উপায় বা তাহার সাধনা করা ব্যতীত তাঁহাদের দ্বিতীয় উপায় আর নাই। এই প্রকার চেষ্টায় বা সাধনায় যে জীব যত অধিক ভগবৎমুখী হইতে পারেন, তিনি তত মায়ামোহাদি অতিক্রম করিতে পারেন।

ইহাতে আর এক গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন হইতে পারে যে, যে বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, বিচার দ্বারা যাহার সত্ত্বা মাত্র জ্ঞান হয়, তাহাকে আমাদের সর্ব্ব-ইন্দ্রিয়ের বিষয় করিব কি প্রকারে ?

এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা ভগবৎপরায়ণ ভক্তদিগের নিকট বিশেষ কষ্টকর নহে, বিচার অপেক্ষা দৃষ্টান্তই প্রধান; এই নীতির অনুবর্ত্তী হইয়া বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, আমাদের ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ বিশুদ্ধ শান্তভাবের ভগবদ্ভক্ত এবং কাহার কাহারও বা এই শান্তভাবে দাস্যভাবও কিছু কিছু মিশ্রিত হইয়াছে। ইঁহাদের শ্রীভগবানে সুদৃঢ় বিশ্বাস আছে, এবং শ্রীভগবান্‌কে বিভু অর্থাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে বর্ত্তমান আছেন বলিয়া দৃঢ়তার সহিত জানিয়া, তাঁহারা ভীষণ হইতে ভীষণতর অপার বালুকাময় মরুভূমির ভীষণ দৃশ্য যখন দেখেন, তখনও তাঁহাদের তথায় বিভু ভগবানের স্ফূর্ত্তি হয়। আবার যখন তাঁহারা সুস্নিগ্ধ ফলপুষ্পশোভিত শ্যামল ক্ষেত্রের অপরূপ শোভা দৃষ্টি করেন, তখনও তাঁহাদের তথায় বিভু ভগবানের স্ফূর্ত্তি হয়। আবার যখন নভোমণ্ডলে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলের কার্য্যকলাপ এবং শোভা প্রত্যক্ষ করিয়া, একেবারে প্রেমানন্দে অভিভূত হইয়া পড়েন, তখনও তাঁহারা ইহার সর্ব্বত্রই ভগবৎ-স্ফূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করেন। আবার যখন তাঁহারা, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম পরমাণু বা জীবাণু বা (Protoplasm) প্রোটোপ্লাসমের আশ্চর্য্য গুণ, কর্ম্ম, এবং স্বভাব অণুবীক্ষণ যন্ত্রসাহায্যে বা বিচারশক্তি-প্রভাবে প্রত্যক্ষ করেন, তখন শান্তভক্তগণের হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া প্রাকৃতিক রাজ্যের অচিন্ত্য কার্য্যকলাপ, আপন অধিকার অনুসারে স্মৃতিপথে উদয় হয় এবং এই প্রকার শান্তভক্তগণ আপন আপন ভাব অনুসারে অর্থাৎ যাঁহার

পিতৃভক্তির সংস্কার দৃঢ়রূপে হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে, সে ভক্ত, শ্রীভগবান্‌কে জগৎ-পিতা বলিয়া সম্বোধন করিয়া উঠেন, এই প্রকার যাঁহার হৃদয়ে মাতৃ-ভক্তি বদ্ধমূল হইয়াছে, সে ভক্ত শ্রীভগবান্‌কে জগৎ-প্রসবিনী বা জগন্মাতা বলিয়া প্রাণের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন, আবার এই প্রকার ভক্তগণ আপনাপন বিদ্যা, বুদ্ধি, তর্ক, বিচারশক্তির চরমসীমায় পৌছিয়াও যখন বিশ্বপতির বিশ্ব-রচনা-কৌশলসকল জীববুদ্ধির গম্য নহে, সর্ব্বতোভাবে ইহা অবিচিন্ত্য, এই দৃঢ়বিশ্বাস জন্মে, তখন এই ভগবৎভক্ত মনপ্রাণে একতানে বলিয়া উঠেন যে, হে জগৎ-পিতা, তুমি সর্ব্বকারণের কারণ, তুমি জগৎ সৃষ্টিস্থিতি এবং পালনকর্ত্তা, তুমিই জগৎনিয়ন্তা, আমি তোমার অজ্ঞান সন্তান, আমার বিদ্যা মিথ্যা, বুদ্ধি মিথ্যা, আমাদের মান, সম্মান, দর্প, অহঙ্কার, সমস্তই মিথ্যা, তুমিই আমাদের একমাত্র পিতামাতা, তুমিই কৃপাময়, তুমি কাহারও বশ্য নহ, কেহ তোমাকে বশ করিতে পারে না, তুমি আমাদের সর্ব্বকর্ম্মের বিধাতা, এই প্রকার শ্রীভগবান্‌কে ভক্তির উচ্ছ্বাসে নানাপ্রকার স্তবস্তুতি করিতে করিতে ভক্ত বারম্বার প্রণাম করিতে থাকিবেন, পরে এই প্রকার দাস্য-ভক্তি যত প্রগাঢ় হইতে থাকে, ততই ভক্ত শ্রীভগবান্‌কে অদ্বয়তত্ত্ব বলিয়া বুঝিতে আরম্ভ করে। তৎপরে দাস্যভক্তির চরম অবস্থায় ভক্তের জ্ঞান হয় যে, হে করুণাময়! তুমিই জগতের পিতা, তুমিই জগতের মাতা, তুমিই পুরুষ, তুমিই প্রকৃতি, তুমিই জগতের অভিন্ন নিমিত্ত-উপাদানকারণ; তুমিই ত্রিতত্ত্ব (Trinity—জীব, প্রকৃতি, এবং ঈশ্বর)। ক্রমে ক্রমে দাস্যভক্তির পরিপাক দশায়, বাহ্য বিষয়াশক্তি ক্রমশঃ যত লোপ পাইতে থাকে, ভক্ত ততই জগৎময় ভগবৎ-স্ফূর্ত্তি পরিদর্শন করে। ক্রমেই ভক্ত শ্রীভগবানকে এই বলিয়া স্তব করে যে, হে সপ্রকাশ, তুমি একমাত্র কৃপার বশবর্ত্তী হইয়া সূর্য্যরূপে পরিণত হইয়া জগৎকে প্রত্যক্ষগোচররূপে প্রকাশ করিতেছ; তুমি বায়ুরূপে পরিণত হইয়া জগতের প্রাণরক্ষা করিতেছ। এই প্রকার দাস্যভক্তের পরিপাক দশায় সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বজীবে শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান বা পরিণাম বলিয়া অনুভূতি করিতে আরম্ভ করে। পরে যখন ভক্তের শ্রীভগবানে প্রগাঢ় রতি জন্মে অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি অত্যধিকরূপে উত্তেজিত হওতঃ বিচারশক্তি লোপ পাইয়া, মাত্র সংস্কারানুসারে কার্য্য করিতে থাকেন, তখন ভগবান্ এবং

ভক্তের মধ্যে সেব্য সেবক ভাব উপস্থিত হয়, ইহাই দাস্যরতির চরম স্থায়ী ভাব। এই অবস্থায় ভক্ত, তিনটী দশায় অবস্থান করে। বাহ্যদশা, অর্দ্ধ-বাহ্য দশা, এবং অন্তর্দ্দশা। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অন্তর্দ্দশায় ভক্তের বাহ্য ইন্দ্রিয়াদি ও মনোবৃত্তিসকল, বাহ্য জগৎ হইতে সর্ব্বতোভাবে স্তম্ভিত হইয়া শ্রীভগবানে অর্পিত হয়। তখন ভক্ত আপন হৃদয়-পটে শ্রীভগবানকে চিন্ময় বৃত্তির প্রভাবে সচ্চিদানন্দ ঘন বিগ্রহ স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া অসম-উর্দ্ধ ভগবৎ-আনন্দ উপভোগ করিতে থাকে। অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায়, ভক্তের চিন্ময় বৃত্তির পূর্ণবিকাশ থাকে না, প্রাকৃতিক বৃত্তির সহিত বিমিশ্রভাবে অবস্থিতি করে বলিয়া, ভক্তের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের আর দর্শন হয় না, অথচ চিন্ময়বৃত্তির সন্নিকর্ষে প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয় বা মনের প্রতীতি হয়, যেন ভক্ত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ চাক্ষুস্ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার আর সাক্ষাৎ প্রাপ্তি হইতেছে না, এজন্য এই অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় ভক্তের ভগবদ্বিরহজনিত ক্লেশের আর শেষ থাকে না। এই প্রকার বাহ্যদশাপ্রাপ্ত ভক্ত সাংসারিক কার্য্যে, বিশেষভাবে নিযুক্ত হইতে পারে না। কেননা, তাঁহার মন, শ্রীভগবানে অর্পিত থাকে, তিনি ভগবদ্দর্শন-বিরহে সর্ব্বদা কাতর থাকেন, তিনি ভগবৎ-প্রসঙ্গ ব্যতীত অন্য কোন কথা বলিতে চাহেন না বা শুনিতেও পারেন না, সর্ব্বদাই বিরহ-দুঃখভোগ করিতে থাকেন, তাঁহার বিচারবুদ্ধি সর্ব্বতোভাবে লোপ পায়। যে স্থানে কোন প্রকার প্রেমের কথা শুনেন, সে স্থানেই ভগবৎ-প্রেমের স্ফূর্ত্তি হয়। ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্য কাহাকেও প্রেমের শক্তি বুঝান যায় না। পাঠক, প্রেমিক কবিদিগের কবিতা পাঠ করুন, তাহাতে দেখিবেন, প্রেমিক কবি কি প্রকার বিজ্ঞানান্ধ ও কি প্রকার জ্ঞানের বিচার বিরোধী হইয়া থাকেন। নলিনী জলজ উদ্ভিজ্জ, সূর্য্য উদয়ে, সূর্য্যালোকের প্রভাবে প্রমোদিত কুমুদিনী শতদলে বিকসিত হইয়া উঠে। আদিরসে উদ্ভাসিত প্রেমিক কবি উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদ্‌দিগের তত্ত্ববিচারের ভিতর প্রবিষ্ট হইতে চাহেন না, তাই তাঁহারা প্রস্ফুটিত নলিনী দেখিয়া বিরহবিধুরা প্রণয়িনীর প্রিয় সমাগমের প্রফুল্ল মুখচ্ছবি তাঁহাদের মনে উদয় বা উদ্দীপিত হইয়া, নলিনীকে সূর্য্যের প্রিয়তমা না বলিয়া, তাঁহার হৃদয় তৃপ্ত হয় না। তাই আদি বা মধুর রসে অভিভূত কবি প্রত্যক্ষ করেন, লতায় তরুকে প্রেমালিঙ্গন করে, পাতায় প্রেমাশ্রু নিপাতন করে, পুষ্প প্রেমোৎফুল্ল

হইয়া হাসে, ভ্রমর প্রেমাকর্ষণে পুষ্পে আকৃষ্ট হয়, কোকিল প্রেমানুরাগে পঞ্চম-স্বরে সুললিত গায়, মলয়ানিল প্রেমে নৃত্য করে, চন্দ্র প্রেমানন্দে হাসে, ঊষা প্রেমানুরাগে বালার্ক সিন্দুর ফোঁটা পরিধান করে, এই প্রকার মধুর রসের রসিক কবি জগৎময় প্রেমের হাট বাজার দেখেন, তিনি বিজ্ঞান বা দার্শনিক বিচার মানেন না, বেদ ও শাস্ত্রের শাসন গ্রাহ্য করেন না; ভাবের তরঙ্গে যে স্থানে লইয়া যায়, প্রেমিক তথায় অবস্থান করেন, তদ্রূপ ভগবৎ ভক্তগণের যখন শ্রীভগবানে গাঢ় রতি জন্মে, তখন কবিগণের ন্যায় জ্ঞানকর্ম্মযোগশাস্ত্রের শাসন, সাংসারিক বন্ধন, ধর্ম্মাধর্ম্ম বন্ধন, সজীব নির্জীবের পার্থক্য ইত্যাদি সর্ব্ব-প্রকার ভেদাভেদজ্ঞান এবং বিচারবুদ্ধি সর্ব্বতোভাবে লোপ হইয়া জগন্ময় শ্রীভগবানের হাট বাজার দেখিতে পান অর্থাৎ সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বস্থানে ভগবৎ স্ফূর্ত্তি হয়। এই প্রকার ভগবৎ-প্রেমার্জ্জনই জীবের পরমপুরুষার্থ। এই পুরুষার্থ সাধনই মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ দেবের প্রচারিত ধর্ম্মের এক সূক্ষ্মতত্ত্ব। এই প্রকার দাস্য প্রেম পর্য্যন্ত বেদাদি সৎশাস্ত্র এবং সর্ব্বদেশে সর্ব্ব-সাম্প্রদায়িক ভগবদ্ভক্ত-গণের ধর্ম্মশাস্ত্রের চরম সূক্ষ্মতত্ত্ব, কিন্তু ভক্তকুলগুরু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৎশাস্ত্র বা অবতার বা আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক অনর্পিত ভগবৎ-প্রেমের সাধনা আর এক অভিনব ভাবে জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন, ইহাকে ব্রজের ভাবে ভগবৎ সাধনা কহে। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রজের শ্রীদাম, সুবলাদি শ্রীকৃষ্ণের সখাগণের ভাবে অথবা শ্রীকৃষ্ণের ব্রজের মা যশোদার বাৎসল্যভাবে, অথবা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী ব্রজগোপিকাগণের কান্তাভাবে, এই তিন প্রকারের কোন ভাবে শ্রীভগবানে প্রেম করাকে ব্রজভাবের সাধনা বলে। এই সাধনার গূঢ় প্রণালী বিচারের গ্রাহ্য নহে; কেননা, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীমুখে জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ নাম, শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ, শ্রীকৃষ্ণলীলা, শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থান, এবং শ্রীকৃষ্ণলীলা সহচর ইত্যাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় নহে; কেননা, সমস্তই চিদানন্দময়। আবার মহাপ্রভু স্থানান্তরে উপদেশ দিয়াছেন যে, শান্তরসের ভক্তের গুণ শ্রীভগবানের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস; শান্ত ভক্তের এই বিশেষভাব বা দৃঢ়বিশ্বাস দাস্য-রসের ভক্তের দাস্যভাবে বিমিশ্রিত হইয়া আছে। অধিকন্তু দাস্যভক্তের ভগবৎ-সেবানন্দ এই বিশেষ রস, ইহাতে অতিরিক্ত আছে; ইহাতে বুঝিতে হইবে, শান্ত অপেক্ষা দাস্যে ভাবাধিক্য বা রসাধিক্য, সুতরাং ভগবদানন্দও শান্ত

অপেক্ষা দাস্যে অধিক, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। পরে মহাপ্রভু ব্রজের তিনটী ভাবের বিষয় এই ভাবে বুঝাইতেছেন যে, ব্রজসখা রাখালদিগের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে প্রকার সাখ্যভাব, শ্রীভগবানে যদি কাহারও এই প্রকার সাখ্যরতি জন্মে, তবে এই প্রগাঢ় সাখ্যপ্রেম বা সাখ্যরতি যদি বিশ্লেষণ করিয়া বিচার করা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, সাখ্য রতিতে শান্তের, ইষ্টে অর্থাৎ শ্রীভগবানে দৃঢ়বিশ্বাস এবং দাস্যের সেবানন্দ এই দুই রসই সাখ্যে নিহিত আছে, এবং এই দুই ভাবের অতিরিক্ত সাখ্যরসের বিশেষভাব এই যে, শ্রীভগবান্ ভক্তের প্রাণসম সুহৃৎ অর্থাৎ দাস্য অপেক্ষা সাখ্যে মমতা অধিক। এই ভাবে ভক্তের মনে হয়, শ্রীভগবান্ আপন জন, গৌরবশূন্য প্রিয়বন্ধু, এই ভাব ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে গেলে, ব্রজের কৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্ম শ্রীভগবান্ স্থানীয় বলিয়া মনে করুন এবং ব্রজ-রাখালগণকে ভগবৎ-সাধকের স্থানীয় বলিয়া মনে করুন, তাহা হইলে বুঝিবেন, রাখালগণ সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গৌরববর্জ্জিত-চিত্তে ক্রীড়ারঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে স্কন্ধে উঠাইতেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে উঠিতেছেন। রাখালগণ বনের নানাবিধ ফল চয়ন করিয়া নিজেরা প্রথমতঃ আস্বাদন করিয়া দেখিতেছেন, কোন্‌টী বিস্বাদু, কোন্‌টী সুস্বাদু, সেই উচ্ছিষ্ট সুখাদ্য ফলটী তাঁহাদের প্রিয়সখা শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য অতি যত্নে রাখিয়া দিতেছেন। পরে পূর্ণব্রহ্ম শ্রীভগবান্‌স্থানীয় কৃষ্ণকে তাঁহাদের মর্ম্মসখা জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে এই উচ্ছিষ্ট সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করাইয়া দাস্য ভক্তের সেবানন্দ অপেক্ষা অধিকতর সেবানন্দ ভোগ করিতেন। আবার ব্রজ-রাখালগণ জলস্থল, আপদ বিপদ, সম্পদাদি যে স্থানে যে অবস্থায় অবস্থান করিতেন, শান্তভক্তের ন্যায় তাঁহাদের মনে প্রিয়সখা শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন বিষয় স্থান পাইত না এবং তাঁহাদের সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় মনে এই দৃঢ়বিশ্বাস থাকিত যে, তাঁহাদের প্রিয়কৃষ্ণ সর্ব্বদাই তাহাদের সহায় বা সখা আছেন, ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে, সাখ্য রতিতে, শান্তের দৃঢ়বিশ্বাস, দাস্যের সেবা এবং সাখ্যের বিশেষ রতি গৌরববর্জ্জিত মমতাধিক্য রস বিরাজিত আছে,রসাধিক্যে স্বাদাধিক্য হয়; এই বিচারে, শান্তে এক রস, দাস্যে দুই রস, এবং সাখ্যে তিন রস মিশ্রিত বলিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভাব অপেক্ষা পরপরবর্ত্তী ভাবে, রসের আধিক্য-প্রযুক্ত আস্বাদেরও আধিক্য হয়, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

এক্ষণে অভক্ত পণ্ডিতগণ এবং প্রবর্ত্তক অবস্থায় অবস্থিত দাস্য ভক্তগণ এক ঘোর আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন যে, শ্রীভগবানের অসীম মহিমা যাঁহারা অবগত নহেন, এপ্রকার অজ্ঞানী ব্যতীত জগতে এমন কোন্ ব্যক্তি আছে যে, তাহার এ প্রকার স্পর্দ্ধা হইতে পারে ?—ব্রজের নিরক্ষর রাখালগণের ন্যায় পরম পূজ্যাস্পদ জগদীশ্বরের স্কন্ধে আরোহণ করিবে বা করিতে চাহিবে ? এই প্রকার যে ব্যক্তি বলে, সে নিশ্চয় জ্ঞানহীন পাগল ! আবার দেখা যায়, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যে পূর্ণব্রহ্ম ভগবানের রচিত, তাঁহাকে রাখাল বালকেরা ফল খাওয়াইয়া সুখী করিবে ? ইহাও নিশ্চয় পাগলের কথা ! এই গুরুতর প্রশ্নের উত্তর অবগত হইতে হইলে, প্রশ্নকারীর পূর্ব্বোল্লিখিত মহাপ্রভুর উপদেশ মনে করিতে হইবে। তিনি পরিষ্কাররূপে জগৎকে বুঝাইয়াছেন, ব্রজের সাখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর রসের ভগবদ্ভজন প্রকৃত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে অর্থাৎ ইহা চিন্ময়-রাজ্যের রাজার আইনানুসারে বিচার করিতে হইবে ; অতএব প্রশ্নকারিগণ ! আপনারা আপনাদের প্রকৃতি রাজার আইনানুসারে বিচার করিলে চলিবে কেন ? যদি আপনারা চিন্ময় রাজ্যের বিচার বুঝিতে চাহেন, তবে আপনাদের মধ্যে যাঁহারা পণ্ডিত, তাঁহারা বুঝুন যে,—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা "সখায়া" সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্য পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্ন্যোঽভিচাকশীতি ॥"

ইহা ঋগ্বেদের বচন, উপনিষদাদির ঋষিবাক্য নহে, সুতরাং স্বতঃ প্রমাণ বাক্য দ্বারা স্বয়ং ভগবান্ পরিষ্কার ভাষায় জীবকে তাঁহার সখা বলিয়া অভিহিত করিতেছেন ; ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, জীবের সহিত শ্রীভগবানের সখা সম্বন্ধ না থাকিলে কখন তিনি জীবকে সখা বলেন নাই। এই গুরুতর কারণে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির বিচার করিয়া দেখা উচিত যে, জীব ভগবানের কি প্রকার সখা।

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, সাখ্যভাব ভগবৎ-ভজন করিবার তৃতীয় সোপান। একটী সোপানের চরম উর্দ্ধে উঠিতে না পারিলে কেহ কখন দ্বিতীয় সোপানে পৌঁছাইতে পারে না, ভগবৎ ভজনের প্রথম সোপান শান্তভাব, এই শান্তভাবের সাধনার পরিপাক অবস্থায় ভক্তের ভাবের কি প্রকার পরিপুষ্টি

এবং পরিবর্ত্তন হইয়া, ইহার চরম দশায় এই শান্তরস কি প্রকারে Evolutionএ পরিণত হইয়া দাস্যরসে পরিণত হয়, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; পরে এই দাস্যরসের সাধকের পরিপাক অবস্থায় এই রসের কি প্রকার পরিপুষ্টি ও পরিবর্ত্তন হইয়া চিন্ময় অবস্থায় পরিণত হয়, তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তাহার পরে, এই চিন্ময় দাস্যভক্তের ভাবের চরম অবস্থায় কি প্রকারে জ্ঞান বিজ্ঞানাদি সর্ব্বপ্রকার বিচারবুদ্ধি লোপ হইলে, অর্দ্ধবাহ্য এবং অন্তর্দ্দশায় শ্রীভগবানের সহিত যে প্রকারে সেব্য-সেবক সম্বন্ধ হয়, তাহাও পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই বিচারগুলি যদি স্মরণ থাকে, তবে ইহা অনায়াসে বুঝা যায় যে, এই প্রকার দাস্যরতি চরম অবস্থায় (Evolution) পরিণতি হইয়া, সাখ্যরতি উৎপন্ন হয়। এই বিষয়টা ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে দাস্য এবং সাখ্যরতি তুলনায় সমালোচনা করিতে হয়। দাস্য, সাখ্যের তুলনায় গৌরব অত্যধিক, মমতা কম, কিন্তু সাখ্যে মমতা অধিক, গৌরব একেবারে কম। এক্ষণে প্রেমের বিকাশের ক্রম, বিচার করিয়া বুঝিতে গেলে বুঝা যায় যে, প্রেমের যত আধিক্য হইতে থাকে, তাহার অনুপাত অনুসারে বিচারশক্তি তত লোপ পায়। এই রীতি অনুসারে বুঝা যায় যে, শান্তভক্তের প্রেমাধিক্য বশতঃ বিচারজ্ঞান হ্রাস হইয়া শ্রীভগবানের সহিত সেব্য-সেবক সম্বন্ধযুক্ত হইয়া শান্ত রতি দাস্য আখ্যা প্রাপ্ত হয়; আবার দাস্যরতির পরিপাক দশায় প্রেমের আধিক্য বশতঃ এই দাস্য-ভক্তের বিচার-জ্ঞান আরও অধিকতর হ্রাস হইয়া দাস্যের শ্রীভগবানের প্রতি গৌরব-জ্ঞান বিশেষরূপ হ্রাস হইয়া মমতা বৃদ্ধি হয়, তখন তাহাকে সাখ্যভাব বলে। শ্রীভগবানে যখন এই সাখ্য, স্থায়ীভাব অবলম্বন করে, তখন তাহাকে সাখ্যরতি বলে। ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, একই ভগবৎ-প্রেম, ভজনপ্রভাবে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া, প্রথম শান্ত, পরে দাস্য, তারপরে সাখ্য, পরে বাৎসল্য, পরে ভাবের পরাকাষ্ঠা মধুরভাবে পরিণত হয়, এই পঞ্চবিধ ভাবে উত্তরোত্তর রসাধিক্যপ্রযুক্ত স্বাদাধিক্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। ইহাতে আরও বুঝিতে হইবে, সাখ্য, বাৎসল্য, এবং মধুর এই তিনটী ব্রজের ভগবদ্ভজনের ভাব বিশুদ্ধ চিন্ময়, প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের আদৌ গ্রাহ্য নহে; আর দাস্যভাব, প্রাকৃত অপ্রাকৃত ভাবের সন্ধিস্থল অর্থাৎ দাস্যভাবের প্রথম অবস্থা প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বটে, আর চরম অবস্থায়

ইহা চিন্ময় অবস্থায় পরিণত হয়, তখন এই দাস্তরস প্রাকৃত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয় না।

যাহা হউক, এই সমস্ত বিচার মনে করিয়া রাখিতে পারিলে চিন্ময় সাখ্যরতি কি প্রকারে বাৎসল্যরতিতে পরিণত হয়, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। যেরূপ প্রেমের ক্রমশঃ আতিশয্য বশতঃ বিচারশক্তি হ্রাস হইতে হইতে দাস্তের (Reverance) গৌরব সর্ব্বতোভাবে লোপ পাইয়া, যেরূপ সাখ্যরতিতে পরিণত হয়, তদ্রূপ সাখ্যের মমতা ক্রমশঃ আরও অধিক পরিবর্দ্ধিত হইয়া বিচারশক্তি ক্রমশঃ আরও হ্রস্ব হইয়া পরিশেষে সাখ্যের সম-গৌরবভাবের স্থানে গৌরব-হীনতা ভাবে ক্রমশঃ পরিণত হয়,পরে শ্রীভগবানে হীনগৌরব মনে হইয়া বাৎসল্য রতির বিকাশ হয়, এই রতি স্থায়ীভাব ধারণ করিলে বাৎসল্য স্নেহ বলে।* বাৎসল্য রস অতি উৎকৃষ্ট, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেননা, ইহাতে সাখ্যের মমতা, দাস্তের সেবা, এবং শান্তের দৃঢ়বিশ্বাস, এবং বাৎসল্যের বিশেষ গুণ গৌরবহীনতা, এই চারিটী রস বর্ত্তমান আছে; ইহাকেও মহাপ্রভু ভগবৎ-ভজনের চরম সীমা বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কেননা, বাৎসল্য-স্নেহে, মাতা ভক্তস্থানীয়া, আর সন্তান ভগবান্ স্থানীয়; সুতরাং মাতা এবং পুত্রে বিচার-বুদ্ধি বা ভেদবুদ্ধি রহিয়াছে। স্নেহের আধিক্যপ্রযুক্ত যখন মাতাপুত্রের ভেদবুদ্ধি নির্ব্বিচারে ঘুচিয়া যায়, তখন এই বাৎসল্য রতি, মধুর রতিতে পরিণত হয়।

এক্ষণে এই চিন্ময়-রাজ্যের অপ্রাকৃত মধুর ভাবটী কার্য্যকারণ প্রণালী অনুসারে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে গেলে বুঝা যায় যে, চিন্ময় বাৎসল্যরস যখন পরিণত হইয়া চিন্ময় মধুরভাব উৎপত্তি হয়, তখন চিন্ময় বাৎসল্যরসকে, চিন্ময়-মধুর-ভাব উৎপাদনের cause অর্থাৎ কারণ স্থানীয় বলিয়া বুঝিতে হইবে এবং চিন্ময় মধুর-ভাবকে effect বা কার্য্য স্থানীয় বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই চিন্ময় কারণ অর্থাৎ চিন্ময় বাৎসল্যভাব যখন নিষ্কাম, অহৈতুকী, কোন প্রকার

---

* মমতাধিক্যে গৌরবহীনতা হয়, ইহার দৃষ্টান্ত, যাঁহারা অতিবৃদ্ধ পিতামাতাকে সাক্ষাৎ দেবদেবী-জ্ঞানে সেবা করেন, তাঁহাদের নিকট শিক্ষা করিতে হয়। হিন্দু সমাজের উপস্থিত [illegible]নাবস্থায়ও এক্ষণ পর্য্যন্ত এই দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

কামাগন্ধশূন্য, তখন ইহার কার্য্যস্থানীয় চিন্ময় মধুরভাব যে অহৈতুকী এবং নিষ্কামা হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কেননা, কারণে যে উপাদান বর্ত্তমান থাকে, কার্য্যে তাহার অতিরিক্ত উপাদান কখন আসিতে বা হইতে পারে না। ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, চিন্ময় বাৎসল্যভাব যখন কামগন্ধহীন, অহৈতুকী, তখন এই মাতৃ-স্নেহের বাৎসল্য-রসের স্বরূপপরিণতি এই প্রকার মধুরভাবে কামগন্ধহীন অহৈতুকী মমতাধিক্য হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

এক্ষণে চিন্ময় বাৎসল্য-স্নেহের সহিত কান্তাকান্ত ভাবের বা মধুরভাবের সহিত তুলনা করিয়া বিচার করিতে গেলে দেখা যায়, বাৎসল্য ভাব যতই অহৈতুকী নিষ্কামা হউক না কেন, তথাচ মধুর রসে মমতাধিক্য বলিতেই হইবে, কেন না, বাৎসল্য-স্নেহে অভিভূত হইয়া মাতা সন্তানের সেবার জন্য সর্ব্বত্যাগী হইতে পারেন, নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারেন, কিন্তু মাতা মমতাধিক্য বশতঃ এ প্রকার জ্ঞানশূন্য হইতে পারেন না যে, তিনি সন্তানকে নিজের দেহদান করিয়া সন্তানের সেবা করেন অর্থাৎ দেহ-দান দ্বারা সন্তানের সুখসম্ভোগ করান; ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, মাতৃস্নেহ বা বাৎসল্য-স্নেহ, অহৈতুকী এবং নিষ্কামা বটে, একেবারে জ্ঞানশূন্য নহে, সুতরাং বাৎসল্যপ্রেমে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির গন্ধ কিছু কিছু আছে। আর চিন্ময় দেশীয় কান্তাকান্ত ভাব বা মধুরভাবে বাৎসল্যের সর্ব্বগুণ বর্ত্তমান আছে। অধিকন্তু বিচার বা জ্ঞানবুদ্ধি সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জিত অর্থাৎ মধুরভাবে মাতার ন্যায় সর্ব্বপ্রকার সেবা নির্ব্বিচারে সর্ব্বতোভাবে জ্ঞানশূন্য হইয়া, এমন কি নিজ দেহ দান পর্য্যন্ত করিয়াও সেব্যের সেবানন্দ ভোগ করিতে পারেন; সুতরাং চিন্ময় দেশই বিশুদ্ধ মধুরভাবের ভগবৎ-ভজনায়, বিচারবুদ্ধি বা জ্ঞান এবং কামাগন্ধহীন অর্থাৎ ইহা বিশুদ্ধ প্রেমের ভজনা, সুতরাং চিন্ময় মধুরভাবে ভগবৎ-ভজনাই ভক্তিমার্গীর চরম সাধনা।

এক্ষণে অল্প কথায় এই ভগবদ্ভজন বুঝিতে গেলে এই ভাবে বুঝিতে হয় যে, শ্রীভগবান্ই শ্রীকৃষ্ণ, তিনি সর্ব্বাশ্রয় এবং সর্ব্বাকর্ষক, তাঁহার নিত্যদাস তটস্থা শক্তিস্বরূপ জীবকে তিনি প্রতিনিয়ত প্রেমে আকর্ষণ করিতেছেন, সুতরাং ভগবৎপ্রেম জীবে বীজরূপে নিত্য বিরাজিত আছে। এই জন্য ভগবৎ-প্রেম

কখন সাধনসিদ্ধ নহে অর্থাৎ ইহা স্বাভাবিক, নিরীশ্বরবাদীদিগের মন সাংসারিক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে আবদ্ধ থাকে বলিয়া, তাহাদের ভগবৎ-প্রেমের বীজ হৃদয়ে বিকাশপ্রাপ্ত হয় না। আর শান্তভক্তগণের অর্থাৎ যাঁহাদের শ্রীভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস আছে, তাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীভগবানে এই দাস্তের প্রেম-বীজ অঙ্কুরিত হয়, পরে এই দাস্তের প্রেমাঙ্কুর পরিবর্দ্ধিত হইয়া, যখন পূর্ণ বিকসিত বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, তখন এই শান্তরীতি দাস্যরতি আখ্যা প্রাপ্ত হয়। আর সাখ্যরতি এই বৃক্ষের সুশোভিত পল্লবস্বরূপ, বাৎসল্যরতি সুগন্ধি পুষ্পস্বরূপ এবং মধুর রতি পরম সুস্বাদু ফলস্বরূপ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

ইহার ভাবার্থ এই যে, ভগবৎ-ভক্তির মূলই দাস্যভাব অর্থাৎ জীব শ্রীভগবানের নিত্যদাসজ্ঞানে সেবা করিবে, সুতরাং দাস্যরতিতে যে প্রকার ভগবৎ-সেবা প্রধান লক্ষ্য, সাখ্যরতিতে ঠিক সেই প্রকার সেবা প্রধান লক্ষ্য; ঠিক এই প্রকার বাৎসল্যেও সেবা প্রধান লক্ষ্য, এবং ঠিক এই প্রকার মধুর রতিতেও সেবা প্রধান লক্ষ্য। অতএব দাস্য, সাখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর রসের সর্ব্বপ্রকার ভক্তেরই শ্রীভগবৎ-দাস অভিমানই সর্ব্বপ্রধান ভাব এবং দাস্য হইতে সাখ্য, বাৎসল্যাদিক্রমে এই দাস্যরতি উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া মধুরভাবের ভজনায় এই দাস্যপ্রেম, চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে। তাই ভক্তি সাধনার জগৎ-শিক্ষাগুরু শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এই মধুরভাবে, কি প্রকার শ্রীভগবান্‌কে সাধনা করিতে হয়, তাহা তিনি তাঁহার নীলাচল লীলায়, বিশেষতঃ তাহার গম্ভীরা লীলায় নিজে আচরণ করিয়া জগৎকে এরূপভাবে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন যে, তাহা একবার স্থিরচিত্তে নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া পাঠ করিলে অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

উপরোক্ত পঞ্চবিধ ভাবের আদর্শ ভগবৎভক্তগণের ইতিহাসে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রে এবং অন্যান্য শাস্ত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ আছে। তাহার মধ্যে সনকাদি ঋষিগণ আদর্শ শান্তভক্ত, উদ্ধব আদর্শ দাস্যভক্ত, ব্রজের রাখালগণ সাখ্য প্রেমের আদর্শ ভক্ত, যশোদা বাৎসল্য-প্রেমের আদর্শ ভক্ত, এবং শ্রীকৃষ্ণ-কান্তা ব্রজগোপীগণ মধুর প্রেমের আদর্শ স্থানীয়া, আর গোপ-অভিমানী যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীভগবান্ স্থানীয়।

ইহাতে অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণকে ভগবানের স্থানীয় বলাতে এক

ঘোর প্রশ্ন উত্থাপন হইতে পারে যে, শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপীগণ, সাধারণ নাটক উপন্যাসের নায়ক নায়িকার ন্যায় Fictitious কাল্পনিক ভাব অথবা শ্রীবৃন্দাবনের কৃষ্ণ প্রকৃতই স্বয়ং ভগবান্ এবং গোপীগণ তাঁহার নিত্য লীলা-বিলাসের সহচারিণী।

এই জটিল প্রশ্নের প্রত্যুত্তর আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মত অনুসারে প্রদান করিতে গেলে; জটিল হইতে আরও জটিলতর বিষয়ের ভিতর প্রবেশ করিতে হয়; কেন না, পাশ্চাত্যভাবে যাঁহারা চিন্তা করেন, তাহারা বলেন যে, মহাভারত গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের ইতিহাস বর্ণিত আছে, এই প্রামাণ্য গ্রন্থ মহামুনি ব্যাসদেব কর্ত্তৃক বিরচিত; এই ব্যাসমুনি ৪৪০০ শ্লোকে মহাভারত রচনা করেন; পরে তাহার শিষ্যগণ এই মহাভারতে ৫৬০০ শ্লোক যোগ করিয়াছিলেন অর্থাৎ এই সময় মহাভারতে ১০,০০০ হাজার শ্লোক হয়। পরে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সময় এই গ্রন্থে আর ১০,০০০ হাজার শ্লোক হইয়া ২০,০০০ হাজার হয়। আর ভোজরাজার সময় আর ১০,০০০ হাজার শ্লোক ইহাতে যোগ হইয়া ৩০,০০০ হাজার হইয়াছে। পরে আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। এজন্য শ্রীল বঙ্কিমবাবু প্রমুখাৎ ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত অংশ বাদ দিয়া, বাসুদেব কৃষ্ণকে, সর্ব্ববিষয় পরিপূর্ণ মহাপুরুষ বা অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। আর গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের পূর্ণ আদর্শ গোপ অভিমানী যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণের কোন ইতিহাস, মূল মহাভারতে উল্লেখ নাই বলিয়া একেবারে তাহাকে কল্পিত বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন।

এ দিকে আবার গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ, বাসুদেব কৃষ্ণকে কথন তাঁহাদের উপাস্য বলিয়া স্বীকার করেন না; কেন না, বাসুদেব কৃষ্ণকে তাঁহারা শ্রীভগবানের অংশ অবতার বলিয়া মান্য করেন, আর যশোদানন্দ কৃষ্ণকে তাঁহারা স্বয়ং ভগবান্ অবতারী কৃষ্ণ বলিয়া ভজন করেন। আবার দেখা যায়, গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা, শ্রীকৃষ্ণ লীলার আদর্শ ইতিহাস গ্রন্থ ব্যাসদেব প্রণীত "শ্রীমদ্ভাগবত"কে নির্দ্দিষ্ট করেন। কিন্তু মহাভারত গ্রন্থকে কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায় আদর্শ গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করেন না। ইহার বিপরীত, নব্যসম্প্রদায় শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ আদৌ ব্যাসদেব বিরচিত নহে, ইহা যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা স্থিরনিশ্চয় করেন। ইহাদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাস করেন যে, গীতগোবিন্দ-প্রণেতা শ্রীল জয়দেব ঠাকুরের ভ্রাতা

ব্যোপদেব স্বামী এই ভাগবত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, এদিকে আবার ভিন্ন ভিন্ন বৈষ্ণব-সম্প্রদায় এই ভাগবতের নানাপ্রকার টীকা করিয়া এক কৃষ্ণকে আপন আপন সম্প্রদায় অনুরূপ আদর্শ উপাস্য করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কোন কোন সম্প্রদায় শ্রীকৃষ্ণকুব্জী, কোন সম্প্রদায় শ্রীকৃষ্ণরুক্মিণী, কোন কোন সম্প্রদায় লক্ষ্মীনারায়ণ, কোন কোন সম্প্রদায় রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ স্বীকার করিয়া তাঁহাকে দেবতাদিগের শ্রেষ্ঠ ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর অংশ অবতার জ্ঞান করিয়া, তাঁহারই পূজায় নিযুক্ত আছেন; এক কথায়, বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ব্যতীত অন্য কোন বৈষ্ণব-সম্প্রদায় স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই। ইহার মধ্যে আরও অনেক আপত্তি আছে, যথা—শ্রীভাগবত গ্রন্থে কোন গোপিকার, এমন কি, শ্রীরাধার নাম পর্য্যন্ত নাই। পরন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ,বিষ্ণু-পুরাণ, শ্রীগোবিন্দলীলামৃত, ইত্যাদি গ্রন্থে বৃন্দাবন-লীলার সহচরী গোপিদিগের নাম এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের কার্য্যের বিশেষ বর্ণনা আছে। অবৈষ্ণব পণ্ডিতগণ বহুকাল হইতে এই সমস্ত গ্রন্থ নিতান্ত আধুনিক কল্পিত জ্ঞান করিয় অপ্রামাণ্য বলিয়া অগ্রাহ্য করেন এবং এই সঙ্গে সমগ্র বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে একে-বারে ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখেন।

ধর্ম্মের যখন এই প্রকার বিপুল গ্লানি উপস্থিত হইল, তখন ধর্ম্মসংস্থাপন জন্য, প্রায় চারিশত বৎসর অতীত হইল, নবদ্বীপে শ্রীশচীমাতার গর্ভে গৌর-সুন্দরের আবির্ভাব হইল। তাঁহার জীবনী কমবেশী সকলেই কিছু কিছু জানেন, এজন্য তাঁহার প্রকট কালে অর্থাৎ জীবিত কালে এবং এ পর্য্যন্ত কেহ কেহ তাঁহাকে স্বয়ং ভগবানের অবতার, কেহ বা তাঁহাকে অংশ অবতার, এবং কেহ তাঁহাকে অসাধারণ প্রতিভাশালী ভক্ত বলিয়া বুঝিয়াছেন। তাঁহাকে যিনি যে ভাবে বলুন না কেন, তিনি উপরোক্ত বৈষ্ণব গ্রন্থের সত্যতা সম্বন্ধে সর্ব্ব-প্রকার বিবাদ মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বিশেষভাবে বুঝাইয়াছেন যে,

> "স্বতঃ প্রমাণ বেদ প্রমাণ শিরোমণি।
> লক্ষণা করিলে স্বতঃ প্রমাণতা হয় হানি ॥"

অর্থাৎ হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীর বেদপ্রমাণকে স্বতঃ প্রমাণ বলিয়া বুঝিবে। পরে তিনি প্রকাশানন্দকে উদ্ধার করিবার ছলে তিনি জগৎকে বুঝাইতেছেন যে,

ব্যাসদেবের বেদান্তসূত্র যখন বৈদিক শাস্ত্র-মধ্যে সর্ব্ববাদীসম্মতভাবে পরিগণিত, তখন এই বেদান্তসূত্র ব্যাস কি প্রকার রচনা করিয়াছিলেন, তাহা একবার স্মরণ করুন। ইহার ভাবার্থ এই যে, বেদ প্রকাশক ঋষিগণ ভগবৎ-আবিষ্ট হইয়াই অর্থাৎ শ্রীভগবানের আবেশপ্রাপ্ত হইয়া, বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই বিষয়টা আধুনিক ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, বেদ এবং বৈদিক শাস্ত্রসকল Revealation। যাহা হউক, মহাপ্রভু প্রকাশানন্দকে এই বিষয়টা এই ভাবে বলিতেছেন, যথা—

"প্রভু কহে বেদান্ত সূত্র ঈশ্বর-বচন।
ব্যাসরূপে কহিল যাহা শ্রীনারায়ণ ॥
ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব।
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥
উপনিষদ্ সহ সূত্র কহে যেই তত্ত্ব।
মুখ্যবৃত্তি সেই অর্থ পরম মহত্ত্ব ॥
গৌণবৃত্ত্যে যেবা ভাষ্য করিল আচার্য্য।
তাহার শ্রবণে নাশ হয় সর্ব্বকার্য্য ॥"

ইহার অভিপ্রায় এই যে, বেদান্তসূত্র ঈশ্বর বাক্য এবং উপনিষদ্‌ও ঈশ্বর বাক্যস্বরূপ অর্থাৎ দুই-ই (Revelation). ভগবৎ আবেশে লিখিত, সুতরাং উপনিষদ্ এবং বেদান্তসূত্র কখন এক অপরের বিরোধী নহে; তাই বলিয়া বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা স্বরূপ শ্রীল শঙ্করাচার্য্য-রচিত ব্রহ্মসূত্র নামক গ্রন্থ কখন ভগবান্-বাক্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না; কেন না, শ্রীল শঙ্করাচার্য্য নিষ্ক্রিয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদী, আর শ্রীভগবান্, সবিশেষ সক্রিয় সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী—সুতরাং শ্রীভগবানের আবেশ, শ্রীল শঙ্করাচার্য্যের কখনই হইতে পারে না, কেননা, যাহার আবেশ হইবে, তাহার গুণ, কর্ম্ম, এবং স্বভাব চিন্তা না করিলে, কখন কাহারও আবেশ হয় না। শ্রীল শঙ্করাচার্য্যের নির্ব্বিশেষ "ব্রহ্ম" যখন গুণকর্ম্ম এবং স্বভাববিহীন, তখন তাঁহার চিন্তা বা ধারণাও অসম্ভব এবং তাঁহার আবেশপ্রাপ্ত হওয়াও অসম্ভব। এজন্য শ্রীল শঙ্করাচার্য্যের ভগবৎ-ব্যাখ্যা বা মায়াবাদ পঠনপাঠন ভক্তিপন্থী সম্প্রদায়ের নিকট বিশেষ অপরাধ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

আবার শ্রীশ্রীমহাপ্রভু যুক্তি প্রমাণ দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন যে, শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ, শ্রীল ব্যাসদেবের বেদান্তসূত্রের বিশদ ব্যাখ্যাস্বরূপ নিজে রচনা করিয়াছেন, সুতরাং এই গ্রন্থ মূল বেদ এবং বেদান্ত শাস্ত্রের কথন বিরোধী নহে। কেবল ইহা নহে, মহাপ্রভু নিজে বিশেষতঃ তাঁহার প্রিয়শিষ্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী দ্বারা এই ভাগবত গ্রন্থের প্রতিশ্লোকের টীকা এবং বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া জীবের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে ভগবৎ-ভক্তি-পন্থী হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা তত্ত্ব-পিপাসু হইয়া যদি সনাতন গোস্বামীকৃত ব্যাখ্যাসহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন, তবে তিনি নিশ্চয় বুঝিবেন যে, শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ সম্পূর্ণ বেদমূলক। ব্যোপদেব কেন, বিদ্যাবুদ্ধিশাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন কোন মনুষ্য এই প্রকার গ্রন্থ রচনা করিতে বা এই গ্রন্থের এই প্রকার ব্যাখ্যা করিতে পারেন না; পরন্তু শ্রীভগবান্ একমাত্র জীবের উপর কৃপা করিয়া বেদ প্রকাশক ঋষিগণ দ্বারা যে প্রকার সমগ্র বেদ প্রকাশ (Revel) করিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ ব্যাসদেব কর্ত্তৃক এই অপার্থিব গ্রন্থ (Revel) প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামীও শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের আবেশে এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। মহাপ্রভু এবং গোস্বামিগণ, এই অপার্থিব গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিয়া জগৎকে বুঝাইয়াছেন, বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ, ব্রজের শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী গোপীগণও চিৎ-বিগ্রহ, শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসের স্থান বৃন্দাবন-ধামও চিদানন্দ-ময়, এবং শ্রীকৃষ্ণের নামটীও চিদানন্দময়, সুতরাং ইহার সমস্তই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে। ইহা ব্যতীত, তাঁহারা আরও বুঝাইয়াছেন, বৃন্দাবনের কৃষ্ণ চিন্ময় বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া, এক পদও অন্যত্র গমন করেন না; কেন না, যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন এবং কংসাদি অসুরসংহার কার্য্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য কথন হইতে পারে না, অথবা স্বয়ং ভগবান্ অর্জ্জুনের রথে আরোহণ করিয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে গিয়া অর্জ্জুনের সারথির কার্য্য করেন, ইহা কথনই সম্ভব হয় না। তবে বঙ্কিম বাবু প্রমুখাৎ আধুনিক পণ্ডিতগণ বাসুদেব কৃষ্ণকে অবতার বলিয়া স্বীকার করেন, তাহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের কোন আপত্তি নাই। কেন না, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের কোন কার্য্য অসম্ভব হইতে পারে না, তিনি যথন জগৎরূপে পরিণত হইতে পারেন, তথন তিনি উচ্চ জীব বা দেবতারূপে পরিণত হইবেন, তাহাতে বৈচিত্র্য কি?

এক্ষণে আমাদের আলোচ্য মূল প্রশ্নের উত্তর এই যে, মথুরা জেলার অন্তঃপাতী পার্থিব বৃন্দাবন নামক স্থানে, সর্ব্বব্যাপী, স্থান এবং কালে অপরিচ্ছন্ন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে, কখন কোন গৌড়ীয় বৈষ্ণব আবদ্ধ করিতে চাহে না, তবে বৃন্দাবনের গোপ-গোপীসহ শ্রীরাধাকৃষ্ণ বলিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা যে সত্বার অনুভূতি করেন, তাহা সাধ্যবস্তু, সাধন ব্যতীত কখন তাঁহার অনুভূতি হয় না, তাই ভক্তিশাস্ত্রে লিখিত আছে,—

"সর্ব্বথৈব দুরূহোঽয়মভক্তৈর্ভগবদ্রসঃ।
তৎপাদাম্বুজসর্ব্বস্বৈর্ভক্তিরেবানুরস্যতে॥"

"ভগবদ্ভক্তিরূপ রস অভক্ত ব্যক্তির পক্ষে সর্ব্বথা দুর্গম্য; কিন্তু ভগবৎ-পদ-সর্ব্বস্ব ভক্তেরা অনায়াসে তাহার আস্বাদপ্রাপ্ত হন।"

এক্ষণে শ্রীবৃন্দাবন ধাম, শ্রীকৃষ্ণ, এবং গোপীদিগের বিষয়, যাহা কিছু বর্ণনা করা হইল, তাহা শ্রবণ করিয়া, অনেকে মনে করিতে পারেন যে, আমি স্বকপোলকল্পিত একটী আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছি। ইহার প্রত্যুত্তরে বলা যাইবে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রের, কাহারও কোন নূতন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কোন বৈষ্ণব গ্রাহ্য করিবেন না, কেন না, মহাপ্রভু নিজে এবং তাঁহার পারিষদ গোস্বামীগণ সমস্ত তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়া রাখিয়াছেন, সেই ব্যাখ্যা দেশ, কাল, পাত্রানুসারে বিস্তার করিবার অধিকার সকলেরই আছে মাত্র। যাহা হউক, এই সন্দেহ দূরীকরণ করিবার জন্য নিম্নে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিলাম, যথা।—

"কৃষ্ণের মহিমা রহু কেবা তার জ্ঞাত।
বৃন্দাবন স্থানের আশ্চর্য্য বিভুতা॥
ষোল ক্রোশ বৃন্দাবন শাস্ত্রে প্রকাশে।
তার এক দেশে ব্রহ্মাণ্ডজাণ্ড ভাসে॥
অপার ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের নাহিক গণন।
শাখা চন্দ্র ন্যায় করি দিগ্ দরশন।"

ইহার দ্বারা বুঝুন যে, মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষাচ্ছলে, জগৎকে বুঝাইতেছেন,—ষোলক্রোশ বিস্তারের যে বৃন্দাবনের একপ্রান্তদেশে

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ভাসিতেছে, সেই বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ গোপগোপীসহ লীলাবিলাস করিয়াছিলেন এবং সেই বৃন্দাবনের কৃষ্ণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের উপাস্য। উপরোক্ত পয়ারে, মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনকে বিভু শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। ইহাতে বুঝিতে হইবে, স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ "বিভু," তাঁহার স্বরূপশক্তি রূপ গোপিকাগণও "বিভু," তাঁহার লীলাবিলাসের স্থান শ্রীবৃন্দাবন ধামও "বিভু"; সুতরাং প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে,—সচ্চিদানন্দময়।

আবার এক শান্তরসই অর্থাৎ শ্রীভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস, সাধনাভেদে দাস্যাদি ক্রমে Evolution পরিবর্দ্ধিত ও পরিণত হইয়া পরিশেষে মধুর রতিতে শেষ পরিণাম হইয়াছে। তাহার প্রমাণ যিনি ভাল করিয়া বুঝিতে চাহেন, তিনি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যলীলা উনবিংশতি পরিচ্ছেদ ভাল করিয়া পাঠ করিবেন। মহাপ্রভু শ্রীল রূপ গোস্বামীকে শুদ্ধভক্তির অনেক কথা বলিয়া পরে ভক্তির Evolution ক্রমশঃ পরিণতি, একটা দৃষ্টান্ত দিয়া এই প্রকারে বুঝাইতেছেন, যথা—

> "আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
> এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
> এই মত মধুরে সব ভাব সমাহার।
> অতএবাস্বাদাধিক্যে করে চমৎকার॥"

ইহার ভাবার্থ এই যে, ভৌতিক সৃষ্টিসকল যে প্রকার আকাশ নামক একটী ভূত ক্রমশঃ Evolution বিকসিত এবং পরিণত হইয়া, প্রথমতঃ বায়ু, পরে অগ্নি, তাহার পর জল, এবং সর্ব্বশেষে পৃথিবী ইত্যাদি এক ভূত পঞ্চ নামে অবস্থাভেদে নামপ্রাপ্ত হইয়াছে, ঠিক এই প্রকার একই শান্তভক্তি Evolution ক্রমশঃ বিকশিত এবং পরিণত হইয়া প্রথমতঃ দাস্য, পরে সখ্য, তাহার পরে বাৎসল্য, এবং সর্ব্বশেষে মধুর রতিতে পরিণত হয়। আবার দেখা যায়, যে প্রকারে আকাশে এক গুণ, বায়ুতে দুই গুণ, অগ্নিতে তিন গুণ, জলে চারি গুণ, এবং পৃথিবীতে পাঁচ গুণ আছে, ঠিক সেই শান্তভক্তিতে এক গুণ, দাস্যে দুই গুণ, সখ্যে তিনগুণ, বাৎসল্যে চারিগুণ এবং মধুরে পাঁচটী গুণ বর্ত্তমান আছে, এই জন্য গুণাধিক্যে আস্বাদাধিক্য হয় অর্থাৎ শান্ত অপেক্ষা দাস্যে গুণাধিক্য হেতু আস্বাদাধিক্য, দাস্য অপেক্ষা সখ্যে গুণাধিক্য-

হেতু আস্বাদাধিক্য, সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্যে গুণাধিক্য হেতু আস্বাদাধিক্য, এই প্রকার মধুরে সর্ব্বাপেক্ষা গুণাধিক্য হেতু সর্ব্বাপেক্ষা আস্বাদাধিক্য অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

আবার অনেকে আর এক আপত্তি উত্থাপন করেন যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-গণের সাধনভজন যদি বেদ উপনিষদাদি সৎশাস্ত্রানুমোদিত হয়, তবে ব্রজের মধুর ভাবের সাধনার কথা উপনিষদে কোন উল্লেখ নাই কেন? এই আপত্তি নিতান্ত অমূলক, কেন না, বৃহদারণ্যকোপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রহ্মণ ভক্তিভাবে পাঠ করিলে এই সংশয় বিদূরিত হইবে। ভক্তগণের সুবিধার জন্য নিম্নে তথা হইতে একটী বচন উদ্ধৃত করা হইল :—

"তদ্ যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরমেবায়াং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরং তদ্‌বা অস্যৈতদাপ্তকামমাত্মকামমকামং রূপং শোকান্তরম্ ॥"

ইহার ভাবার্থ এই যে, যে প্রকার প্রিয়াস্ত্রীতে সম্পরিষ্বক্তো অর্থাৎ সম্যক্ প্রকারে আসক্তি হইলে, জীবের অন্তর এবং বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয়, তদ্রূপ অর্থাৎ এই প্রকার কান্তাকান্ত ভাবে বা মধুর ভাবে জীব প্রাজ্ঞোনাত্মা অর্থাৎ শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া, তাহার কি বাহ্য, কি অন্তর, ইহার কোন জ্ঞানই থাকে না। ইহাই জীবের আত্মকাম, আপ্তকাম, অকাম ও শোকরহিত রূপ। বৃহদারণ্যকোনিষদের এই বচন এবং এই অধ্যায়ের এই ব্রহ্মণের পরপরবর্ত্তী বচন মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে, ব্রজগোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন এবং বিরহ যেরূপ উভয় তুল্য অর্থাৎ ইহার উভয় অবস্থায় যে প্রকার তাহারা শ্রীকৃষ্ণে আকৃষ্ট হইয়া দেহ দেহী সম্বন্ধ রহিত থাকে, সেই প্রকারের ভগবদ্ভজনা জীবের পুরুষার্থ বলিয়া উপনিষদ অভিব্যক্ত করিতেছেন। তাই মনে হয়, শ্রীশ্রীমহাপ্রভু সনাতন গোস্বামী আদি নিত্যসিদ্ধ অনুচরগণ দ্বারা এবং নিজে গোপীভাব স্বীকার করিয়া জীবগণকে বেদবিহিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভগবৎ-ভজন শিক্ষা দিয়াছেন; যাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্মের নিগূঢ় সাধনতত্ত্ব ভাল করিয়া

বুঝিতে চাহেন, তিনি শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে মধ্যলীলা অষ্টম অধ্যায়ে ভক্তবীরকেশরী শ্রীল রামানন্দ রায়ের সহিত শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সাধনতত্ত্ব-বিচার ভাল করিয়া পাঠ করুন।

জীবশিক্ষার জন্য মহাপ্রভু কি প্রকার সাবধানতার সহিত, রামরায়ের সহিত প্রশ্নোত্তর করিয়াছিলেন, তাহা পাঠকগণকে বুঝাইবার জন্য একটী প্রস্তাব নিম্নে অবতারণা করা হইল। * মহাপ্রভু, শ্রীল রামরায়ের মুখে রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন যে,—

"প্রভু কহে জানিল রাধাকৃষ্ণ প্রেমতত্ত্ব।
শুনিতে চাহি যে দোঁহার বিলাস-মহত্ত্ব॥"

মহাপ্রভুর এই প্রশ্নের গূঢ় অভিপ্রায় সাধারণ পাঠকগণের একটুকু বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বে বৈষ্ণবশাস্ত্রের উপদেশানুসারে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, যশোদানন্দন কৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্ এবং অসুর-সংহারাদি যুগধর্ম্ম রক্ষা করা শ্রীভগবানের নিজ কার্য্য নহে। জীবকে ভগবৎ-প্রেম শিক্ষা দেওয়াই তাঁহার নিজ কার্য্য, তাই শ্রীভগবান্ জীবশিক্ষার জন্য এক এক ব্রহ্মাণ্ড করিয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে পর্য্যায়ক্রমে নিত্যলীলা করিতেছেন। লীলাবিলাস ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, একটী Theatre বা নাট্যশালার কার্য্য ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখুন। একই ব্যক্তি কখন পুরুষ, কখন স্ত্রী, কখন রাজা, কখন প্রজা, কখন ভক্ত, কখন ভগবান্ ইত্যাদি নানারূপে দর্শকগণকে নীতি শিক্ষা দেয়। ঠিক সেই প্রকার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর স্বয়ং ভগবান্ও তাঁহার প্রজার মঙ্গল-বিধানার্থ সময় সময় লীলাবিলাসরূপে নাট্যশালায় নিজে বহুরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার প্রজাদিগের মঙ্গলবিধান করেন। দ্বাপর যুগের শেষভাগে বৃন্দাবন-লীলাও স্বয়ং ভগবানের একটী লীলা বলিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীশ্রীমহাপ্রভু-প্রমুখাৎ বুঝিয়াছেন, সুতরাং বৃন্দাবনের গোপ, গোপী, ধেনু, বৎস, বৃক্ষ, লতা, পর্ব্বত, ইত্যাদি সমস্তই, এক স্বয়ং ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন কাচ বা সাজমাত্র, জীবের

* ইহা সাধারণ পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিদিগের নিকটও অতি দুর্ব্বোধ্য, বড় সুখের বিষয়, শ্রীল রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় "রায় রামানন্দ" নামক এই অতি গূঢ়তত্ত্বের সুবিস্তীর্ণ ব্যাখ্যা-স্বরূপ একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া, বৈষ্ণব-সাহিত্যজগৎকে একটী উজ্জ্বলরত্নে ভূষিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থের সাহায্যে এই বৈষ্ণবসাধনতত্ত্ব বুঝিতে কাহারও ক্লেশ পাইতে হইবে না।

প্রতি কৃপা করিয়া, ভক্তের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য চিন্ময় বৃন্দাবনরূপ রঙ্গমঞ্চে এই সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর রসোদ্দীপক লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই লীলার প্রধান নায়িকা বা চরমভক্ত শ্রীমতী শ্রীরাধিকা, আর যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ এই নাট্যলীলার সর্ব্বপ্রধান নায়ক বা স্বয়ং ভগবানের স্থানীয়। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীল রামরায়কে প্রশ্ন করিলেন, এই ভক্ত-ভগবান্‌রূপ রাধাকৃষ্ণের বিলাস-মাহাত্ম্য আমাকে বল—অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চ অঙ্গের ভক্ত এবং ভগবানের মধ্যে কি প্রকার সম্বন্ধ, তাহা আমাকে পরিষ্কার করিয়া বল। তাহার প্রত্যুত্তরে—

"রায় কহে কৃষ্ণ হয় ধীর ললিত।
নিরন্তর কামক্রীড়া যাহার চরিত॥
রাত্রি দিন কুঞ্জক্রীড়া করে রাধা সঙ্গে।
কৈশোর বয়স সফল কৈল ক্রীড়া রঙ্গে॥"

ধীরললিত নায়ক নায়িকাদিগের চরিত্র অর্থাৎ স্বভাবই এই যে, তাঁহারা নিরন্তর অর্থাৎ দিবারাত্রির মধ্যে অষ্টপ্রহরই কামক্রীড়া করেন। ভক্তবীরকেশরী রামানন্দ রায় মহাপ্রভুর প্রশ্নের উত্তরে জগৎকে বুঝাইয়াছেন যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের পূর্ণাদর্শভক্ত শ্রীমতী শ্রীরাধিকা এই প্রকার ধীরললিতা নায়িকা স্থানীয় এবং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকার ধীরললিত নায়ক স্থানীয়। ইহা শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু বলিলেন যে,—

"এহ হয়, আগে কহ আর।"

এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, মহাপ্রভু রামরায়ের কথাকে ভুল বলিলেন না 'এহ হয়' বলিলেন; কিন্তু পরক্ষণেই বলিলেন যে, 'আগে কহ আর' অর্থাৎ ইহাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভাব বল। এই প্রকার কেন বলিলেন? ইহার ভাব কি? অর্থাৎ রাম রায়ের কথা প্রথমে মণ্ডন করিয়া পরে খণ্ডন করিলেন কেন? অবশ্য মহাপ্রভুর অভিপ্রায় অচিন্ত্যনীয়, তবে যুক্তিতর্কের দ্বারা যাহা বুঝা যায়, তাহাতে মনে হয়, বৈদিকধর্ম্ম, পুরাণ ও তন্ত্রের আবরণে বেদ প্রচার করা মহাপ্রভুর গূঢ় অভিপ্রায়, তাই বৃহদারণ্যক্ উপনিষদের উপরোক্ত বচনের প্রথমাংশের সহিত রামানন্দ রায়ের বাক্যের ঐক্য হইল বলিয়া মহাপ্রভু বলিলেন, 'এহ হয়'। উক্ত উপনিষদের প্রথম অংশ এই—"তদ্‌যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষক্তো ন

বাহ্যং কিঞ্চন বেদ” এই বচনের অর্থে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, সম্পরিষক্ত অর্থাৎ সম্যক্‌প্রকারে আসক্ত নায়কনায়িকার ‘অন্তর এবং বাহ্যজ্ঞান’ থাকে না, আবার এই সম্পরিষক্তা অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে আসক্তা নায়কনায়িকাকে আধুনিক বঙ্গ-ভাষায়, বিশেষতঃ বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থে ধীরললিত নায়কনায়িকা বলে। রামরায় যখন ভক্ত এবং ভগবান্‌কে অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণকে ধীরললিত বলিলেন, তখন উহা কতক সম্মত বলিয়া মহাপ্রভু মণ্ডন করিয়া বলিলেন, ‘এহ হয়’। আবার এই বচ-নের অপরাংশ যথা—“নান্তরমেবায়ং পুরুষ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ’’ ইহার ভাবার্থ এই যে, ঠিক এই প্রকার অর্থাৎ ধীরললিত নায়ক-নায়িকাদিগের স্থায় শ্রীভগবান্ কর্তৃক ভক্তজীব আলিঙ্গিত হইলে তাঁহাদেরও কোন প্রকার ভেদজ্ঞান থাকে না। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, বেদ পরিষ্কারভাবে জগৎকে বুঝাইতেছেন—ভক্ত এবং ভগবানে যখন সম্পরিষক্তরূপে আসক্তি হয়, তখন স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ বা নায়কনায়িকা-ভেদ থাকে না। তাই মহাপ্রভু রামরায়কে বলিলেন—‘এহ হয়, আগে কহ আর’। ইহার অভিপ্রায় এই যে, রাধাকৃষ্ণের অর্থাৎ ভক্ত এবং ভগবানকে ধীরললিত নায়ক-নায়িকা সম্বন্ধ বলিলে বেদের অভিপ্রায় ঠিক প্রকাশ হয় না,কেন না,সম্পরিষক্ত অর্থাৎ সম্যক্ প্রকারে আসক্ত বা ধীরললিত নায়কনায়িকাদিগের অন্ত কোন প্রকারে বাহ্যজ্ঞান থাকে না, ইহা সত্য হইলেও উভয়ের মধ্যে স্ত্রীপুরুষের জ্ঞান থাকে, তাই বেদের অভিপ্রায় পূর্ণভাবে প্রকাশ করিবার জন্য মহাপ্রভু, রামরায়কে বলিলেন, ‘আগে কহ আর’। তখন রামরায় বিশেষ ফাঁপরে পড়িয়া বলিলেন যে,—

“আর বুদ্ধিগতি নাহি আর ॥”

পরে মহাপ্রভুর কৃপায় রামরায় বলিলেন—

“যেবা প্রেমবিলাস বিবর্ত্ত এক হয়”

অর্থাৎ “না সো রমণ না হাম রমণী’’ ভাব হয়। ইহার ভাবার্থ এই যে, ভক্ত সর্ব্ব-ইন্দ্রিয় দ্বারা যখন শ্রীভগবানে সম্পরিষক্ত অর্থাৎ সম্যক্ প্রকারে আসক্ত হন, তখন ভক্ত ও ভগবান্ এই উভয়ের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত নায়কনায়িকা বা স্ত্রী-পুরুষ ভাবও থাকে না, অর্থাৎ জীবের তখন সর্ব্বপ্রকার মায়ার আবরণ বিক্ষিপ্ত হইয়া তাহার স্বরূপে অবস্থিতি করে অর্থাৎ অগ্নি এবং স্ফুলিঙ্গ বা সূর্য্য

এবং তাহার রশ্মিবৎ অচিন্ত্য ভেদাভেদ স্বরূপে অবস্থিতি করে। ইহাকেই শ্রীরাধার 'অধিরূঢ় মহাভাব' বলে; ইহাই জীবের চরম পুরুষার্থ।

পুনরায় এক আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম যদি বেদানুমোদিত হয় (বেদে অনেক দেবতার নামও উল্লেখ আছে), তবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা দেবতা পূজার বিরোধী কেন? কেন তাঁহাদের শাস্ত্র নিষেধ করিয়াছে—

"না ভজিবে দেবাদেবী।"

এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে দেখা যায় যে, পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্রাদির ন্যায় বিশিষ্ট গুণযুক্ত বস্তুকে বা ব্যক্তিকে দেবতা বলিয়া বেদে অভিহিত করিয়াছে; কিন্তু তাই বলিয়া প্রাকৃতিক কোন পদার্থ বা কোন জীবকে বা কোন দেবতাকে উপাসনা বা পূজা করিবার বিধি মূলবেদে নাই, বরং বিশেষ নিষেধ আছে :—

"অন্ধতমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভুয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ॥"

যজুঃ॥ অঃ ৪০। মঃ ৯॥

ইহা যজুর্ব্বেদের বচন। ইহার অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি অসম্ভূতি অর্থাৎ অনাদি প্রকৃতিরূপ কারণকে ব্রহ্মস্থানীয় করিয়া উপাসনা করে, সে অন্ধকার অর্থাৎ অজ্ঞান এবং দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হয়। আর যে ব্যক্তি সম্ভূতিকে অর্থাৎ সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, বায়ু, অগ্নি, বৃক্ষ, লতা, জীব, জন্তু দেবাদি যাঁহাদের জন্ম, মৃত্যু বা উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় আছে, এই প্রকার প্রাকৃতিক সৃষ্ট পদার্থকে অর্থাৎ সম্ভূতিকে শ্রীভগবানের স্থানীয় করিয়া উপাসনা বা পূজা করে, সে পূর্ব্বোক্ত অন্ধকার হইতে অধিক অন্ধকারে পতিত হয় অর্থাৎ চিরকাল ঘোর নরকে পতিত হইয়া বিশেষ যাতনা ভোগ করে।

"ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্যশঃ॥"

যজুঃ॥ অঃ ৩২। মঃ ৩॥

ইহা যজুর্ব্বেদের বচন। ইহার অর্থ এই যে, যিনি জগতে সর্ব্বব্যাপক,

তাঁহার প্রতিমা কখন হয় না, অর্থাৎ যিনি সর্ব্বব্যাপক, যিনি অতি বৃহৎ এবং অতি সূক্ষ্ম, যাঁহার পরিমাণ করা যায় না, যাঁহার সদৃশ জানা যায় না, তাঁহার প্রতিমা কখন নির্ম্মাণ হইতে পারে না।

"যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥"

ইহা কেনোপনিষদের বচন, ইহার ভাবার্থ এই যে, যিনি বাক্যের ইয়ত্তা অর্থাৎ বিষয় নহেন এবং যাঁহার ধারণা ও সত্ত্বা বশতঃ বাক্যের উদ্ভব হয়, তাঁহাকে ব্রহ্ম জানিয়া উপাসনা কর; তদ্ভিন্ন অন্য কোন (প্রাকৃতিক) পদার্থ উপাস্য নহে।

"যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥"

ইহাও কেনোপনিষদের বচন, ইহার ভাবার্থ এই যে, যিনি মনের ইয়ত্তা অর্থাৎ বিষয়ীভূত নহেন, এবং যিনি মনকে মনন করেন, তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া তুমি জান এবং তাঁহার উপাসনা কর; তদ্ভিন্ন অন্য কোন জীব এবং প্রাকৃতিক পদার্থকে ব্রহ্মস্থানীয় করিয়া উপাসনা করিও না।

"যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যন্তি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥"

চক্ষু দ্বারা যিনি দৃষ্ট হন না এবং যাঁহার নিমিত্ত চক্ষু, বস্তুসকল দেখিতে পায়, তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান এবং তাঁহারই উপাসনা কর; তদ্ভিন্ন অন্য কোন সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, অগ্নি আদি কোন প্রাকৃতিক সৃষ্ট বস্তুকে উপাসনা করিও না।

"যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥"

ইহার ভাবার্থ এই যে, শ্রোত্র দ্বারা যিনি শ্রুত হন না এবং যাঁহার নিমিত্ত

শ্রোত্র শুনিতে পায়, তুমি তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জান এবং তাঁহার উপাসনা কর; তদ্ভিন্ন শব্দাদি কোন সৃষ্ট পদার্থকে তাঁহার স্থানে উপাসনা করিও না।

"যৎপ্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥"

ইহা কেনোপনিষদের বচন, ইহার ভাবার্থ এই যে, যিনি প্রাণসমূহের দ্বারা চালিত নহেন এবং যাঁহার নিমিত্ত প্রাণ গতিশীল হয়, তুমি তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জান এবং উপাসনা কর। তদ্ভিন্ন বায়ু আদিকে উপাসনা করিও না।

এক্ষণে এই সমস্ত বেদ এবং উপনিষদের বাক্যে সপ্রমাণ হইতেছে যে, জীব-সৃষ্টি এবং প্রাকৃতিক সৃষ্টির মধ্যে কোন জীব বা কোন বস্তু, বেদ অনুসারে উপাস্য হইতে পারে না। তবে বেদে অষ্টবসু (পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা, সূর্য্য এবং নক্ষত্র), দ্বাদশ আদিত্য (বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, এই দ্বাদশ মাস), একাদশ রুদ্র (প্রাণ, অপান, সমান, ব্যাণ, উদান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয় এবং জীবাত্মা), ইন্দ্র (পরম ঐশ্বর্য্যের হেতু বিদ্যুৎ), প্রজাপতি (যজ্ঞের দ্বারা বায়ু, বৃষ্টি, জল, এবং ঔষধির বিশুদ্ধি হয় বলিয়া, এক কথায় প্রজাপালন হয় বলিয়া যজ্ঞকে প্রজাপতি বলিয়া বেদ উল্লেখ করিয়াছে) ইত্যাদি অনেক দেবতার উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু বিচারক্ষম ব্যক্তি-মাত্রেই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে, বেদের এই অনেক দেবতার মধ্যে কেহ শ্রীভগবান্‌বাচক নহেন, সমস্তই জীব এবং প্রকৃতিবাচক; সুতরাং বেদানুসারে ইঁহাদের কেহই উপাস্য নহেন; ইঁহাদের একমাত্র পতি শ্রীভগবান্‌ই জীবের একমাত্র উপাস্য। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে, ইহারা জাগতিক অন্যান্য সৃষ্ট বস্তু হইতে অধিকতর শ্রেষ্ঠ গুণযুক্ত, এই জন্য বেদে ইহাদিগকে দেবশব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। আবার ভক্তিমার্গিগণ, এই বহু দেবতার দর্শন এবং স্মরণ করিলে, বিশ্বপতির বা তাঁহাদের প্রাণপতির চিত্রবিচিত্র মহিমা হৃদয়-পটে সমুদিত হইয়া, নানাবিধ সাত্ত্বিক ভাবসকলের স্ফূর্ত্তি হইয়া অতুল

আনন্দ ভোগ করেন। এইসকল ভক্তগণ এই সমস্ত দেবতাকে তাঁহাদের প্রাণপতির বিভূতি বলিয়া জ্ঞান করেন, তাই ইঁহাদিগকে দেবতা বলিয়া ভক্তি করিলে কোন দোষ হয় না। এই প্রসঙ্গে আর একটী বিচার করিতে হইবে যে, এই জগতের যে সমস্ত বস্তু যে অবস্থায় আপন আপন গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাব অনুসারে স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া বিরাজিত রহিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেক বস্তু লইয়া ব্যষ্টিভাবে বিচার করিলে পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইবে যে, এই সকল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রত্যেক বস্তুর গুণ, কর্ম্ম, এবং স্বভাব, সমষ্টি অর্থাৎ পূর্ণগুণকর্ম্ম এবং পূর্ণস্বভাবযুক্ত শ্রীভগবান্ হইতে ইহারা প্রত্যেকেই প্রাপ্ত হইতেছে। এই বিষয়টা এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, সমগ্র বা সমষ্টি গুণ কর্ম্ম এবং স্বভাবের আধার শ্রীভগবান্ এবং ব্যষ্টি গুণ কর্ম্ম এবং স্বভাবের আধার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জীব এবং প্রাকৃতিক সৃষ্টপদার্থসকল। ইহাতে বুঝিতে হইবে, সান্ত অর্থাৎ সসীম, রূপ, গুণ, কর্ম্ম, এবং স্বভাবযুক্ত জীব, অনন্তরূপ গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাবযুক্ত অনন্তদেবের অনন্ত মহিমার অন্ত করিতে না পারিয়া, যেস্থানে বা যে কোন প্রাকৃতিক পদার্থে বা যে কোন জীবে অনন্তদেবের রূপ, গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাবের আভাস প্রত্যক্ষ করিলে, সেই সময় ভগবৎ-ভক্ত হৃদয়ের আবেগে ইহার এক এক ভাবে বিমোহিত হইয়া নির্ব্বিচারে শ্রীভগবান্‌কে এক প্রাকৃতিক বা অপ্রাকৃতিক নামে অভিহিত করিয়া তাহাদের হৃদয়ের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। ভক্তি চিরকাল সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বস্থানে বিচার-বিরোধী; ইহা পূর্ব্বে বিশেষ করিয়া বুঝান হইয়াছে, তাই মনে হয়, যেন বেদ-প্রকাশক ঋষিগণ, আপন আপন ভাবে বিভোর হইয়া শ্রীভগবান্‌কে নানা প্রকার প্রাকৃতিক পদার্থের নামে অভিহিত করিয়াছেন। পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণার্থে নিম্নে তাঁহার একটী নামের উল্লেখ করিতেছি, যথা—

"ওমিত্যেদক্ষরমিদং সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানম্।"

ইহা মাণ্ডুক্যোপনিষদের বচন, ইহার ভাবার্থ এই যে, বেদাদি শাস্ত্রে পরমেশ্বরের প্রধান এবং স্বকীয় নাম "ওঁ" কথিত আছে, তাঁহার অন্য নাম সকল গৌণিক বলিয়া বুঝিতে হইবে।

"সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদসংগ্রহেণ ব্রবীম্যো-মিত্যেতৎ ॥ বল্লী ২ মং ১৫ ॥

ইহা কঠোপনিষদের বচন। ইহার ভাবার্থ এই যে, সর্ব্ববেদে যাঁহার বিষয়ের আলোচনা, ধর্ম্মানুষ্ঠান রূপ তপশ্চরণ হয় বলিয়া স্বীকার করে এবং যাঁহাকে প্রাপ্তির ইচ্ছা করিয়া ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্বীকৃত হয়, তাঁহার নাম "ওঁ" এইরূপ লিখিত আছে।

ভগবন্তক্তগুরু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব, নাম এবং নামী অভেদ, ইহা জগৎকে বুঝাইয়া গিয়াছেন এবং বেদাচার্য্য প্রকাশানন্দকেও ইহা এই ভাবে বুঝাইয়াছিলেন ঃ—

"প্রণব (ওঁ) যে মহাবাক্য বেদের নিদান।
ঈশ্বর স্বরূপ প্রণব (ওঁ) সর্ব্ববিশ্বধাম ॥
সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের প্রণব উদ্দেশ।
তত্ত্বমসি বাক্য হয় বেদের এক দেশ ॥"

আবার স্থানান্তরে মহাপ্রভু বলিয়া গিয়াছেন যে,—

"প্রণবের যে অর্থ গায়ত্রীতে সেই হয়।
সেহ অর্থ চতুঃশ্লোকীতে * বিবরিয়া কয় ॥"

ইহার ভাবার্থ এই যে, অ, উ, এবং ম এই তিনটী অক্ষর মিলিত হইয়া "ওঁ" হইয়াছে। এক্ষণে এই অ, উ, এবং ম এই তিন হইতে পরমেশ্বরের অনেক নাম হইতে পারে, তাই মহাপ্রভু জগৎকে বুঝাইতেছেন যে, তোমরা কখন বেদের নিদান স্বরূপ "ওঁ" শব্দের অর্থ অন্য শাস্ত্র হইতে গ্রহণ করিও না, বেদের অর্থ বেদই প্রকাশ করিবে ; কেননা, বেদ ভগবদ্বাক্য, শ্রীভগবান্ ব্যতীত তাঁহার বাক্যের অর্থ অন্য কেহ বুঝিবে না। ইহার মধ্যে বিশেষ করিয়া বুঝাইতেছেন যে, "ওঁ"কারের অর্থ গায়ত্রীতে অর্থাৎ গায়ত্রীর অর্থে শ্রীভগবান্ নিজে প্রকাশ করিয়াছেন।

যাহা হউক, এই সমস্ত বিচারে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীভগবানের

* বেদ।

"ওঁ" এই নাম তাঁহার নিজস্ব নাম, এবং অন্য নাম সমস্ত গৌণ অর্থাৎ "ওঁ" এই নাম করিলে জগতের অন্য কোন পদার্থ বুঝা যায় না, একমাত্র শ্রীভগবান্‌কেই বুঝা যায়; কিন্তু তাঁহার অন্য যে কোন নাম করা যায়, তাহা প্রকৃতি বা জীববাচক হইবেই হইবে। যথা,—

"ওঁ, খং, ব্রহ্ম" ॥

ইহা যজুর্ব্বেদের বচন, ওঁ, খং এবং ব্রহ্ম ভগবানের এই তিনটি নাম সমবেত হইয়া এই বচনটী হইয়াছে :—

"স সেতু বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়"

সেই পরমেশ্বর এই লোকসকল অর্থাৎ দ্যুলোক এবং ভূর্লোক, এক কথায়, সমগ্র জগৎ চূর্ণ না হইয়া যায়, এজন্য তিনি সর্ব্বাকর্ষক বা সর্ব্বরক্ষক বা সর্ব্বমঙ্গলের জন্য ধারণ করিয়া রহিয়াছেন; এই বেদ-বচন হইতে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, ওঁ, শ্রীভগবানের প্রধান নাম। ইহার একভাবের অর্থে সর্ব্বরক্ষক বা সর্ব্বমঙ্গলময় বুঝায়। খং—ইহাও শ্রীভগবানের একটী নাম; ইহাতে অন্য প্রকার অর্থও হয়, যথা—খং অর্থে আকাশও বুঝায়। ব্রহ্ম অর্থে বৃহৎ বস্তু বুঝায়, অথচ ইহা শ্রীভগবানের একটী প্রধান নাম। ইহা দ্বারা যজুর্ব্বেদের এই বচনের অর্থ এই প্রকারে বুঝিতে হইবে যে, শ্রীভগবান্ সর্ব্বমঙ্গল করেন বলিয়া, তাঁহার নাম "ওঁ" হইয়াছে। তিনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী বলিয়া তাঁহার নাম "খং" হইয়াছে, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া তাঁহার নাম "ব্রহ্ম" হইয়াছে। আবার দেখা যায়—

স ব্রহ্মাঃ স বিষ্ণুঃ স রুদ্রঃ স শিবঃ সোঽক্ষরঃ সঃ পরমঃ স্বরাট্।
স ইন্দ্রঃ স কালাগ্নিঃ স চন্দ্রমা ॥ ৭ ॥ কৈবল্য উপনিষদ্।

ইহার ভাবার্থ এই যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, শিব, স্বরাট ও কালাগ্নি, অক্ষর ইন্দ্র, চন্দ্র ইত্যাদি, বিশিষ্ট গুণযুক্ত দেবতাদিগের নাম দ্বারা শ্রীভগবান্‌কে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহাতে যেন কেহ ভুল করিয়া না বুঝেন যে, বেদে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্রাদি দেবগণকে ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করিতে উপদেশ আছে। কেননা, বেদ পাঠ করিবার কে অধিকারী, তাহা ঋগ্বেদ্ পরিষ্কার ভাবায় এই মহাবাক্যের দ্বারা জগৎকে বুঝাইয়াছেন :—

"ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইতি সমাসতে ॥"

ঋঃ। মঃ ১॥ সূঃ ১৬৪। মং ৩৯॥

ইহার ভাবার্থ এই যে, চারিবেদে দেবতাদিগের অধিনিবাস আছে, অর্থাৎ দেবতাদিগের বিষয় উল্লেখ আছে। সেই বেদ সকলের (প্রতিপাদ্য) অক্ষর অর্থাৎ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত অবিনাশী (দেবের দেবতা) পরম পুরুষকে অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌কে (বেদ পাঠ করিয়া) যাহারা জানিতে না পারেন (অর্থাৎ দেবতাদিগকে ঈশ্বর মনে করেন), তাঁহাদের বেদ পাঠ করিয়া কি ফল হইবে?

যাহা হউক, উপরোক্ত কৈবল্য উপনিষদের বাক্যানুসারে দেববাচক শব্দে, শ্রীভগবান্‌কে অভিহিত করিতে গেলে, এই প্রকার অর্থ করিতে হয়, যথা—স ব্রহ্মা, স বিষ্ণুঃ, স রুদ্রঃ, স শিবঃ সোঽক্ষরঃ সঃ পরমঃ স্বরাট্। স ইন্দ্রিয়, স কালাগ্নি, স চন্দ্রমা॥ ইহার ভাবার্থ এই যে, সর্ব্ব জগতের স্রষ্টা বলিয়া শ্রীভগবান্‌কে "ব্রহ্মা" নামে অভিহিত করা যায়, সর্ব্বব্যাপী বলিয়া শ্রীভগবান্‌কে বিষ্ণুনামে অভিহিত করা যায়; এই প্রকার দুষ্টকে দণ্ড দিয়া রোদন করান বলিয়া "রুদ্র" বলা যায়; মঙ্গলময় এবং সর্ব্বকল্যাণের কর্ত্তা বলিয়া "শিব," সকলের পালক এবং পরমৈশ্বর্য্যবান্ বলিয়া "ইন্দ্র", সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত অবিনাশী বলিয়া "অক্ষর", আনন্দস্বরূপ এবং সকলকে আনন্দিত করেন বলিয়া "চন্দ্র" ইত্যাদি অনেক নামে সর্ব্ব বেদ এবং উপনিষদে শ্রীভগবান্‌কে অভিহিত করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার নিজস্ব নাম "ওঁ" অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণ' গায়ত্রী অর্থে ইহাই বুঝা যাইবে।

"ওঁকারের অর্থ :—

অ, উ, এবং ম এই তিনটী অক্ষর মিলিত হইয়া ওঁকার হইয়াছে। অ হইতে বিরাট, অগ্নি, বিশ্বাদি বুঝায়। উ হইতে হিরণ্যগর্ভ, বায়ু, তৈজসাদি, ম হইতে ঈশ্বর আদিত্য এবং প্রজ্ঞাদি নাম সূচিত করে। ইহার ভাবার্থ এই যে,—

অ—বিরাট—যিনি বিবিধ চরাচর জগৎ প্রকাশক।

অ=অগ্নি--যিনি জ্ঞানের স্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ, এবং যাহাকে জানিবার, প্রাপ্ত হইবার এবং পূজা করিবার যোগ্য।

অ=বিশ্ব—যাহাতে আকাশাদি সমগ্র ভূত প্রবেশ করিয়া থাকে অথবা যিনি সর্ব্বভূতে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন।

উ=হিরণ্যগর্ভ্য *—যাঁহা হইতে সূর্য্যাদি তেজসম্পন্ন লোক উৎপন্ন হইয়া, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে(যিনি তাহাদিগকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন) অথবা যিনি সূর্য্যাদি তেজস্বরূপ পদার্থের গর্ভ, নাম এবং নিবাসস্থান হয়েন।

উ=বায়ু—চরাচর জগতের ধারণ এবং প্রলয় করেন বলিয়া এবং সমগ্র বলবান্ অপেক্ষা বলিষ্ঠ বলিয়া বায়ুশব্দে শ্রীভগবান্ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

উ=তৈজস—স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ এবং সূর্য্যাদি তেজস্বী লোকের প্রকাশক, এই অর্থে শ্রীভগবানের নাম "তৈজস" হইয়াছে।

ম=ঈশ্বর—যাঁহার সত্য বিচারশীল জ্ঞান আছে এবং যাহার অনন্ত ঐশ্বর্য্য আছে।

ম=আদিত্য—যাঁহার কখন বিনাশ নাই।

ম=প্রাজ্ঞ—যিনি অভ্রান্তজ্ঞান দ্বারা চরাচর জগতের সমস্ত কার্য্য জ্ঞাত আছেন।

এক্ষণে অ, উ এবং ম মিলিত "ওঁ"কারের অর্থ পরিষ্কার ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে,—

১। যিনি বিরাট পুরুষ অর্থাৎ বিবিধ জগতের প্রকাশক; যিনি অগ্নি অর্থাৎ জ্ঞানের স্বরূপ, যাঁহাকে জানিবার, প্রাপ্ত হইবার এবং পূজা করিবার

---

* হিরণ্যগর্ভ শব্দের এই প্রকার অর্থ করাতে যাঁহার সন্দেহ হয়, তিনি যজুর্ব্বেদের এই বচনটী পাঠ করিবেন, যথা—

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥

ইহা যজুর্ব্বেদের মন্ত্র। হে মনুষ্যগণ! যিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে সূর্য্যাদি সমস্ত তেজোবিশিষ্ট লোকের উৎপত্তিস্থান এবং আধার, যিনি যত কিছু পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে এবং হইবে, তৎসমস্তের স্বামী আছেন এবং হইবেন, যিনি পৃথিবী হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত সকলের সৃষ্টি করিয়া ধারণ করিয়া আছেন, উক্ত সুখস্বরূপ পরমাত্মাকে আমি যেরূপ ভক্তি করি, তোমরাও তাদৃশ ভক্তি কর।

যোগ্য, যিনি বিশ্ব অর্থাৎ যাঁহাতে আকাশাদি সমগ্র ভূত প্রবেশ করিয়া থাকে, অথবা যিনি সর্ব্বভূতে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন।

২। যিনি হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ সূর্য্যাদি তেজসম্পন্ন লোক বা ব্রহ্মাণ্ড সকল উৎপন্ন করিয়া তাহাদিগকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। যিনি চরাচর জগতে জীবনরক্ষা ও প্রলয় করেন এবং যিনি সমগ্র বলবান অপেক্ষা বলিষ্ঠ।

৩। যিনি বায়ু অর্থাৎ যিনি স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ এবং সূর্য্যাদি সমস্ত লোকের প্রকাশক, যিনি অনন্ত ঐশ্বর্য্যশালী, যিনি আদিত্য অর্থাৎ যাঁহার কখন বিনাশ হয় নাই; যিনি প্রাজ্ঞ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ, তিনিই "ওঁ"কার * পুরুষ, তিনিই পরমকৃষ্ণ, তিনিই শ্রীভগবান্। এই জন্য মহাপ্রভু তাঁহার শ্রীমুখে বলিয়াছেন যে,—

"ঈশ্বরস্বরূপ প্রণব ("ওঁ") সর্ব্ববিশ্ব ধাম।"

গায়ত্রী মন্ত্র এবং ইহার অর্থ।

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। তৎ সবিতু র্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ যজুঃ। অঃ ৩৬। মঃ ৩॥

ওঁ=ইহাকে প্রণব বলে, ইহার অর্থ উপরোক্ত গায়ত্রী মন্ত্র, তদ্‌যথা—

ভু=যিনি স্বয়ম্ভু এবং চরাচর জগতের প্রাণ।

ভুর্বঃ=যিনি সর্ব্বদুঃখরহিত এবং যাঁহার সঙ্গবশতঃ জীবের সর্ব্বদুঃখ দূরীভূত হয়।

স্বঃ=যিনি নানাবিধ জগতের ব্যাপক হইয়া সমস্ত ধারণ করেন (এই "ভূর্ভুবঃ স্বঃ" ইহার অর্থ তৈত্তিরীয় আরণ্যক হইতে গ্রহণ করা হইল)।

তৎ=সেই পরমাত্মার স্বরূপকে আমরা।

সবিতু=যিনি সমস্ত জগতের উৎপাদক এবং সর্ব্বৈশ্বর্য্যদাতা। তাঁহার

---

* আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে মনে হয় যে, যদি কেহ মহাপ্রভুকে ঐকান্তিক ভক্তিভাবে পূজা করিতে চাহেন, তবে এই "ওঁকার" মন্ত্রই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত, কেননা, মহাপ্রভু তাঁহার নিজ মুখে তাঁহার স্বরূপ ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

বরেণ্যং = অতিশ্রেষ্ঠ।

ভর্গো = শুদ্ধস্বরূপ এবং পবিত্রকারী চৈতন্ত ব্রহ্মস্বরূপ।

দেবস্ত = যিনি সুখদাতা এবং যাঁহাকে সকলে প্রাপ্তির কামনা করে, সেই পরমাত্মার

ধীমহি = ধারণ করি অর্থাৎ আমরা তাঁহাকে স্মরণ, মনন, এবং ধারণা করি (কেননা)

ধিয়ো = বুদ্ধিকে

য়ো = যে জগদীশ্বরের অর্থাৎ সেই সবিতাদের

নঃ = অস্মাকম্ অর্থাৎ আমাদিগের

প্রচোদয়াৎ = প্রেরণা করেন অর্থাৎ অসৎ কর্ম্মের প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া সৎকার্য্য করিতে মনোবৃত্তিকে প্রেরণ করেন।

এই গায়ত্রীর অর্থ অল্প কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, যিনি ভূ অর্থাৎ স্বয়ম্ভু এবং চরাচর জগতের প্রাণ; যিনি ভব অর্থাৎ সর্ব্বদুঃখরহিত এবং যাঁহার সঙ্গগুণে জীবের সর্ব্বদুঃখ দূর হয় এবং যিনি স্বঃ অর্থাৎ যিনি নানাবিধ জগতে ব্যাপ্ত থাকিয়া সকলকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। (তৎ) সেই পরমাত্মার স্বরূপকে অর্থাৎ যিনি (সবিতু) সমস্ত জগতের উৎপাদক ঐশ্বর্য্যদাতা (বরেন্তং) অতি শ্রেষ্ঠ, (ভর্গো) শুদ্ধস্বরূপ, পবিত্রকারী চৈতন্তব্রহ্মস্বরূপ এবং যিনি সুখ-দাতা ও সকলে যাঁহাকে প্রাপ্তির কামনা করে, আমরা (ধীমহী) ধারণা করি অর্থাৎ (তৎ) সেই পরমাত্মার স্বরূপকে আমরা স্মরণ, মনন, ধ্যান এবং ধারণা করি; কেননা, (যো) সেই পরমাত্মার স্বরূপ সবিতাদের (নঃ) আমাদের (ধিয়ো) বুদ্ধিকে (প্রচোদয়াৎ) অসৎ প্রবৃত্তি হইতে সৎ প্রবৃত্তিতে প্রেরণ করেন। গায়ত্রীর এই প্রকার বেদবিহিত অর্থে প্রণবের ওঁকারের অর্থ প্রকাশ করিতেছে। এই জন্যই শ্রীশ্রীমহাপ্রভু জগৎকে বুঝাইয়াছেন—

"প্রণবের যে অর্থ গায়ত্রীতে সেই হয়।
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবরিয়া কয়॥"

ভূঃ, ভুবঃ, এবং স্বঃ, ইহার অর্থ তৈত্তিরীয়োপনিষদে যে প্রকার বর্ণনা আছে, তাহা পণ্ডিতদিগের অবগতির জন্ত নিম্নে লিখিত হইল ঃ—

" ভূর্ভুবঃ সুবরিতি বা এতাস্তিস্রো ব্যাহৃতয়ঃ। তাসামু হ স্মৈতাং চতুর্থীম্। মাহাচমস্যঃ প্রবেদয়তে। মহ ইতি। তদ্ ব্রহ্ম। স আত্মা। অঙ্গান্যন্যা দেবতাঃ। ভূরিতি বা অয়ং লোকঃ। ভুব ইত্যন্তরিক্ষম্। সুব ইত্যসৌ লোকঃ। মহ ইত্যাদিত্যঃ। আদিত্যেন বাব সর্ব্বে লোকা মহীয়ন্তে। ভূরিতি বা অগ্নিঃ। ভুব ইতি বায়ুঃ। সুবরিত্যাদিত্যঃ। মহ ইতি চন্দ্রমাঃ। চন্দ্রমসা বাব সর্ব্বাণি জ্যোতীংষি মহীয়ন্তে। ভূরিতি বা ঋচঃ। ভুব ইতি সামানি। সুবরিতি যজূংষি। মহ ইতি ব্রহ্ম। ব্রহ্মণা বাব সর্ব্বে বেদা মহীয়ন্তে। ভূরিতি বৈ প্রাণঃ। ভুব ইত্যপানঃ সুবরিতি ব্যানঃ। মহ ইত্যন্নম্। অন্নেন্ বাব সর্ব্বে প্রাণা মহীয়ন্তে। তা বা এতাশ্চতস্রশ্চতুর্দ্ধা। চতুস্রশ্চতস্রো ব্যাহৃতয়ঃ। তা যো বেদ। স বেদ ব্রহ্ম। সর্ব্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাবহন্তি ॥

ইহার শঙ্কর ভাষ্য যথা :—

ভূঃ, ভুবঃ, সুবঃ, ইতি বৈ এতাঃ তিস্রঃ ব্যাহৃতয়ঃ সংক্ষিপ্তাঃ মন্ত্রাঃ। তাসাম্ উ হ স্ম পাদপূরণে, মাহাচমস্যঃ মহাচমসস্য অপত্যং পুমান্ মহঃ ইতি এতাং চতুর্থীম্ প্রবেদয়তে শিক্ষয়ামাস, তৎ ব্রহ্ম। সঃ আত্মা। অন্যাঃ দেবতাঃ আত্মন অঙ্গানি। ভূঃ ইতি বা অয়ং লোকঃ। ভুবঃ ইতি অন্তরিক্ষম্। সুবঃ ইতি অসৌ দ্যৌঃ লোকঃ। মহঃ ইতি আদিত্যঃ। আদিত্যেন বাব সর্ব্বে লোকাঃ মহীয়ন্তে বর্দ্ধন্তে। ভূঃ ইতি বা অগ্নিঃ। ভুবঃ ইতি বায়ুঃ। সুবঃ ইতি আদিত্যঃ। মহঃ ইতি চন্দ্রমাঃ। চন্দ্রমসা বাব সর্ব্বাণি জ্যোতীংষি মহীয়ন্তে। ভূঃ ইতি বৈঃ ঋচঃ ঋকৃমন্ত্রাঃ, ভুবঃ ইতি সামানি। সুবঃ যজূংষি। মহঃ ইতি ব্রহ্ম; ব্রহ্মণা ইতি বাব সর্ব্বে বেদাঃ মহীয়ন্তে। ভূঃ ইতি বৈঃ প্রাণঃ। ভুবঃ ইতি অপানঃ। সুবঃ ইতি ব্যানঃ। মহঃ ইতি অন্নম্। অন্নেন বাব সর্ব্বে প্রাণাঃ মহীয়ন্তে তাঃ বা এতাঃ চতুস্রঃ চতুর্দ্ধা, চতস্রঃ চতস্রঃ ব্যাহৃতয়ঃ। তাঃ যঃ বেদ,সঃ ব্রহ্ম বেদ। তস্মৈ এবং বিদুষে দেবাঃ বলিম্ আবহন্তি আনয়ন্তি।

বঙ্গানুবাদ যথা :—

ভূঃ ভুবঃ, সুবঃ এই তিন ব্যাহৃতি অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত মন্ত্র। তন্মধ্যে মহাচমসের পুত্র মাহাচমস্য "মহঃ" এই চতুর্থ ব্যাহৃতি শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাহা ব্রহ্ম;

তিনি আত্মা। অন্য দেবতাগণ তাঁহার অঙ্গ। ভূঃ এই লোক। ভুবঃ অন্তরীক্ষ। সুবঃ ঐ লোক অর্থাৎ দ্যুলোক। মহঃ আদিত্য। আদিত্য দ্বারা সমুদয় লোক বর্দ্ধিত হয়। ভূঃ অগ্নিঃ। ভুবঃ বায়ু। সুবঃ আদিত্য। মহঃ চন্দ্রমা। চন্দ্র দ্বারা সমুদায় জ্যোতিষ্কমণ্ডলী বর্দ্ধিত হয়। ভূঃ ঋক্-মন্ত্র। ভুবঃ সাম। সুবঃ যজুঃ। মহঃ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম দ্বারা সমুদায় বেদ বর্দ্ধিত হয়। ভূঃ প্রাণ। ভুবঃ অপান। সুবঃ ব্যান। মহঃ অন্ন। অন্ন দ্বারা সমুদায় প্রাণ বর্দ্ধিত হয়। এই চারি প্রকার চারিটী ব্যাহৃতি হইল। যিনি এই সমুদায় জানেন, তিনি ব্রহ্মকে জানেন। সমুদায় দেবতারা তাঁহাকে উপহার দেন।

এই উপনিষৎ বচনে,—ভূঃ, ভুবঃ, স্ব, এবং মহঃ এই চারিটী শব্দে চারিটী চারিটী করিয়া অর্থ করিয়াছে, যথা—

ভূঃ=১। এই লোক অর্থাৎ ভূর্লোক। ২। অগ্নি। ৩। ঋক্ মন্ত্র। ৪। প্রাণ।

ভুবঃ=১। অন্তরীক্ষ। ২। বায়ু। ৩। সাম মন্ত্র। ৪। অপান।

সুবঃ, স্বঃ=১। দ্যুলোক। ২। আদিত্য। ৩। যজুঃ মন্ত্র। ৪। ব্যান।

মহঃ=১। আদিত্য। ২। চন্দ্র। ৩। ব্রহ্ম। ৪। অন্ন।

এক্ষণে ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ এই তিনটি শব্দে তৈত্তীরিয় উপনিষদের অর্থানুসারে অধিকারী ভেদে নানা অর্থ করিতে দেখা যায়, তাহার মধ্যে ভূঃ, ভুবঃ এবং স্ব. এই তিনটী প্রকৃতিবাচক শব্দকে যাঁহারা শ্রীভগবানের নাম বলিয়া বুঝেন, তাঁহারা পূর্ব্ববর্ণিত ভাবে গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থ গ্রহণ করিবেন অর্থাৎ "ভূরিতি বৈ প্রাণ" এই প্রাণকে প্রাণবায়ু বলিলে ভগবানের নাম হয় না; সুতরাং যিনি চরাচর জগতের জীবন এবং (জীব যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে, এই অর্থে) সর্ব্বাশ্রয় বা সর্ব্বাধার এবং (তিনি জগতের প্রাণ, তাঁহার প্রাণ নাই, এই অর্থে) স্বয়ম্ভু, এই প্রকার প্রাণবাচক ভূঃ পরমেশ্বরের নাম। "ভুবরিত্যাপানঃ" এই অপানকে "অপান বায়ু" বলিলে ভগবানের নাম হয় না। "যঃ সর্ব্বং দুঃখমপান যতি সোঽপান" যদি সর্ব্বদুঃখ অপনোদন করেন, তাঁহাকে অপান বলে। ইহার ভাবার্থ এই যে, শ্রীভগবান্ নিজে দুঃখরহিত এবং তাঁহার সঙ্গ প্রাপ্ত হইলেই জীবের দুঃখ দূর হয়। এই অর্থে

"অপান"বাচক "ভুবঃ" পরমেশ্বরের নাম "স্বরিতি ব্যান" "যো বিবিধং জগৎ ব্যান:যতি ব্যপ্নোতি স ব্যান" যিনি বিবিধ জগতে ব্যাপক হইয়া, সমস্ত ধারণ করেন। এই প্রকার "ব্যান"বাচক "স্ব" পরমেশ্বরের নাম। স্ব

এক্ষণে ভূঃ, ভুবঃ, স্ব, তিনটী শ্রীভগবানের নাম বলিয়া যাঁহারা ধারণা না করিতে পারেন, তাঁহারা ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ এই তিনটীকে যথাক্রমে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং দ্যুলোক বলিয়া অর্থ করিয়া থাকেন এবং সবিতু শব্দ লইয়া আবার অনেক গোল দেখিতে পাওয়া যায়।

"সবিতা" শ্রীভগবানের একটী নাম যঃ সুনোত্যুৎপাদয়িতু সর্ব্ব জগৎ স সবিতা (তস্য) যিনি সমস্ত জগতের উৎপাদক তাঁহার। এই প্রকার অর্থ পরিত্যাগ করিয়া, সবিতাকে সূর্য্য বলিয়া অর্থ করেন; কিন্তু বৈষ্ণবেরা বেদ-মূলক অর্থ পরিত্যাগ করিবেন না।

কেননা মহাপ্রভূ শ্রীমুখে বলিয়াছেন যে—

"প্রণবের যে অর্থ গায়ত্রীতে সেই হয়।
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবরিয়া কয়॥"

ইহার ভাবার্থ এই যে শ্রীভগবানের মুখ্য নাম "ওঁ"কার, ইঁহার নাম প্রণব। এই প্রণব অর্থাৎ "ওঁ"কারের অর্থ গায়ত্রীমন্ত্রে অনেকটা প্রকাশ হইয়াছে, কিন্তু এই প্রণবের অর্থ চতুঃশ্লোকীতে অর্থাৎ সমগ্র বেদে বিস্তার করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বৈষ্ণবদিগের পক্ষে "উপনিষদ্ শাস্ত্র" প্রধান অবলম্বন; এজন্য নিম্নে উপনিষদ্ হইতে কয়েকটী বচন উদ্ধৃত করা হইল, যথা,—

সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি
তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥ ১৫॥
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদেবাক্ষরম্পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥ ১৬॥

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনম্পরম্ ।

এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১৭ ॥

কঠোপনিষৎ, দ্বিতীয়া বল্লী ।

ইহার ভাবার্থ এই যে, "যম বলিলেন, সমুদায় বেদ যে পদকে মনন করে, সমুদায় তপস্যা যাঁহাকে ব্যক্ত করে অর্থাৎ যাঁহার প্রাপ্ত্যর্থে অনুষ্ঠিত, যাঁহাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তাঁহাকে আমি সংক্ষেপে কহিতেছি—তিনি এই ওঁ । ১৫ ।

এই অক্ষরই ব্রহ্ম, এই অক্ষরই পর অর্থাৎ এই অক্ষরই অপরা ও পরাব্রহ্ম, এই অক্ষরকে জ্ঞাত হইয়া যে যাহা ইচ্ছা করে, তাহার তাহা হয় । ১৬ ।

এই ওঁকার অবলম্বন শ্রেষ্ঠ, এই অবলম্বন পর অর্থাৎ ইহা ব্যতীত অন্য কোন শ্রেষ্ঠ অবলম্বন নাই,এই অবলম্বনকে জানিয়া সাধক ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্ হন ।১৭।

"তস্মৈ স হোবাচ । এতদ বৈ সত্যকাম্ পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ । তস্মাদ্ বিদ্বানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমন্বেতি ॥ ২ ॥

প্রশ্নোপনিষৎ, ৫ম প্রশ্ন ।

ইহার ভাবার্থ এই যে, তাঁহাকে তিনি বলিলেন, "হে সত্যকাম, এই যে ওঁকার, ইহাই পরা ও অপরা ব্রহ্ম, সুতরাং এই ওঁকারকে আয়ত্ত করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি এই দু'য়ের একেকে প্রাপ্ত হয়েন ; অর্থাৎ এই ওঁকার আশ্রয় করিয়া সকাম ও নিষ্কাম এই প্রকার পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় । ২ ।

"স যদ্যেকমাত্রমভিধ্যায়ীত স তেনৈব সংবেদিতস্তূর্ণমেব জগত্যামভিসম্পদ্যতে । তমৃচো মনুষ্যলোকমুপনয়ন্তে স তত্র তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া সম্পন্নো মহিমানমনুভবতি । ৩ ।

অথ যদি দ্বিমাত্রেণ মনসি সম্পদ্যতে সোঽন্তরিক্ষং যজুর্ভিরুন্নীয়তে স সোমলোকম্ । স সোমলোকে বিভূতিমনুভূয় পুনরাবর্ত্ততে । ৪ ।

যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণৈবোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নঃ। যথা পাদোদরস্ত্বচা বিনির্ম্মুচ্যত এবং হ বৈ স পাপ্মনা বিনির্ম্মুক্তঃ স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকং স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে তদেতৌ শ্লোকৌ ভবতঃ ।৫।

তিস্রো মাত্রা মৃত্যুমত্যঃ প্রযুক্তা।
অন্যোন্যসক্তা অনবিপ্রযুক্তাঃ।
ক্রিয়াসু বাহ্যাভ্যন্তরমধ্যমাসু
সম্যক্ প্রযুক্তাসু ন কম্পতে জ্ঞঃ। ৬।
ঋগ্‌ভিরেতং যজুর্ভিরন্তরিক্ষং
সামভির্যত্তৎ কবয়ো বেদয়ন্তে।
তমোঙ্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্
যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরঞ্চেতি ।৭।

প্রশ্নোপনিষৎ, ৫ম প্রশ্ন।

উপরোক্ত পাঁচটি বচনের ভাবার্থ এই যে, যদি তিনি কেবল এক মাত্রা অর্থাৎ অকার মাত্র ধ্যান করেন, তবে তিনি তদ্দ্বারাই সংবেদিত হইয়া শীঘ্রই পৃথিবীতে আনীত হন। ঋঙ্মন্ত্র সমূহ তাঁহাকে মনুষ্যলোকে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করায়, তিনি সেখানে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধা-সম্পন্ন হইয়া মহিমা অনুভব করেন।৩।

যদি তিনি দ্বিতীয় মাত্রা অর্থাৎ উকার মনে অভিধ্যান করেন, তবে তিনি অন্তরীক্ষে গমন করেন। তিনি যজুর্মন্ত্রসমূহ দ্বারা সোমলোকে উন্নীত হয়েন। সোমলোকে মহিমা অনুভব করিয়া তিনি মনুষ্যলোকে ফিরিয়া আসেন।৪।

পুনশ্চ, যিনি ওঁ এই ত্রিমাত্রাযুক্ত অক্ষর দ্বারা এই পরম পুরুষের ধ্যান করেন, তিনি তেজোময় সূর্য্যে অর্থাৎ সূর্য্যলোকে উপনীত হন। যেমন সর্প ত্বক্ হইতে মুক্ত হয়, তেমনি তিনি পাপ হইতে মুক্ত হন। তিনি সামমন্ত্র দ্বারা

ব্রহ্মলোকে (বৈষ্ণবেরা এই লোককে গোলোক আখ্যা দিয়া থাকেন) উন্নীত হন। সেই জীবঘন অবস্থা হইতে তিনি পরাৎপর পুরিশয় অর্থাৎ সর্ব্বশরীরানুপ্রবিষ্ট পুরুষকে দর্শন করেন; সেই বিষয়ে এই শ্লোকদ্বয়ে উক্ত হইতেছে। ৫।

তিন মাত্রা অর্থাৎ ওঁকারের অকার, উকার, মকার এই মাত্রাত্রয় স্বতন্ত্র-রূপে এবং ব্রহ্মদৃষ্টি ব্যতীত কেহ মৃত্যুগোচর অর্থাৎ মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারেন না। কিন্তু এই মাত্রাত্রয় সম্যক্‌রূপে সম্পাদিত বাহ্য, অভ্যন্তর ও মধ্য অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা পুরুষের অভিধ্যানরূপ ক্রিয়াসমূহে পরস্পর সম্বন্ধ ও সংশ্লিষ্ট হইয়া, প্রযুক্ত হইলে জ্ঞানী ব্যক্তি বিচলিত হয়েন না, উৎক্রান্ত এবং অবঃক্রান্ত হন না। ৬।

তিনি ঋঙ্‌মন্ত্রদ্বারা ভূলোক প্রাপ্ত হন, যজুর্ম্মন্ত্র দ্বারা অন্তরিক্ষ প্রাপ্ত হন, এবং সামমন্ত্র দ্বারা দ্যুলোক প্রাপ্ত হন, যাহা জ্ঞানিগণ জানেন। জ্ঞানী ব্যক্তি ওঁকারযুক্ত সাধন দ্বারাই সেই ব্রহ্মলোক লাভ করেন। যিনি শান্ত, অজর, অমর ও অভয়, তাঁহাকেও জ্ঞানী ব্যক্তি সেই সাধন দ্বারাই লাভ করেন। ৭।

"প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥৪॥

২য় মুণ্ডকে ২য়ঃ খণ্ডঃ।

ইহা মুণ্ডকোপনিষদের বচন, ইহার ভাবার্থ এই যে, প্রণব অর্থাৎ ওঁকার ধনু স্বরূপ, শর আত্মাস্বরূপ, ব্রহ্মকে লক্ষ্য বলা যায়। একাগ্রচিত্ত হইয়া সেই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে হইবে, এবং শরের ন্যায় তন্ময় হইবে, অর্থাৎ শর যেমন লক্ষ্যের দিকে তন্ময় হয়, সাধক তেমনি ব্রহ্মে তন্ময় হইবেন। ৪।

ওমিত্যেদক্ষরমিদং সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানম্-
ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব।
যচ্চান্যত্ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব ॥১॥
সর্ব্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ ॥২॥

জাগরিতস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ স্থূলভুগ্ বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ ॥৩॥

স্বপ্নস্থানোঽন্তঃ প্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥৪॥

যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎ সুষুপ্তম্। সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥৫॥

এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্ ॥৬॥

নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্। অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ ॥৭॥

সোঽয়মাত্মাঽধ্যক্ষরমোঙ্কারোঽধিমাত্রং পাদা মাত্রা মাত্রাশ্চ পাদা অকার উকারো মকার ইতি ॥৮॥

জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরোঽকারঃ প্রথমা মাত্রাপ্তেরাদিমত্ত্বাদ্ ব্যাপ্নোতি হ বৈ সর্ব্বান্ কামানাদিশ্চ ভবতি য এবং বেদ ॥৯॥

স্বপ্নস্থানস্তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রোৎকর্ষাদুভয়ত্বাদ্বোৎকর্ষতি হ বৈ জ্ঞানসন্ততিঃ সমানশ্চ ভবতি নাস্যাব্রহ্মবিৎকুলে ভবতি য এবং বেদ ॥১০॥

সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারস্তৃতীয়া মাত্রা মিতেরপীতের্বা মিনোতি হ বা ইদং সর্ব্বমপীতিশ্চ ভবতি য এবং বেদ ॥১১॥

অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত এব-মোঙ্কার আত্মৈব সংবিশত্যাত্মনাত্মানং য এবং বেদ য এবং বেদ ॥১২॥

মাঃ উপনিষৎ।

এগুলি সমস্তই মাণ্ডুক্যোপনিষদের বচন; ইহাদের ভাবার্থ যথাঃ—

ওঁ এই অক্ষরই এই সমুদয়। ইহার অর্থাৎ ওঁকারের স্পষ্ট ব্যাখ্যা এই যে, ভূত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ এই সমুদয়ই ওঁকার এবং যাহা এই ত্রিকালের অতীত, তাহাও ওঁকার। ১।

এই সমুদয়ই ব্রহ্ম। এই আত্মা ব্রহ্ম। সেই এই আত্মা চতুষ্পাৎ অর্থাৎ পশ্চাৎ বর্ণনীয় চারি অবস্থাবিশিষ্ট। ২।

জাগ্রদবস্থার অধিষ্ঠাতা, বহিঃপ্রজ্ঞ অর্থাৎ বহির্বিষয়ের জ্ঞাতা, বহির্বিষয় অবভাসক, সপ্তাঙ্গবিশিষ্ট অর্থাৎ স্বর্গ মস্তক, সূর্য্য চক্ষু, বায়ু প্রাণ, অন্ন ও জল উদর, আকাশ মধ্যদেশ, পৃথিবী পা, এই সপ্তাঙ্গ যাঁহার, একোনবিংশতি মুখ অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, প্রাণ-অপানাদি পঞ্চ বায়ু, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত, এই উনবিংশতি উপলব্ধিদ্বার যাঁহার, স্থূলভুক্ অর্থাৎ শব্দাদি স্থূলবিষয়ভোগী বৈশ্বানর অর্থাৎ বিশ্বরূপ পুরুষ, প্রথম পাদ। ৩।

স্বপ্নাবস্থার অধিষ্ঠাতা অন্তঃপ্রজ্ঞ অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ মনোমাত্র-গ্রাহ্য বিষয়ের জ্ঞাতা, সপ্তাঙ্গ অর্থাৎ মনে বিলীনাবস্থায় বর্ত্তমান উনবিংশতি মুখযুক্ত, সূক্ষ্ম বিষয়ের ভোক্তা, তৈজস অর্থাৎ তেজ নামক বিষয়শূন্যা বাসনাময়ী প্রজ্ঞাতে যিনি বিষয়ীরূপে বর্ত্তমান থাকেন, তিনি দ্বিতীয় পাদ। ৪।

যে অবস্থায় সুপ্ত হইয়া লোকে কোন কাম্য বস্তু কামনা করে না, কোন স্বপ্ন দেখে না, তাহা সুষুপ্তি। সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা, একীভূত অর্থাৎ জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় পৃথক্ পৃথক্ রূপে অনুভূত প্রপঞ্চ বিশ্ব যাঁহাতে একীভূত হয়, প্রজ্ঞানঘন অর্থাৎ বিবিধ বস্তুর বিবিধ জ্ঞান-ঘনীভূতের ন্যায় হইয়া যাঁহাতে বর্ত্তমান থাকে, আনন্দময়, আনন্দভুক্ এবং চেতোমুখ অর্থাৎ জ্ঞানই যাঁহার মুখ বা অনুভবদ্বার, সেই প্রাজ্ঞ অর্থাৎ বিশিষ্ট প্রজ্ঞাযুক্ত যিনি, তিনি তৃতীয় পাদ। ৫।

ইনি সর্ব্বেশ্বর, ইনি সর্ব্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্যামী, ইনি সমুদয়ের উৎপত্তি স্থান, এবং ভূতসমূহের উদ্ভব ও প্রলয়ের কারণ। ৬।

যিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ নহেন, বহিঃপ্রজ্ঞ নহেন, উভয়প্রজ্ঞ অর্থাৎ জাগ্রত ও স্বপ্নের অন্তরালাবস্থাযুক্ত নহেন, প্রজ্ঞানঘন নহেন, প্রজ্ঞ অর্থাৎ দ্বৈতভাবাত্মক জ্ঞানযুক্ত নহেন, অপ্রজ্ঞ অর্থাৎ অচেতন নহেন, যিনি অদৃষ্ট. অব্যবহার্য্য অর্থাৎ অবিষয়ত্ব-নিবন্ধন ব্যবহারাতীত, অগ্রাহ্য অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অবিষয়, অলক্ষণ অর্থাৎ দ্বৈত সম্বন্ধ না থাকা হেতুক বর্ণনাতীত, অচিন্ত্য, অনির্ব্বচনীয়, যিনি প্রত্যয়ের বিষয়, অর্থাৎ জাগ্রদাদি অবস্থায় এই এক আত্মাই আছেন, এই প্রত্যয়-গম্য, রূপ রসাদি পঞ্চ বিষয়ের অতীত, শান্ত অর্থাৎ রাগ দ্বেষাদিরহিত, মঙ্গল-স্বরূপ, এবং অদ্বৈত, তাঁহাকে জ্ঞানিগণ চতুর্থ অর্থাৎ তুরীয় বলিয়া জানেন। তিনি আত্মা, তিনি বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য। ৭।

এই আত্মা ওঁ এই অক্ষর অধিকার করিয়া আছেন অর্থাৎ এই অক্ষররূপে বর্ণ্যমান, তিনি ওঁকার, তিনি পশ্চাৎ কথিতব্য মাত্রাত্রয় অধিকার করিয়া আছেন। আত্মার যে সমস্ত পাদ, তাহাই ওঁকারের মাত্রা ; এবং ওঁকারের অকার, উকার, মকার এই মাত্রা সমূহই আত্মার পাদ। ৮।

জাগ্রদবস্থার অধিষ্ঠাতা বৈশ্বানর প্রথম মাত্রা অকার ; তাহার কারণ ব্যাপ্তি ও আদিমত্ব অর্থাৎ যেমন অকার দ্বারা সমুদয় বাক্য ব্যাপ্ত আছে, তেমনি বৈশ্বানর-কর্ত্তৃক সমুদয় জগৎব্যাপ্ত আছে, আর যেমন অকার সমুদয় বর্ণের আদি, তেমনি বৈশ্বানর পাদসমূহের আদি, এই সাধারণত্ব হেতুতেই অকার ও বৈশ্বানরের একত্ব। যিনি এরূপ জানেন, তিনি সমুদয় কাম্যবস্তু লাভ করেন এবং মহৎদিগের মধ্যে প্রথম হন। ৯।

স্বপ্নের অধিষ্ঠাতা তৈজস দ্বিতীয় মাত্রা উকার ; তাহার কারণ উৎকর্ষ বা মধ্যবর্ত্তিত্ব, অর্থাৎ যেমন অকার হইতে উকার উৎকৃষ্ট, এবং যেমন উকার, অকার ও মকারের মধ্যস্থ, তেমনি তৈজস, বৈশ্বানর ও প্রাজ্ঞের মধ্যস্থ ; এই সাধারণত্ব হেতুতে তৈজস ও উকারের একত্ব। যিনি এরূপ জানেন, তিনি স্বকীয় জ্ঞানসমূহ বৃদ্ধি করেন, শত্রুমিত্রের সম্বন্ধে সমান হন এবং তাঁহার কুলে অব্রহ্মবিৎ জন্মে না। ১০।

সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা প্রাজ্ঞ তৃতীয় মাত্রা মকার, তাহার কারণ পরিমাণ বা

একীভাব অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে বৈশ্বানর ও তৈজস, প্রাজ্ঞে প্রবেশ করেন এবং জাগ্রদবস্থায় তাহা হইতে বহির্গত হন, এই প্রবেশ নির্গমের দ্বারা প্রাজ্ঞ যেন বৈশ্বানর ও তৈজসকে পরিমাণ করেন; তেমনি, ওঁকারের উচ্চারণান্তে অকার ও উকার, মকারে প্রবেশ করে এবং উচ্চারণান্তে পুনরায় বহির্গত হয়, এস্থলেও পরিমাণ ক্রিয়ার সাদৃশ্য আছে; আর যেমন সুষুপ্তিতে বৈশ্বানর ও তৈজস প্রাজ্ঞে একীভূত হন, তেমনি ওঁকারোচ্চারণান্তে অকার ও উকার যেন মকারে একীভূত হয়,—এই সাধারণত্ব বশতঃ প্রাজ্ঞ ও মকারের একত্ব; যিনি এরূপ জানেন, তিনি নিশ্চয়ই এই সমুদয় জগৎ যথার্থরূপে জানেন এবং জগৎকারণাত্মার স্বরূপ হন। ১১।

মাত্রাশূন্য, চতুর্থ, অব্যবহার্য্য, পঞ্চবিষয়াতীত, মঙ্গল-স্বরূপ ও অদ্বৈত, এরূপ ওঁকারই আত্মা। যিনি এরূপ জানেন, তিনি আত্মাতে অর্থাৎ পরমাত্মাতে প্রবেশ করেন। ১২।

বহ্নের্যথা যোনিগতস্য মূর্ত্তির্ন দৃশ্যতে নৈব চ লিঙ্গনাশঃ।
স ভূয় এবেন্ধনযোনিগৃহ্যস্তদ্বোভয়ং বৈ প্রণবেন দেহে ॥১৩॥
স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।
ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাদ্ দেবং পশ্যান্নিগূঢ়বৎ ॥১৪॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। ১ম অঃ।

ইহার ভাবার্থ এই যে,—যেমন কারণস্থিত অর্থাৎ জ্বালনী কাষ্ঠে স্থিত অগ্নির রূপ দেখা যায় না অথচ ইহার সূক্ষ্মদেহের নাশ হয় না, ইন্ধনরূপ কারণ দ্বারা ঘর্ষণ যোগেই ইহাকে পুনঃ পুনঃ দর্শন করিতে হয়, উভয়ই সেরূপ, (অর্থাৎ অগ্নি ও আত্মা উভয়ই কেবল মন্থনগ্রাহ্য); প্রণব অর্থাৎ ওঁকারোচ্চারণ দ্বারাই দেহে আত্মা উপলব্ধ হয়েন। ১৩।

নিজ দেহকে অরণি অর্থাৎ ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি জ্বালনার্থ যে কাষ্ঠ, সেইরূপ করিয়া, এবং প্রণব অর্থাৎ ওঁকারকে উত্তরারণি অর্থাৎ উর্দ্ধারণি করিয়া ধ্যান-রূপ ঘর্ষণ অভ্যাস দ্বারা সাধক ঈশ্বরকে নিগূঢ় অগ্নিবৎ দর্শন করিবেন। ১৪।

তাই মহাপ্রভু জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন যে—

"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম কভু সাধ্য নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয় উদয়॥"

ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদং সর্ব্বম্। ওমিত্যেতদনুকৃতি হ স্ম বা অপ্যোংশ্রাবয়েত্যাশ্রাবয়ন্তি। ওমিতি সামানি গায়ন্তি। ওঁ শোমিতি শস্ত্রাণি শংসন্তি। ওমিত্যধ্বর্য্যুঃ প্রতিগরং প্রতিগৃণাতি। ওমিতিব্রহ্মা প্রসৌতি। ওমিত্যাগ্নিহোত্র-মনুজানাতি। ওমিতি ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্নাহ ব্রহ্মোপাপ্নবানীতি। ব্রহ্মৈবোপাপ্নোতি ॥৮॥

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ। প্রথমাবল্লী।

ওঁ ইহা ব্রহ্ম। ওঁ ইহা এই সমুদয়, অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ। ওঁ ইহা অনুকরণ অর্থাৎ 'এই কার্য্য কর' অন্য ব্যক্তিকে এই কথা বলিলে সে ওঁ বলিয়া আদেশের অনুশরণ করে। আরও 'ওঁ বল', এই কথা বলিলে অন্যেরা বলেন। ওঁ ইহা উচ্চারণ করিয়া সামবেদের গায়কগণ সামগান করেন। 'ওঁ শোং' এইরূপে শস্ত্র উচ্চারণকারিগণ শস্ত্র অর্থাৎ গীতরহিত ঋক্ উচ্চারণ করেন। ওঁ ইহা উচ্চারণ করিয়া অধ্বর্য্যু অর্থাৎ যজুর্ব্বেদজ্ঞ ঋত্বিক্ 'ও শোং সামো দৈব' ইত্যাদি বাক্য হোতার উচ্চারণের পর প্রত্যুচ্চারণ করেন, ওঁ ইহা উচ্চারণ করিয়া ঋত্বিক্ অনুজ্ঞা প্রদান করেন। ওঁ ইহা উচ্চারণ করিয়া যজমান অগ্নিহোত্র সম্পাদনের আদেশ দেন। ব্রাহ্মণ বেদাধ্যাপনে প্রবৃত্ত হইয়া বলেন,— ওঁ আমি যেন ব্রহ্মকে অর্থাৎ বেদ বা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হই এই বলিয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। ৮।

এই প্রসঙ্গে ওঁকার অর্থাৎ শ্রীভগবানের শ্রীনামের পূজা বা উপাসনার বৈদিক বিধি প্রদর্শন করান যাইতেছে।

সর্ব্ববেদের সার সামবেদ, এই সাম বেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষদের প্রথমেই ওঁকার নামক শ্রীভগবানের নামের উপাসনা করিবার বিধান দেখা যায়:—

ওমিত্যেদক্ষরমুদ্গীথমুপাসিত ওমিতি
হ্যুদ্গায়তি তস্যোপব্যাখানম্ ॥ ১ ॥

ছাঃ ১মঃ অঃ ॥

ইহার অর্থ এই যে (শ্রীভগবানের নাম) ওঁকার এই অক্ষরটীকে উদ্গীথ স্থানীয় করিয়া ইহার উপাসনা করিবে, এবং এই উপাসনার প্রকরণ নিম্নে বলা যাইতেছে যথা :—

এষাং ভূতানাং পৃথিবী রসঃ পৃথিব্যা আপো রসোঽপামোষধয়ো রস ওষধীনাং পুরুষো রসঃ পুরুষস্য বাগ্রসো বাচো ঋগ্রস ঋচঃ সাম রসঃ সাম্ন উদ্গীথো রসঃ ॥ ২ ॥

"স এষ রসানাম রসতমঃ পরমঃ পরার্দ্ধ্যোঽষ্টমো যদুদ্গীথঃ ॥ ৩ ॥

ছাঃ ১মঃ অঃ ॥

অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান ভৌতিক জগতের সার পৃথিবী, পৃথিবীর সার জল, জলের সার ওষধি, ওষধির সার পুরুষ, পুরুষের সার বাক্, বাকের সার ঋক্, ঋকের সার সাম, সামের সার উদ্গীথ—ওঁকার, অতএব উদ্গীথাখ্য ওঁকার রসতম বা সারের সার, এবং পরম, অর্থাৎ ওঁকারের উপর অন্য কোন উৎকৃষ্ট রস বা সার আর নাই। এক্ষণে উপরোক্ত বেদ বচনের প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিতে গেলে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শরণাপন্ন হইতে হয়, তিনি উপাসনা-তত্ত্ব জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীল রামানন্দ রায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"উপাস্তের মধ্যে কোন উপাস্য প্রধান ? তাহার প্রত্যুত্তরে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু তাঁহার মুখ দিয়া বেদের অভিপ্রায় প্রকাশ করাইয়া বলাইলেন যে :—

"শ্রেষ্ঠ উপাস্য যুগল রাধাকৃষ্ণ নাম" (কিন্তু রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহের উপাসনা করিতে বলাইলেন না)।

ইহার অভিপ্রায় এই যে, ভক্তগণ শ্রীভগবানের উদ্দেশ প্রাপ্ত হইবার জন্য কেহ শালগ্রাম শিলা, কেহ পট, কেহ ঘট, কেহ বিগ্রহ, কেহ গির্জাঘর, কেহ মসজিদ, কেহ উপাসনা-মন্দির ইত্যাদি আপন আপন ভাব

অনুসারে অনেক প্রকার প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাই মহাপ্রভু অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্যক্তিদিগকে বুঝাইতেছেন যে, রাধাকৃষ্ণ অর্থাৎ শ্রীভগবানের নামের প্রতীক (ওঁকার) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাস্য। রাধা-কৃষ্ণাখ্য শ্রীভগবানের প্রতীক কি, তাহা তিনি প্রকাশানন্দকে কৃপা করিবার ছলে জগৎকে এই ভাবে বুঝাইয়াছেন, যথা—

"প্রণব যে মহাবাক্য বেদের নিদান।
ঈশ্বর স্বরূপ প্রণব সর্ব্ব বিশ্বধাম॥
সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের প্রণব উদ্দেশ।
তত্ত্বমসি বাক্য হয় বেদের একদেশ॥"

ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, প্রণব অর্থাৎ ওঁকারই ঈশ্বরের স্বরূপ বা প্রতীক এবং তাঁহার উদ্দেশ অর্থাৎ তাঁহাকে প্রাপ্তির উপায় এই প্রণব বা ওঁকার নামক এই অক্ষরের উপাসনা। এক্ষণে প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, কোন নিম্ন বা উচ্চ জীব অথবা কোন দেবতাদির উপাসনা হইতে পারে, কিন্তু পদার্থের "নামের" উপাসনা কি প্রকারে হইবে? এই গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা বেদ-প্রকাশক ঋষিগণ অনেক প্রকারে করিয়া গিয়াছেন। ছান্দোগ্যোপনিষদের উপরোক্ত প্রথম তিনটী বচন পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, উদ্গীথ অর্থাৎ সাম স্বরসংযুক্ত নামের এবং নামের বিভূতির উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করাই নামের উপাসনা; উদারা, মুদারা, তারা, কড়ি ও কোমল, আধুনিক গানের এই পাঁচটি অঙ্গ বা স্বর; ইহার মধ্যে উদারাকে পঞ্চম স্বর বলে, এই প্রকার সামবেদের সামগানের পাঁচটি অঙ্গ বা স্বর আছে, যথা—প্রস্তাব, প্রতিহার, উদ্গীথ, উপদ্রব ও নিধন। ইহার মধ্যে উদ্গীথ, আধুনিক উদারাখ্য পঞ্চম স্বর। তাই মনে হয়, সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষৎও উদ্গীথ করিতে অর্থাৎ পঞ্চম স্বরে উচ্চ কীর্ত্তন করিয়া "নামের" উপাসনা করিতে বিধি দিয়াছেন, এবং নামের উপাসনা বা নামের মহিমা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্লোকে এইপ্রকার বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—এষাং ভূতানাং অর্থাৎ পৃথিবীর ভূতসকলের উৎপত্তির উপাদান-কারণ কি, বেদ তাহার উত্তর দিতেছেন, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং জলই পৃথিবীর প্রধান রস, কেন না, পৃথিবী হইতে জলরূপ রস, বৃক্ষ, লতা, তৃণ, ওষধি প্রভৃতি উদ্ভিদসকলে আকর্ষণ

করিয়া জীবিত থাকে,আর এই উদ্ভিদ আহার করিয়া জীব,জন্তু,মনুষ্যাদি জীবিত থাকে, এজন্য জলের এক নাম 'জীবন'হইয়াছে; আর ভগবন্মুখী হওয়াই জীবের পরম-পুরুষার্থ ; এই পুরুষার্থ সিদ্ধির এক প্রকার উপায় শ্রীভগবানের নাম পঞ্চম বা উচ্চৈঃস্বরে উদ্‌গান করা। ছান্দোগ্যোপনিষৎ'নামের' মহিমা প্রকাশ করিবার জন্য বলিতেছেন—জলের সার ওষধি অর্থাৎ অন্ন, এবং এই ওষধির সার পুরুষ; আবার এই পুরুষের সার বাক্ অর্থাৎ কথা। যত প্রকার কথা আছে, তাহার মধ্যে পুরুষার্থ সিদ্ধি আশ্রয় স্বরূপ কথা "ঋক্ মন্ত্র" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; কেননা, উদ্‌গাতা অর্থাৎ 'সামবেদীয় গায়কগণ' এই ঋক্ মন্ত্রসকল যথারীতি উদ্‌গান করিতে পারিলে মন্ত্রসকল দেবতারূপে পরিণত হইয়া যজ্ঞফল প্রদান করিতে পারেন। তাই বেদ বলিতেছেন, বাকের সার "ঋক্" এবং ঋকের সার 'সাম', সামের সার উদ্‌গীথ অর্থাৎ সামবেদের মন্ত্রসকল যথেচ্ছা ভাবে পাঠ করিলে কোন কার্য্য হয় না, পরন্তু যথাস্বরে উদ্‌গান করিতে পারিলে কার্য্যসিদ্ধি হয়, তাই বেদ বলিতেছেন যে, সামের সার উদ্গীথ, আর এই উদ্গীথের সার ওঁকার, কেননা, যাঁহারা সামবেদ উদ্গান করিতে অভ্যাস করিবেন, তাঁহাদের ওঁকারকে উদ্গীথ করিয়া ইহার সাধনা করিতে হয়,যেহেতু ওঁকারকে উদ্‌গীথ করিয়া তাহার স্বর ঠিক করিয়া সাধনা করিতে না পারিলে, বৈদিক কোন কার্য্যের আরম্ভ করা যায় না। ইহার বিস্তৃত বিধি ছান্দোগ্যোপনিষদে পরিষ্কার করিয়া লিখিত আছে, যথা—

"তেনেয়ং ত্রয়ী বিদ্যা বর্ত্ততে ওমিত্যাশ্রাবয়ত্যোমিতি শংসত্যোমিতুদ্‌গায়ত্যেতস্যৈবাক্ষরস্যাপচিত্যৈ মহিম্না রসেন ॥৯॥

ছাঃ ১মঃ অঃ ॥

উক্ত "ওঁ"কার অক্ষর দ্বারা এই ত্রয়ীবিদ্যা বা ত্রিবেদের অর্থাৎ যজু, ঋক্ এবং সামবেদের সমস্ত কার্য্য এই ওঁকার অক্ষর উচ্চারণ করিয়া আরম্ভ করিতে হয়, কেবল তাহা নহে,আশ্রাবণ, শংসন ও উদ্গান ইত্যাদি, যজ্ঞের সমস্ত কার্য্যের দ্বারাই এই ওঁকার অক্ষরের পূজা করা হয়। এই বেদবাক্যের দ্বারা বুঝিতে হইবে, ওঁকার অক্ষর শ্রীভগবানের প্রতীক বা প্রতিমা; আবার বেদ

বুঝাইতেছেন, যজ্ঞ সকল 'মহিমা রসেন' অর্থাৎ ওঁকারের মহিমা এবং ওঁকারের রস দ্বারা সম্পন্ন হয়, ইহার অভিপ্রায় এই যে, ওঁকারের মহিমা অর্থে ওঁকারের বিভূতি-বর্ণন বুঝিতে হইবে. আর উপরোক্ত দ্বিতীয় শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে বুঝিতে হইবে যে, ওঁকার যখন চরাচর জগতের সারের সার, তখন যজ্ঞের পরিচালক ঋত্বিক্‌দিগের প্রাণ এবং ব্রীহি, যব, তণ্ডুলাদি যজ্ঞকার্য্যের সমস্ত উপচার ওঁকার এই অক্ষরের রস।

এই ওঁকারাখ্য শ্রীভগবানের নামের মহিমা আর একটু বিশদরূপে জগৎকে বুঝাইবার জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী চতুর্থ ও পঞ্চম বচনে একটী প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া ওঁকারের বিলাস-মাহাত্ম্য এই প্রকারে প্রকাশ হইয়াছে, যথা,—

"কতমা কতমর্ক্ কতমৎ কতমৎ সাম কতমঃ কতম উদ্‌গীথ ইতি বিমৃষ্টং ভবতি ॥ ৪ ॥

ছাঃ ১মঃ অঃ ॥

ঋক্ কি ? সাম কি ? এবং উদ্‌গীথই বা কি ?

এই তিনটী প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া পর বচনে তাহার মীমাংসা হইতেছে যথা,—

"বাগেবর্ক্ প্রাণঃ সামোমিত্যেতদক্ষরমুদ্‌গীথস্তদ্ বা এতন্মিথুনং যদ্ বাক্ চ প্রাণশ্চর্ক্ চ সাম চ ॥ ৫ ॥

ছাঃ ১মঃ অঃ ॥

ইহার অর্থ এই যে, বাকই "ঋক্", প্রাণই "সাম" এবং ওঁকার অক্ষরই উদ্‌গীথ। ইহাদের মধ্যে ঋক্ এবং সামের সঙ্গে, মিথুন সম্বন্ধ অর্থাৎ কান্তা-কান্তভাব, অন্য কথায় ঋক্ ও বাক্ যখন একই বস্তু অথবা সাম ও প্রাণ এক বস্তু, বাকের সহিত প্রাণের মিথুন সম্বন্ধ অর্থাৎ কান্তাকান্তভাব। এ বিষয়টী আর একটু বিশদভাবে পর বচনে বুঝান হইয়াছে, যথা,—

"তদেতন্মিথুনমোমিত্যেতস্মিন্নক্ষরে সংসৃজ্যতে যদা বৈ মিথুনৌ সমাগচ্ছত আপয়তো বৈ তাবন্যোন্যস্য কামম্ ॥ ৬ ॥

ছাঃ ১মঃ অঃ ॥

ইহার ভাবার্থ এই যে, এই মিথুনীভূত অর্থাৎ কান্তাকান্ত ভাবযুক্ত বাক্ ও প্রাণ, অন্য কথায় ঋক্ ও সাম, ভগবন্নামে অর্থাৎ ওঁকারে সংসৃষ্ট আছে, কেননা উপরোক্ত দ্বিতীয় বচনে পরীক্ষায় বুঝান হইয়াছে যে, বাক্ ও প্রাণের অথবা ঋক্ ও সামের সার উদ্‌গীথাখ্য ওঁকার, আবার এই ভগবৎ-নামে স্থিত মিথুন, এক অপর হইতে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান না করিয়া যখন "সমাগচ্ছত" "মিথুন অর্থাৎ যুগলে অবস্থিত হন, তখন এক অপরের কামনা বা বাসনা পূর্ণ করেন।

ইহার পরের বচন যথা,

"আপয়িতা হ বৈ কামানাং ভবতি য এতদেবং বিদ্বানক্ষরমুদ্‌গীথমুপাস্তে ॥ ৭ ॥

ছাঃ ১মঃ অঃ ॥

যিনি উদ্গীথরূপ ওঁকার অক্ষরের এই প্রকার মিথুনের যুগলমিলন ভাব জানিয়া ইহার উপাসনা করেন, তিনি যজমানের অভিলাষ পূর্ণ করেন। আর ওঁকারাখ্য ভগবৎ নামে সংসৃষ্ট মিথুনের কোন্‌টি কান্তা কোন্‌টি পতি, তাহাতে নির্দ্দিষ্ট আছে, যথা—

তং হাঙ্গিরা উদ্‌গীথমুপাসাঞ্চক্র এতমু এবাঙ্গিরসম্ মন্যন্তেঽঙ্গানাং যদ্রসঃ ॥ ১০ ॥

তেন তং হ বৃহস্পতিরুদ্‌গীথমুপাসাঞ্চক্র এতমু এব বৃহস্পতিং মন্যন্তে বাগ্‌ঘি বৃহতী তস্যা এষ পতিঃ ॥ ১১ ॥

তেন তং হ বকো দাল্‌ভ্যো বিদাঞ্চকার স হ নৈমিশীয়ানামুদ্‌গাতা বভূব স হ স্মৈভ্যঃ কামানাগায়তি ॥ ১৩ ॥

ছাঃ ১মঃ অঃ, ৩য়ঃ খঃ।

ইহার ভাবার্থ এই যে, মুখ্য প্রাণের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার জন্য অঙ্গিরা নামক ঋষি উদগীথাখ্য ওঁকারের উপাসনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বুঝিলেন যে, মুখ্য প্রাণে অর্থাৎ আত্মার সত্ত্বার, ইন্দ্রিয়াদি অপর প্রাণ, পানীয়

এবং আহারীয় গ্রহণ করিয়া শরীরকে পুষ্ট করে ; পুনরায় মুখ্য প্রাণের আরও সূক্ষ্ম-তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত বৃহস্পতি ঋষি উক্ত প্রকার ওঁকারের উপাসনা করিয়াছিলেন ; তাহা[illegible] তিনি বুঝিলেন, "বাক্ই" বৃহতী, "তস্যা এব পতিঃ" অর্থাৎ বাকের পতি [illegible] প্রাণ। ইহার ভাবার্থ এই যে, শ্রীভগবানের প্রধান নাম যে ওঁকার এই অক্ষরের মধ্যে নিহিত, 'বাক্ ও প্রাণ' এই মিথুনযুগলের মধ্যে প্রাণই বাকের পতি। অন্য কথায় ঋকের পতি সাম, কেন না বাক্ ও ঋক্ এক এবং প্রাণ ও সাম এক।

প্রাণের ইহাপেক্ষা আরও সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝিবার জন্য আবার এইরূপ দালভ্য-তনয় বক ঋষি ওঁকারের উপাসনা করিয়া বুঝিলেন যে, উদ্গীথাখ্য ওঁকারই মুখ্য প্রাণ। প্রাণের এই চরম তত্ত্ব জ্ঞাত হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি নৈমিষারণ্যবাসী যাজ্ঞিক্ ঋষিদিগের অভিলষিত কার্য্য সম্পাদনার্থ উদ্গাতা হইয়াছিলেন।

এক্ষণে শ্রীভগবানের মিথুনীভূত যুগল (রাধাকৃষ্ণ) নাম জীবের যে একমাত্র উপাস্য, তাহার বিষয় বলা যাইতেছে :—

দেবা বৈ মৃত্যোর্বিভ্যতস্ত্রয়ীং বিদ্যাং প্রাবিশংস্তে ছন্দোভিরচ্ছাদয়ন্ যদেভিরচ্ছাদয়ংস্তচ্ছন্দসাং ছন্দস্ত্বম্ ॥ ২ ॥

তান্ উ তত্র মৃত্যুর্যথা মৎস্যমুদকে পরিপশ্যেদেবং পর্য্যপশ্যদৃচি সাম্নি যজুষি তে নু বিত্ত্বোর্দ্ধা ঋচঃ সাম্নো যজুষঃ স্বরমেব প্রাবিশন্ ॥ ৩ ॥

যদা বা ঋচমাপ্নোত্যোমিত্যেবাতিস্বরত্যেবং সামৈবং যজুরেষ উ স্বরো যদেতদক্ষরমেতদমৃতমভয়ং তৎ প্রাবিশ্য দেবা অমৃতা অভয়া অভবন্ ॥ ৪ ॥

স য এতদেবং বিদ্বানক্ষরং প্রণৌত্যেতদেবাক্ষরং স্বরমমৃতমভয়ং বিশতি তৎ প্রবিশ্য যদমৃতা দেবাস্তদমৃতো ভবতি ॥ ৫ ॥

ছাঃ ১মঃ অঃ, ৪র্থঃ খং।

দেবতারা মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া তন্নিবারণ জন্য ঋক্, যজু এবং সামবেদীয় কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া উক্ত ত্রিবেদের মন্ত্রসকলের দ্বারা আপনাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন অর্থাৎ মৃত্যু তাঁহাদিগকে আর দেখি[illegible] পারিবে না বলিয়া মনে করিয়াছিলেন বা মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন; এজন্য বৈদিক মন্ত্রের নাম ছন্দ হইয়াছে। ২।

যাহা হউক, দেবতারা বৈদিক কোন ক্রিয়া বা কোন মন্ত্রের শক্তিতে মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পাইলেন না; যে প্রকার জলের মধ্যস্থিত মৎস্য কেহ দেখিতে পায় না, কিন্তু মৎস্য-ঘাতক, মৎস্য গভীর জলের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিলেও, তাহাদের সন্ধান প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ঋক্, যজু ও সামবেদীয় কর্ম্মের বা মন্ত্রের দ্বারা দেবতাগণ আচ্ছাদিত থাকাতেও মৃত্যু তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়াছিল। দেবতারা তখন মৃত্যুর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া অর্থাৎ মৃত্যুভয় হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ঋক্, যজু এবং সাম এই ত্রিবেদের সর্ব্ব কর্ম্ম অতিক্রম বা পরিত্যাগ করিয়া স্বরাখ্য অর্থাৎ উদ্গীথাখ্য ওঁকার অক্ষরে, অন্য কথায় পঞ্চম স্বরে, শ্রীভগবানের নামের কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন। ইহার দ্বারা তাঁহারা মৃত্যুভয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন। ৩।

এই সময় হইতে যখন কেহ ঋক্ আশ্রয় করে, তখন ওঁকার উচ্চারণ করিয়া থাকে। এই প্রকার যজু এবং সামকে আশ্রয় করিতে গেলে ওঁকার উচ্চারণ করিতে হয়, কারণ ওঁকার রূপ স্বরাখ্য অক্ষরই অমৃত ও অভয়; অতএব দেবতারা শ্রীভগবানের নামের উপাসনা করিয়া অমৃত এবং অভয় হইয়াছিলেন অর্থাৎ মৃত্যুকে জয় করিয়াছিলেন। ৪।

যিনি এই ওঁকারাখ্য অক্ষরকে, অন্য কথায় শ্রীভগবানের নামকে, এই প্রকার অমৃত অর্থাৎ মৃত্যুঞ্জয় এবং অভয় গুণশালী জানিয়া আশ্রয় করেন, তাহা হইলে দেবতারা যে প্রকার অমৃত এবং অভয় হইয়াছিলেন, তিনিও সেই প্রকার অমৃত ও অভয় হইতে পারিবেন। ৫।

এজন্য অর্থাৎ এই বেদবাক্য সমর্থন করিয়া, জগদ্গুরু মহাপ্রভু নামের প্রতীক্, নামের পূজা, নামের উচ্চ-কীর্ত্তন করিয়া অভয় এবং অমৃত হইতে শিক্ষা দিয়াছেন, এবং বেদের গূঢ়-তত্ত্বানভিজ্ঞ স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের মতের বিরুদ্ধে বুদ্ধিমন্ত খাঁকে শ্রীনাম কীর্ত্তন করিবার ব্যবস্থা দিয়া সর্ব্বপাপ হইতে

মুক্তি এবং অভয় দিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রের গূঢ় তাৎপর্য্য জগৎকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, মরণান্ত প্রায়শ্চিত্তে বা মৃত্যুতে জীবের কর্ম্ম-ফল বা পাপ বিদূরিত হয় না, পরন্তু ভগবৎ-নাম-কীর্ত্তন-রূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে জীব কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে, বেদের এই বিধি শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীল সনাতনকে শিক্ষাচ্ছলে জগৎকে অতি বিস্তৃতভাবে বুঝাইয়াছেন। শ্রীশ্রী-চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থের অন্ত্যলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদ পাঠ করিলে সবিশেষ জ্ঞাত হওয়া যায়; তাহার সার মর্ম্ম এই :—

"সনাতন দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাইয়ে।
কোটী দেহ ক্ষণেকে তবে ছাড়িতে পারিয়ে ॥
দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই পাইয়ে ভজনে।
কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের উপায় কোন, নাহি ভক্তি বিনে ॥
দেহত্যাগাদি এই সব তমোধর্ম্ম।
তমোরজো ধর্ম্মে কৃষ্ণের না পাইয়ে মর্ম্ম ॥
ভক্তি বিনা কৃষ্ণে কভু নহে প্রেমোদয়।
প্রেম বিনা কৃষ্ণপ্রাপ্তি অন্য হৈতে নয় ॥"

যাহা হউক, উপরোক্ত এই সমস্ত উপনিষৎ বা বেদ বাক্যের অর্থ যাঁহারা ধারণা করিতে পারেন, তাঁহারা শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের সূক্ষ্ম-তত্ত্ব অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। তিনি প্রকাশানন্দকে শিক্ষাচ্ছলে জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন যে,—

"প্রণব (ওঁ) সে মহাবাক্য বেদের নিদান।
ঈশ্বরস্বরূপ প্রণব সর্ব্ববিশ্বধাম ॥
সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের প্রণব উদ্দেশ।"

* * *

"সর্ব্ববেদ সূত্রে করে কৃষ্ণের অভিধান"

স্থানান্তরে তিনি বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণনাম কৃষ্ণ-স্বরূপ দুইত সমান।

* * *

নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ, তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দরূপ॥
দেহ, দেহী, নাম, নামী, কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম, নাম, দেহ, স্বরূপ বিভেদ॥"

মহাপ্রভু অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন মানবগণকে ইহার ভাবার্থ বুঝাইতেছেন যে, বেদের নিদান অর্থাৎ মূল কারণ ওঁকার; এই ওঁকার অর্থাৎ প্রণব পরমেশ্বরের স্বরূপ বলিয়া বুঝিবে, এবং এই ওঁকার স্বরূপ পরমেশ্বর সর্ব্ববিশ্বের ধাম অর্থাৎ আশ্রয়স্থল বলিয়া বুঝিবে. এবং এই সর্ব্বাশ্রয় পরমেশ্বরের উদ্দেশ কোন ব্যক্তি করিতে পারে না, কারণ বেদে প্রকাশ, তিনি সর্ব্ব-ইন্দ্রিয় এবং মনের ইয়ত্তাধীন নয় অর্থাৎ অগোচর, কিন্তু প্রণব অর্থাৎ ওঁকার মন্ত্র জপ করিতে করিতে তাঁহার উদ্দেশ পাওয়া যায় অর্থাং তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়। কেননা, কৃষ্ণনাম অর্থাৎ পরমেশ্বরের নাম এবং তাহার স্বরূপ দুইই সমান অর্থাৎ শ্রীভগবানের নাম, তাঁহার বিগ্রহ অর্থাৎ তাঁহার তনু, এবং স্বরূপ এই তিন মনুষ্যের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে; কেননা, তাঁহার নাম চিদানন্দ, তাঁহার তনু চিদানন্দ এবং স্বরূপ চিদানন্দ; কাজেকাজেই তিনই চিদানন্দ, সুতরাং এক প্রকার। ইহার ভাবার্থ এই যে, কোন জীবের নাম করিলে বা কোন জীবকে প্রত্যক্ষ করিলে, আমরা বুঝিতে পারি যে, প্রত্যেক জীবের একটী নাম আছে এবং প্রত্যেক জীবের একএকটী করিয়া বিশেষ আকৃতি প্রকৃতি আছে এবং প্রত্যেক জীবের একএকটী করিয়া প্রাকৃতিক দেহ আছে এবং এই দেহে একটী করিয়া চিন্ময় দেহী আছে, সুতরাং দেহ-দেহী, নাম-নামী, এই প্রভেদ জীবধর্ম্ম; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ শ্রীভগবানে এই প্রকার নাম-নামী ও দেহ-দেহী ভেদ নাই। এই প্রকার সর্ব্ববেদে শ্রীকৃষ্ণের অর্থাৎ পরমেশ্বরের অভিধান অর্থাৎ উক্তি এই প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন।

এই সমস্ত বিচারে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে, ওঁকার যে প্রকার ভগবানের নাম-বাচক, সেই প্রকার লীলা-বাচক; সুতরাং গায়ত্রীর অর্থও ইহার অনুরূপ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, অর্থাৎ গায়ত্রীর অর্থ যে প্রকার ভগবৎ-নাম-বাচক, ঠিক সেই প্রকার তাঁহার লীলা-প্রকাশক হইবে। ইহার অভিপ্রায় এই যে, গায়ত্রী-

মন্ত্রের প্রথমাংশ ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ, ইহার অর্থ যে প্রকার ভগবৎ-নাম-বাচক, ঠিক সেই প্রকার ভগবৎ-লীলা-প্রকাশক। লীলা-প্রকাশক অর্থে ইহাদের অর্থ পরিবর্ত্তিত হইয়া, ভূঃ অর্থে পৃথিবী, ভুব অর্থে অন্তরীক্ষ এবং স্বঃ অর্থে দ্যুলোক বুঝায় এবং সবিতা অর্থে ইহা হইতে প্রসূতা বা সৃষ্টি বুঝায়। এই দুই প্রকার অর্থই উপনিষৎ অনুমোদিত। ইহাতে বুঝিতে হইবে, ভগবৎ-ভক্তের অনুরাগের আধিক্য অনুসারে ক্রমশঃ তিনটী অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অনুরাগী ভক্তের প্রথম অবস্থাকে 'প্রবর্ত্তক অবস্থা' বলে, দ্বিতীয় অবস্থাকে 'সাধক', এবং চরম অবস্থাকে 'সিদ্ধ' অবস্থা বলে। এখন ভক্তের এই প্রবর্ত্তক অবস্থায় তাঁহার ভগবৎ-লীলা-বিলাস একমাত্র অবলম্বন, অর্থাৎ এই অবস্থায় ভক্ত শ্রীভগবানের লীলা-বিলাস পাঠ করিতে,তাঁহার লীলা-বিলাস চিন্তা করিতে, এই লীলা-বিলাসের ধ্যানধারণা করিতে পরমানন্দ বোধ করেন, এক কথায় এই প্রবর্ত্তক ভক্ত সর্ব্ব-বিষয়ে সর্ব্বজগতে ভগবৎ-লীলা ব্যতীত অন্য কিছু অনুভব করিতে পারেন না। পরে এই প্রবর্ত্তক ভক্তের, পরিণতি অবস্থায় ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া এই ভগবৎ-লীলা-বিলাসের মধ্যে, ভগবদ্দর্শন-পিপাসা নিতান্ত বলবতী হইয়া উঠে, এই অবস্থায় এই সাধক ভক্তের নানাপ্রকার সাত্ত্বিক বিকার প্রাপ্তি হইয়া বিকৃত মস্তিষ্কের ন্যায় হইয়া প্রাকৃতিক বস্তু দর্শন করিয়া ভগবদ্দর্শন পাইয়াছি বলিয়া প্রতীতি হয়। এক্ষণে ভক্তের এই সাধক অবস্থার পরিপাক দশায় সাধক ভক্তের ভগবৎ লীলাবিলাসে আর রুচি থাকে না। পরন্তু তখন ভগবানের নামে (ওঁকারে) তাঁহাদের রুচি হয়, সুতরাং ভক্তের সাধক অবস্থার পরিপাক দশায়, ওঁকারের অর্থসূচক গায়ত্রী মন্ত্র, অর্থ-লীলা-প্রকাশক না হইয়া ভগবৎ-নাম-প্রকাশক অর্থ হয়। এইরূপ নামে রুচি এবং বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়া নানাপ্রকার প্রাকৃতিক পদার্থে ভগবদ্দর্শন করা সিদ্ধ অবস্থার পূর্ব্ব লক্ষণ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

ইহার বেদ প্রমাণ যথা :—

নীহারধূমার্কানিলানলানাং খদ্যোতবিদ্যুৎ-স্ফটিক-শশিনাম্।
এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে ॥১১॥

পৃথ্ব্যপ্‌তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে
ন তস্য রোগো ন জরা ন দুঃখং প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং
শরীরম্‌ ॥ ১২ ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ॥ ২য় অধ্যায় ॥

ইহার ভাবার্থ এই যে, যোগ-ক্রিয়াকালে নীহার, ধূম, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি, খদ্যোত, বিদ্যুৎ, স্ফটিক ও চন্দ্র এই সমুদয়ের রূপ ব্রহ্ম প্রকাশের নিমিত্তরূপ প্রথমে আবির্ভূত হয়।। ১১ ॥

মৃত্তিকা, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ সমুত্থিত হইলে,—পঞ্চাত্মক যোগগুণ প্রকাশমান হইলে,—যোগাগ্নিময় শরীর-প্রাপ্ত সাধকের রোগ, জরা ও দুঃখ থাকে না ॥ ১২ ॥

ভগবৎ-কৃপা-সিদ্ধ ভক্তকে শ্রীভগবান্‌ স্বকীয়া তনু প্রদর্শন করান, তাহার বেদ-প্রমাণ যথা :—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং
স্বাম্‌ ॥৩॥

মুণ্ডকোপনিষৎ ॥ ৩মু ॥ ২য়খ ॥

ইহার ভাবার্থ এই যে, এই আত্মাকে অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌কে বেদাধ্যাপন বা মেধা অর্থাৎ গ্রন্থার্থ-ধারণশক্তি বা বহুশাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা লাভ করা যায় না। যাঁহাকে ইনি অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌ আত্মদর্শনার্থ বরণ করেন, তাঁহা দ্বারাই ইনি লভ্য ; তাঁহার নিকটে ইনি স্বকীয়া তনু অর্থাৎ স্বস্বরূপ প্রকাশ করেন ॥৩॥

তাই মহাপ্রভু জগৎকে বুঝাইয়াছেন, ঐকান্তিক লোভই ভগবৎ-প্রাপ্তির এক মাত্র উপায়, কখন তিনি সাধনসিদ্ধ নহেন, কেননা বেদ বলিতেছেন—

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌ গচ্ছতি নো মনো
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ।

অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি
ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্ ব্যাচচক্ষিরে ॥৩॥

কেনোপনিষৎ ॥ ১ খঃ ॥

ইহার ভাবার্থ যথা,—তিনি অর্থাৎ শ্রীভগবান্ চক্ষুর গম্য নহেন, বাক্যের গম্য নহেন, মনেরও গম্য নহেন, আমরা তাঁহাকে জানি না, কিরূপে তাঁহার উপদেশ দিতে হয়, তাহাও জানি না। তিনি অবিকৃত ও বিকৃত সমুদয় বস্তু হইতে অধি অর্থাৎ অতীত। যে সকল পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যেরা আমাদের নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমরা এইরূপ শুনিয়াছি ॥ ৩ ॥

ইহাদ্বারা বুঝিতে হইবে যে, ভগবৎপ্রাপ্তি সহজ নহে এবং সকলের ভাগ্যে প্রাপ্য নহে, তিনি সাধনার বিষয়। বেদপ্রমাণ যথা ঃ—

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥ ৪ ॥

মুণ্ডকোপনিষৎ ॥ ২য় মুঃ ॥ ২য় খঃ ॥

প্রণব অর্থাৎ ওঁকার ধনু (আশ্রয়), শর, আত্মা এবং ব্রহ্ম লক্ষ্যস্বরূপ। এক্ষণে, সাধকরূপ ধনুকধারী,যদি তাঁহার আত্মা রূপ শর দ্বারা লক্ষ্যস্থানীয় ব্রহ্মকে বিদ্ধ করিতে চাহেন,তবে অপ্রমত্তেন অর্থাৎ বাহ্য বিষয় হইতে চিত্ত সংযম করিয়া একনিষ্ঠ ভাবে ওঁকার মন্ত্র আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ নাম আশ্রয় করিয়া শরের ন্যায় শ্রীভগবানে তন্ময় হইতে পারিলে ভগবৎ-প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ তন্ময় ভাবে নামের আশ্রয় করিলে নামীর দর্শনপ্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব সাধক-অবস্থাপ্রাপ্ত ভক্তগণ গায়ত্রীর অর্থে শ্রীভগবানের নাম ব্যতীত অন্য কোন প্রকার লীলা-বিলাস-অর্থের চিন্তা করিবেন না। কেননা,তাহা হইলে চিত্তের প্রমত্ততা ঘটিবে।

আবার যাঁহারা তন্ত্রের বিধি অনুসারে ওঁকারকে অ, উ, ম, এই তিন ভাবে বিভক্ত করিয়া অ অর্থে ব্রহ্মা, উ অর্থে বিষ্ণু, ম অর্থে মহেশ্বর বুঝেন অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর বলিয়া বুঝেন,তাঁহাদের এই প্রকার অর্থ যে সম্পূর্ণ বেদ-বিরোধী,

তাহা নহে, বেদানুসারে এই প্রকার অর্থে ওঁকার মন্ত্র জপ করিলে ঘোর নরকে পতিত হইতে হয়, তাহার প্রমাণ যথা :—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় এব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ ॥ ১২ ॥

যজুঃ ॥ অঃ ৪ ॥ মঃ ৯ ॥

ইহার ভাবার্থ এই যে,যিনি অসম্ভূতিকে অর্থাৎ প্রকৃতিকে উপাসনা করেন, তিনি অন্ধকার অর্থাৎ অজ্ঞান এবং দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হন। আর যে ব্যক্তি অসম্ভূতিকে অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন কোন জীব বা দেবতা বা কোন জড় পদার্থের উপাসনা করেন, তাঁহাকে ঘোর নরকে যাইতে হয়। অতএব বেদকে যাঁহারা স্বতঃ প্রমাণ বলিয়া বুঝিয়াছেন, তাঁহারা কখন প্রণব অর্থাৎ ওঁকারের অর্থে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, বা সূর্য্য বুঝিবেন না। ইহাঁরা সকলেই বেদ অনুসারে সম্ভূতি।

এক্ষণে আর একটী প্রশ্ন এই যে, ওঁকার অক্ষরে সংসৃষ্ট অন্য কথায় শ্রীভগবানের নামের সংসৃষ্ট মিথুন-যুগলের নামকে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু রামানন্দ রায়ের মুখ দিয়া যুগল রাধাকৃষ্ণ নামে অভিহিত করিলেন কেন অর্থাৎ ভগবৎ-নামকে রাধাকৃষ্ণ নামে অভিহিত করিলেন কেন? এই গুরুতর প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিতে হইলে প্রথমেই বিচার করিতে হইবে যে, পরমেশ্বরকে বৈষ্ণবগণ নন্দসুত শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া অভিহিত করিলেন কেন? শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে ইহার মীমাংসা এইরূপ আছে যথা,—

"স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পরতত্ত্ব।
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব॥
নন্দসুত বলি যাঁরে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঞি॥
প্রকাশ-বিশেষে তেঁহো ধরে তিন নাম।
ব্রহ্ম পরমাত্মা আর স্বয়ং ভগবান্॥
তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণমণ্ডল।
উপনিষদ কহে তাঁরে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল॥

চর্ম্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য্য নির্ব্বিশেষ।
জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে তাঁহার বিশেষ ॥
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি।
সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গকান্তি ॥
সেই গোবিন্দ ভজি আমি তেঁহো মোর পতি।
তাঁহার প্রসাদে মোর হয় সৃষ্টি-শক্তি ॥
আত্মান্তর্যামী যাঁরে যোগশাস্ত্রে কয়।
সেহ গোবিন্দের অংশ বিভূতি যে হয় ॥
অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে।
তৈছে জীব গোবিন্দের অংশ প্রকাশে ॥"

ইহার দ্বারা বৈষ্ণবগণ পরমেশ্বরকে নন্দসুত কৃষ্ণ বলিয়া অভিহিত করিতেছেন, ইহার ভাবার্থ এই যে, ভগবদ্ভক্তগণ পরমেশ্বরকে অনেক নামে অভিহিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে নন্দসুত কৃষ্ণ একটী নাম। ইহাতে সাধারণ পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিগণ ভুলক্রমে না বুঝেন যে, দৈবকীনন্দন বা বাসুদেব কৃষ্ণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের উপাস্য; তাহাও শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে এইরূপ মীমাংসিত হইয়াছে যথা,—

"কৃষ্ণ কহেন ব্রহ্মা তোমার না বুঝি বচন।
জীব হৃদি জলে বৈসে সেই নারায়ণ ॥
ব্রহ্মা কহে জলে জীবে যেই নারায়ণ।
সে সব তোমার অংশ এ সত্য বচন ॥
কারণাব্ধি ক্ষীরোদ গর্ভোদকশায়ী।
মায়াদ্বারে সৃষ্টি করে তাতে সব মায়ী ॥
সেই তিন জলশায়ী সর্ব্ব-অন্তর্যামী।
ব্রহ্মাণ্ডবৃন্দের আত্মা যে পুরুষনামী ॥
হিরণ্যগর্ভের আত্মা গর্ভোদকশায়ী।
ব্যষ্টিজীব-অন্তর্যামী ক্ষীরোদকশায়ী ॥
এ সবার দর্শনেতে আছে মায়াগন্ধ।
তুরীয় কৃষ্ণের নাহি মায়ার সম্বন্ধ ॥

সেই তিনজনের তুমি পরম আশ্রয়।
তুমি মূল নারায়ণ ইথে কি সংশয়॥
সেই তিনের অংশী পরব্যোম নারায়ণ।
তেঁহ তোমার বিলাস তুমি মূল নারায়ণ॥
অতএব ব্রহ্মবাক্যে পরব্যোম নারায়ণ।
তেঁহ কৃষ্ণের বিলাস এই তত্ত্ব-বিবরণ॥"

এই সমস্ত বৈষ্ণব-শাস্ত্র-বাক্যে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, বেদোক্ত জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি এই তিনটী অবস্থার অতীত তুরীয় ব্রহ্ম বা ভগবান্‌কে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মায়াগন্ধহীন তুরীয় কৃষ্ণ বা নন্দসুত বলিয়া ভাগবতে কীর্ত্তন করিয়াছেন, ইহাতে আরও বুঝিতে হইবে যে, যাঁহার জন্ম ও মৃত্যু আছে, যাঁহাদের স্থূল এবং লিঙ্গশরীর আছে এবং যাঁহাদের দেহ-দেহী সম্বন্ধ আছে, তাঁহারা জীবধর্ম্মযুক্ত, সুতরাং মায়ার অধীন; কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের উপাস্য শ্রীকৃষ্ণের বা নন্দসুতের জীবধর্ম্মযুক্ত দেহদেহী নামনামী ভেদ নাই, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে উক্ত আছে, যথা,—

"দেহদেহী নামনামী কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্মনাম দেহস্বরূপ–বিভেদ॥
অতএব কৃষ্ণের নাম দেহ-বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে হয় স্বপ্রকাশ॥
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ॥"

স্থানান্তরে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বের এইরূপ বর্ণনা আছে, যথা—

"ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব-অবতারী সর্ব্ব-কারণ প্রধান॥"

চৈঃ চঃ ১২৯।

এক্ষণে রাধাতত্ত্ব বুঝিতে হইবে। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে রাধাতত্ত্ব-বিষয় এইরূপ বর্ণনা আছে, যথা :—

"সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিনরূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥"

*　　　*　　　*

কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ-আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥
হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ-চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান॥
প্রেমের পরম-সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরাণী॥

*　　　*　　　*

সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার।
কৃষ্ণ বাঞ্ছাপূর্ণ করে এই কার্য্য যার॥
মহাভাব-চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখি যাঁর কায় ব্যূহরূপ॥

*　　　*　　　*

কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যার ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥
কিংবা প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ॥
কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে॥

*　　　*　　　*

কিংবা কান্তি শব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে।
কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে॥

রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ।
সর্ব্বকান্তি শব্দের এই অর্থ-বিবরণ॥
জগৎ-মোহন কৃষ্ণ তাঁহার মোহিনী।
অতএব সমস্তের পরা-ঠাকুরাণী॥
রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরিমাণ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥"

এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-গ্রন্থের এই প্রকার রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব ভাল করিয়া বৈদিক বুদ্ধিতে বিচার করিয়া বুঝিয়া এবং তাহার সহিত ছান্দোগ্য উপনিষদের নিম্ন-লিখিত বচন মিলন করিয়া সমালোচনা করিলে পরিষ্কার বুঝা যাইবে, ওঁকার-সংসৃষ্ট মিথুনযুগলকে রাধাকৃষ্ণ নামে অভিহিত করিয়া, বেদের অতি বিশদ ব্যাখ্যা মহাপ্রভু প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, এবং যাঁহারা মহাপ্রভুকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া বুঝিয়াছেন, তাঁহারা বুঝুন যে, স্বয়ং ভগবান্, পুরাণ, তন্ত্র প্রচার করিতে কখনই অবতীর্ণ হয়েন না, সর্ব্বকালেই জীবের প্রতি কৃপা করিয়া বেদের গূঢ় অর্থ জীবে যেভাবে বুঝিতে সমর্থ হয়, সেইভাবে বুঝাইয়া থাকেন, উক্ত ছান্দোগ্য উপনিষদের বচন যথা :—

তদেতন্মিথুনমোমিত্যেতস্মিন্নক্ষরে সংসৃজ্যতে যদা বৈ মিথুনৌ সমাগচ্ছত আপয়তো বৈ তাবন্যোন্যস্য কামম্ ॥৬॥

ছান্দোগ্য উপনিষৎ। ১ম খঃ, ১ম খ॥

ইহার অর্থ পূর্ব্বে বিশদভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে বিচার্য্য এই যে, শ্রীভগবানের নামে সংসৃষ্ট "বাক্-প্রাণ" বা "ঋক্-সাম" নামক মিথুনদ্বয় এক অপরের কামনা পূর্ণ করে। ইহাদ্বারা বুঝিতে হইবে, পূর্ণ ভগবানের বা প্রাণরূপ পতির সর্ব্ববাঞ্ছা পূর্ণ করা কেবল পূর্ণ আনন্দময়ী কান্তা ব্যতীত অন্য কেহ পূরণ করিতে পারে না। এই বিচারে আর এক অভ্রান্ত সত্য সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হইতে পারি যে, ভগবত্তত্ত্ব, পূর্ণ আনন্দময়ীসহ মিথুনযুগলে, অচিন্ত্য ভেদাভেদরূপে সংসৃষ্ট হইয়া এক অপরের কামনা পূর্ণ করিয়া পূর্ণানন্দ, পূর্ণকাম হইয়া তুরীয় অবস্থায় সৎস্বরূপ বিরাজিত আছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ সৎস্বরূপ এই তুরীয় পূর্ণানন্দময়ী এবং পূর্ণানন্দময়কে রাধাকৃষ্ণ বলিয়া অভিহিত করেন, ইহাতে নাম (শব্দ) পরিবর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন দোষ দেখা যায় না,কেননা,বেদোক্ত তুরীয় ভগবানের গুণ,কর্ম্ম, এবং স্বভাবের সহিত শ্রীরাসমণ্ডলস্থ শ্রীরাধাকৃষ্ণের গুণ, কর্ম্ম, স্বভাবের তুলনা করিলে বুঝা যাইবে যে, এক অপরের নামান্তর মাত্র, ওঁকার-সংস্পৃষ্ট মিথুনস্থ বাকের "কামনা আছে," এই কামনা, ওঁকারস্থ মিথুনের পতি "প্রাণ" পূরণ করেন। উক্ত বেদ-বচনের এই প্রকার অর্থ করা হইয়াছে; ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, এই মিথুনস্থ বাক্ জড়পদার্থ বা জড়শক্তি নহে; কেননা, জড়পদার্থ বা জড়শক্তির কামনা বা বাঞ্ছা হওয়া কখন সম্ভবপর হইতে পারে না, সুতরাং তাঁহার বাঞ্ছা পূরণ করিবার কাহারও আবশ্যক হয় না; কাজে কাজেই এই বাক্ চিৎবিভূতিযুক্ত একটী ভাব, সত্তা বা তত্ত্ব-অবয়ব বলিয়া বুঝিতে হইবেই হইবে। এক্ষণে বেদ অনুসারে বাকের বিজ্ঞান বা গুণ কর্ম্ম এবং স্বভাব বুঝিতে গেলে দেখা যায়, পৃথিবী এই চরাচর জগতের রস বা বীজ বা বীর্য্যস্বরূপ। আবার বিজ্ঞান-চক্ষে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, পৃথিবীর সার-ভূত রস বা সর্ব্বপ্রধান পদার্থ "জল," কারণ পৃথিবীতে প্রচুর পরিমাণ জল না থাকিলে, কি চর কি অচর কোন পদার্থের সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব হইত। আবার দেখা যায় যে, জল হইতে যত পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার মধ্যে ওষধিসকল সর্ব্বপ্রধান কারণ। ওষধি সৃষ্টি না হইলে কোন জীবজন্তু পৃথিবীতে আবির্ভূত হইত না; কাজে কাজেই বলিতে হইবে, জলের সার ওষধি, এই প্রকার ওষধি আহার করিয়া যতপ্রকার জীব জন্তু পৃথিবীতে বাস করে,তাহার মধ্যে পুরুষই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কাজেই বলিতে হইবে যে, ওষধির সার পুরুষ। এস্থানে এই পুরুষ শব্দে মনুষ্যজাতির অন্তর্গত সমস্ত স্ত্রী ও পুরুষ বুঝিতে হইবে। আবার এই মনুষ্যজাতির মধ্যে যাঁহারা বাক্‌শক্তির পরমোৎকর্ষ লাভ করিয়া যথারীতি সামস্বরে ঋক্‌মন্ত্রসকল উৎগান করিয়া বা পঞ্চমস্বরে উচ্চ কীর্ত্তন করিয়া শ্রীভগবান্‌কে প্রেমাকর্ষণ করিতে পারেন, সেই প্রকার বাক্ বা সেই প্রকার পরমোৎকর্ষপ্রাপ্ত বাক্‌শক্তি-সম্পন্ন ভগবৎ প্রেমিক, সমগ্র পুরুষের সার বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আবার দেখা যায়, বেদে এই মিথুনযুগলের মধ্যে এই ভগবৎ-প্রেমিককে স্ত্রী এবং ভগবত্তত্ত্ব-স্বরূপ প্রাণকে তাহার পতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এক্ষণে এই প্রেমিক

স্ত্রীতত্ত্বের গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাব বিচার করিয়া বুঝিতে গেলে, প্রাণ বা পতি-তত্ত্বের গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাবের বর্ণনা বেদে কিপ্রকার আছে, তাহা ইহার সঙ্গে বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে। বেদে একাদশ ইন্দ্রিয়কে গৌণপ্রাণ বলিয়া বর্ণনা করিতে দেখা যায় এবং যাহার সত্তায় বা শক্তিতে শক্তিমান হইয়া ইন্দ্রিয়গণ বিষয় ভোগ করিতে পারে, তাহাকে মুখ্যপ্রাণ বলিয়া বর্ণনা আছে। ইহাদ্বারা এই প্রকার সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায় যে, বিষয় ভোগোপযোগী একাদশ ইন্দ্রিয়যুক্ত মুখ্যপ্রাণই ওঁকার-সংসৃষ্ট মিথুনযুগলস্থ পতি, কেননা মুখ্য প্রাণের অভাবে কোন প্রাণ বা ইন্দ্রিয় কখন কোন বিষয় ভোগ করিতে পারে না। ইহার বেদপ্রমাণ যথা :—

ন বৈ বাচো ন চক্ষূংষি ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসীত্যাচক্ষতে প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্ব্বাণি ভবতি ॥

ছান্দোগ্য ৫ম অঃ।১ খঃ ॥

ইহার ভাবার্থ—বাক্যই বল, চক্ষুই বল, আর মনই বল, একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কোন ইন্দ্রিয় যখন আপন আপন বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না, তখন তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ নামকরণ না করিয়া, প্রাণ বলিলে উহাদের সকলকেই বুঝায়; কেননা, প্রাণ হইতে ইন্দ্রিয়সকল পৃথক্ নহে। ইহাতে বুঝিতে হইবে, যাহাতে প্রাণের কামনা পূর্ণ হয়, ইন্দ্রিয়গণের কামনাও তাহাতে পূর্ণ হয়; ইহাতে আরও বুঝিতে হইবে যে, ওঁ অক্ষররূপ মিথুনযুগলেই প্রিয়া স্ত্রীতত্ত্ব, তাঁহার পতি 'প্রাণের' চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, হস্ত, পদ, বাক্, পায়ু, উপস্থ এবং মন এই একাদশ ইন্দ্রিয়ের কামনা পূরণ করেন, ইহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, স্ত্রীতত্ত্ব যখন পতিতত্ত্বের সহিত সমাগচ্ছ হয়, তখন তাহার সর্ব্ব-ইন্দ্রিয়ের কামনা পূর্ণ হয়; ইহার মধ্যে একটী অতি গূঢ় বিষয় বুঝিতে হইবে, রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, অনুকূল হইলে জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল তৃপ্ত হয় বটে, কিন্তু মন নামক ইন্দ্রিয়ের কার্য্য অতি বিচিত্র, কেননা, মন ভাবময়; রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, বিশেষ অনুকূল হইলেও মনের অবস্থাভেদে ভাবের প্রতিকূল হইলে মনের পরিতৃপ্তি হয় না। ক্ষুধাতুরকে অন্নপ্রদান না করিয়া সুমধুর নৃত্যগীত শ্রবণ করাইলে মন কখনও পরিতৃপ্ত হয় না। ইহাতে বুঝিতে

হইবে যে, ওঁকারস্থ মিথুনীভূত স্ত্রীতত্ত্ব এবং পতিতত্ত্ব এক অপরের নিকট কেবল সর্ব্ব-ইন্দ্রিয় তৃপ্তকর নহে, পরন্তু এক অপরের সর্ব্বভাবপূরক; এই কথাটা অন্যভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, এই স্ত্রীতত্ত্ব সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়ের এবং মনের সর্ব্বপ্রকার ভাবের আশ্রয় এবং এই পতি-তত্ত্ব সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়ের এবং মনের সকল প্রকার ভাবের বিষয়। এক্ষণে এই মিথুনস্থানীয় স্ত্রীতত্ত্বের বিষয় একটুকু বিস্তার করিয়া বুঝিতে গেলে বুঝা যায় যে, এই সমগ্র বিশ্বজগতে স্থূল সূক্ষ্মভাবে অথবা জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি অবস্থায় যেস্থানে যাহা কিছু আছে, তাহার সমস্তই এই স্ত্রী-তত্ত্বের ভিতর নিহিত আছে, কেননা, পূর্ব্বে বেদ-বচন দ্বারা দেখান হইয়াছে যে, এই পরিদৃশ্যমান চরাচর জগতের সার পৃথিবী এবং পৃথিবীর সার জল ইত্যাদি করিয়া ক্রমশঃ সারের সার দেখাইয়া পরিশেষে মিথুনীভূত বাক্ বা স্ত্রী-তত্ত্ব (রমণী-তত্ত্ব)সমগ্র বিশ্বের সার বলিয়া দেখান হইয়াছে এবং প্রাণকে এই বিশ্বের রমণী-তত্ত্বের পতি বা রমণ বলিয়া দেখান হইয়াছে, কেননা, যতক্ষণ বা যতকাল বা যত যুগ ইহারা মিথুনে সমাগচ্ছ হয়েন বা রমণ করিতে থাকেন, ততকাল প্রাণের চিৎবিভূতি বিশ্বজগতে প্রত্যেক পদার্থে অণু পরমাণুর সহিত ওতপ্রত ভাবে বিরাজিত থাকেন এবং এই কার্য্য-কারণাত্মক জগৎ রূপ প্রকাশ থাকে এবং কালক্রমে যখন এই প্রাণাখ্য শ্রীভগবান্ উপরোক্ত তিনটী অবস্থা অতিক্রম করিয়া তুরীয় অবস্থা প্রাপ্ত হন, তখন এই রমণী-তত্ত্বও তুরীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া স্বধা নামে তুরীয় মিথুনে অবস্থিত করেন, ইহার বেদ-প্রমাণ যথা,—

"আনীদবাতং স্বধয়া তাদকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাস ॥"

ঋক্‌বেদ ॥১০মঃ, মঃ ॥

ইহার ভাবার্থ এই যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে অবাতপ্রাণিত "স্বধাদ্বারা" একটি "প্রাণ" বর্ত্তমান ছিলেন, ইহা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। ঋক্‌বেদের উক্ত শ্লোকের অর্থ এই, কিন্তু এই বাক্যের মধ্যে অনেক ভাব নিহিত আছে, তাহা বুঝিতে হইবে। ইহার ভাবার্থ এই যে, আমরা প্রাকৃতিক সৃষ্টি-তত্ত্ব বিচার করিয়া বুঝিতে গেলে, বুঝিতে পারি যে, বায়ু হইতে জলের সৃষ্টি হইয়াছে, পরে বায়ু, জল, অগ্নি, ব্যোমাদির সমবায়ে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে অর্থাৎ সমগ্র ভৌতিক জগৎ এবং বৃক্ষলতাদিক্রমে সমগ্র জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার মধ্যে দেখা যায়

যে, জীবগণ ক্ষণকাল বায়ুর অভাবে প্রাণধারণ করিতে পারে না। এই বিষয়টী মনে রাখিয়া উক্ত বেদবচনের অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিলে বুঝা যাইবে যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রাকৃতিক সৃষ্টির পূর্ব্বে মহৎ-তত্ত্ব, অহঙ্কার-তত্ত্ব, পঞ্চ তন্মাত্রা, পঞ্চভূত, একাদশ ইন্দ্রিয় ইত্যাদি কোন তত্ত্বের অস্তিত্ব যখন ছিল না, তখন অবাতপ্রাণিত অর্থাৎ বায়ু নিশ্বাস প্রশ্বাস করিয়া জীবন ধারণ করিতে হইত না। এই প্রকার একটী "প্রাণ" স্বধার দ্বারা বর্ত্তমান ছিল, অন্য কোন সত্ত্বা ছিল না। স্ব এবং ধা এই দুই শব্দের সমাবেশ হইয়া 'স্বধা' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, স্ব = স্বীয়, ধা = ধারণ করা, এক্ষণে ইহার দ্বারা এই নিষ্পন্ন হইবে যে, আপনাকে ধারণ করিতে পারে এই প্রকার শরীরবৎ আশ্রয় অবলম্বন করিয়া একটি প্রাণ বর্ত্তমান ছিল; এই কথাটা অন্যভাবে বলিতে গেলে, বলিতে হয় যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে 'ওঁ' অর্থাৎ শ্রীভগবান্ Equipotential অসম-উর্দ্ধ বা তুরীয় অবস্থায় বর্ত্তমান ছিলেন; স্বধা এবং প্রাণ আর কিছুই নহে, উহা ওঁকার-সংসৃষ্ট মিথুনীভূত "বাক্-প্রাণ," এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে, কান্তাকান্ত স্বভাবযুক্ত ভগবত্তত্ত্ব মাত্র বর্ত্তমান ছিল, আর কিছুই ছিল না। এই বাক্-তুরীয় অবস্থায়, তুরীয় প্রাণের সহিত প্রকাশ্য ও প্রকাশক সম্বন্ধযুক্ত ছিল বলিয়া তুরীয়-বাক্‌কে স্বধা শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে, তাই সর্ব্বশাস্ত্রে এই স্বধাকে ভগবৎ-তত্ত্ব জ্ঞান করিয়া নানাপ্রকারে ব্যাখ্যা এবং স্তুতি করিতে দেখা যায়, যথা,—

নিত্যা ত্বং নিত্যরূপাসি পুণ্যরূপাসি সুব্রতে।
আবির্ভাবতিরোভাবৌ সৃষ্টৌ চ প্রলয়ে তব ॥
পুরাসীস্ত্বং স্বধাগোপী গোলোকে রাধিকা সখী।
ধৃতোরসি স্বমাত্মনং কৃষ্ণস্তেন স্বধা স্মৃতা ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, প্রকৃতি খণ্ডঃ, ৩৮ অঃ ॥

আবার বিজ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিয়া এই স্বধা শব্দের গূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে গেলে বুঝা যায় যে, প্রকাশ্য প্রকাশক ভাবে সাপেক্ষ সম্বন্ধ ব্যতীত, কোন সত্ত্বার অস্তিত্ব সম্ভবে না। Force and Resistance শক্তি এবং প্রতিরোধক

শক্তি এক অপরের সাপেক্ষভাবে সমাগচ্ছ হইলে আমরা একটী শক্তিসত্তা প্রত্যক্ষ করি। Force cannot manifest until it is obstructed. Action and reaction must be equal. বিজ্ঞান আরও বুঝিয়াছেন যে, এই প্রকাশ্য এবং প্রকাশক শক্তি সর্ব্বদা সমবলযুক্ত হইয়া থাকে,কেননা,এক অপরকে প্রকাশ করে। আবার স্থূলজগতেও ইহাই আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, গুণ গুণীর সহিত, দেহ দেহীর সহিত, নাম নামীর সহিত, শক্তি শক্তিমানের সহিত সাপেক্ষ সম্বন্ধযুক্ত,কেননা, ইহাদের একের অভাবে অপরের অস্তিত্ব অর্থাৎ বর্ত্তমান থাকা অসম্ভব। কার্য্য-জগতের সর্ব্বত্র যখন এই প্রকার প্রকাশ্য প্রকাশক সম্বন্ধযুক্ত হইয়া জাগতিক সৃষ্টি বিরাজিত রহিয়াছে, তখন জগৎকারণকে ইহার বিরুদ্ধ স্বভাবযুক্ত বলিয়া অনুমান করা মনুষ্যবুদ্ধির অতীত। আবার দেখা যায় যে, কারণে যাহা বর্ত্তমান থাকে, কার্য্যে তাহাই প্রকাশ পায়। এই কার্য্যকারণ সম্বন্ধ অনুসারে বুঝিতে হইবে যে, সর্ব্ববিশ্বের কারণ রূপ বীজ যখন তুরীয় ব্রহ্ম বা ওঁকারের তুরীয় অবস্থা, তখন এই ওঁকারের সংসৃষ্ট তুরীয় মিথুনী-ভূত "বাক্‌-প্রাণ" নিশ্চয় কান্তাকান্ত ভাবে প্রকাশ্য-প্রকাশক বা কারণরূপ মাতা-পিতা রূপে সৃষ্টির পূর্ব্বে, বাক্য এবং মনের অতীত তুরীয় অবস্থায় বর্ত্তমান ছিলেন, তখন অন্য কোন সত্তার অস্তিত্ব ছিল না, বেদেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। উক্ত ঋক্‌বেদের বচনের মধ্যে "স্বধা" শব্দকে তৃতীয়া বিভক্তিযুক্ত করিয়া "স্বধয়া" এই প্রকার পাঠ আছে, ইহার অর্থ স্বধার দ্বারা একটী প্রাণ বর্ত্তমান ছিল, অন্য কথায় বলিতে গেলে স্বধার দ্বারা একটী প্রাণ প্রকাশিত ছিল বা স্বধা এবং প্রাণ প্রকাশ্য এবং প্রকাশকভাবে অবস্থিত ছিল। আবার এই ঋক্‌-বেদের বচনের মধ্যে যে 'স্বধয়া' শব্দ আছে, পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকে তাহার এই প্রকার অর্থ করেন "স্বীয় ইচ্ছার সহিত বর্ত্তমান অর্থাৎ শ্রীভগবৎতত্ত্ব ইচ্ছার সহিত বর্ত্তমান ছিল", এই প্রকার অর্থ করাতেও বৈষ্ণবদিগের আপত্তি করিবার কোন কারণ নাই, কেন না, ইচ্ছা শব্দের একটু বিশদ ব্যাখ্যা করিলে সমস্ত গোল চুকিয়া যায়।

সুখের হেতু বা আনন্দের জন্য অভিলাষকে 'ইচ্ছা বা ইচ্ছাশক্তি' বলে; ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, যেস্থানে সুখ নাই, যেস্থানে আনন্দ নাই, সেইস্থানে বা অবস্থায় ইচ্ছা নাই। সুতরাং তুরীয়াবস্থাপ্রাপ্ত মিথুন-যুগলের রমণী-স্বভাবযুক্ত স্বধার

আশ্রয়ে প্রাণের আনন্দ হয় বলিয়া তাহাকে আহ্লাদিনী হ্লাদিনী শক্তি বলিতে হইবে। বৈষ্ণবগ্রন্থে এই হ্লাদিনী শক্তিকে শ্রীরাধা নামে অভিহিত করিয়াছেন, এবং সুখরূপ বা আনন্দস্বরূপ মুখ্যপ্রাণকে শ্রীকৃষ্ণ নামে অভিহিত করিয়াছেন। আর যখন এই রাধাকৃষ্ণ মিথুনে সমাগচ্ছ হইয়া রমণ করিতে থাকেন, তখন তাঁহারা এই যুগলমিলনকে রাম নামে অভিহিত করেন এবং এই অবস্থায় ইঁহারা অদ্বৈত-তত্ত্বরূপে পূর্ণানন্দময় হন। ইহাই ওঁকার-তত্ত্বের বা ভগবৎ-তত্ত্বের চরম বিজ্ঞান; তাই শ্রীশ্রীমহাপ্রভু জীবের প্রতি কৃপা করিয়া ওঁকার-তত্ত্বের বিশেষ ব্যাখ্যাস্বরূপ "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" এই বত্রিশ অক্ষর "নাম" অনা-চিতভাবে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। এই তারকব্রহ্ম নামের অন্তর্গত হরি, কৃষ্ণ এবং রাম এই তিনটী নামে ওঁকার-তত্ত্বের সকল অর্থ প্রকাশ করিয়াছে, তদ্যথা,—হরি শব্দের সম্বোধনে 'হরে' হয়, এই হরি শব্দের অর্থ, হরণ করে যে তাহাকে হরি বলে; কৃষ্ ধাতুর অর্থ আকর্ষণ, সুতরাং কৃষ্ণ শব্দের অর্থ আকর্ষণ করে যে, এবং রাম শব্দের অর্থ রমণ করে যে। এক্ষণে বুঝুন, ওঁকারে স্থিত রমণী-তত্ত্বকে বা রাধা-তত্ত্বকে হরিশব্দে মহাপ্রভু অভিহিত করিয়াছেন, কেন না, এই রমণী-তত্ত্ব মিথুনস্থ পতি বা কৃষ্ণ-তত্ত্বের মনকে হরণ করে। এই প্রকার মিথুনস্থ পতি বা কৃষ্ণ-তত্ত্ব মিথুনস্থ রমণী-তত্ত্ব বা রাধা-তত্ত্বকে প্রেমা-কর্ষণ করেন বলিয়া ইহাকে শ্রীকৃষ্ণ বলা হইয়াছে। আর এই মিথুনদ্বয়ের অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের যুগলে সমাগচ্ছ অবস্থাকে বা রমিত অবস্থাকে মহাপ্রভু "রাম নামে" অভিহিত করিয়াছেন, সুতরাং তারকব্রহ্ম নাম অর্থাৎ হরে কৃষ্ণ রাম ইত্যাদি বত্রিশ অক্ষর নাম শ্রীভগবানের ওঁকার নামের রূপান্তর মাত্র।

এই প্রসঙ্গে যাঁহারা তান্ত্রিক কিম্বা যে সমস্ত বৈষ্ণবগণ তান্ত্রিক দীক্ষামন্ত্রের প্রাধান্য স্বীকার করেন, তাঁহারা কত ভ্রমে পড়িয়াছেন, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য এই দ্বাত্রিংশৎ অক্ষর হরেকৃষ্ণ নামের ব্যাখ্যা রাধাতন্ত্র হইতে উদ্ধৃত করা গেল। মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে পরিষ্কার বুঝিতে পারিবেন যে, ইহা সম্পূর্ণ বেদ এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম বিরুদ্ধ, তদ্যথা:—

শৃণুমাতর্মহামায়ে বিশ্ববীজস্বরূপিণী।
হরিনাম্নো মহামায়ে ক্রমং বদ সুরেশ্বরি ॥

রাধাতন্ত্র, ১ম পটল ২৮ ॥

"বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, তুমি বিশ্বের কারণীভূত মহামায়া স্বরূপা, আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়া হরিনাম মন্ত্র আমার নিকট বলুন।" ২৮॥

ত্রিপুরাদেবী বলিতেছেন, "হে পুত্র, বলিতেছি শ্রবণ কর—

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ ২৯ ॥
দ্বাত্রিংশদক্ষরাণ্যেব কলৌ নামানি সর্ব্বদা।
শৃণুচ্ছন্দঃ সুতশ্রেষ্ঠ হরিনামঃ সদৈবহি ॥৩০॥

রাধাতন্ত্র, প্রথম পটল ।২৯।৩০।

ইহার ভাবার্থ—এই বত্রিশ অক্ষর হরিনামই কলিযুগে (জীবকে) ত্রাণ করে। হে সুতশ্রেষ্ঠ (শ্রীকৃষ্ণ)! এই মন্ত্রের ছন্দ অতি সুগোপ্য, হে তপোধন, এই হরিনামাত্মক মন্ত্র সর্ব্বশক্তিমান ॥৩০॥

রহস্যং হি বিনা পুত্র শ্রম এব হি কেবলম্।
অতএব সুতশ্রেষ্ঠ রহস্য রহিতস্যতে।
রহস্য রহিতাং বিদ্যাং ন জপে তু কদাচন ॥৩৭॥
এতদ্রহস্যং পরমং হরিনাম্নস্তপোধন ॥৩৮॥
হকারস্তু সুতশ্রেষ্ঠ শিবঃ সাক্ষান্নসংশয়ঃ।
রেফস্তু ত্রিপুরাদেবী দশমূর্ত্তিময়ী সদা।
একারঞ্চ ভগং বিদ্যাৎ সাক্ষাৎ যোনিং তপোধন।
হকারঃ শূন্য রূপীচ রেফো বিগ্রহধারকঃ ॥৩৯॥
হরিস্তু ত্রিপুরা সাক্ষান্মমমূর্ত্তির্নসংশয়ঃ।
ককারং কামদা কামরূপিণী স্ফুরদব্যয়া।

ঋকারস্তু সুতশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠশক্তি রিতীরিতা।
ককারঞ্চ ঋকারঞ্চ কামিনী বৈষ্ণবী কলা ॥৪০॥
ষকারশ্চন্দ্রমা দেবঃ কলা ষোড়শ সংযুতঃ।
ণকারঞ্চ সুতশ্রেষ্ঠ সাক্ষান্নিবৃত্তিরূপিণী ॥
দ্বয়োরৈক্যং তপঃশ্রেষ্ঠ সাক্ষাত্ত্রিপুরভৈরবী ॥৪১॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ সুতশ্রেষ্ঠ মহামায়া জগন্ময়ী।
হরে হরে ততো দেবী শিবশক্তিস্বরূপিণী ॥৪২॥
হরে রামেতি চ পদং সাক্ষাজ্জ্যোতির্ম্ময়ী পরা।
রেফস্তু ত্রিপুরা সাক্ষাদানন্দামৃত সংযুতা।
মকারস্তু মহামায়া নিত্যা তু রুদ্ররূপিণী ॥৪৩॥
বিসর্গস্তু সুতশ্রেষ্ঠ সাক্ষাৎ কুণ্ডলিনী পরা।
রাম রামেতি চ পদং শিবশক্তিঃ স্বয়ং সুত।
হরেহরেঽপি চ পদং শক্তিদ্বয়সমন্বিতং ॥৪৪॥
আদ্যন্তে প্রণবং দত্ত্বা যো জপেদ্দশধা দ্বিজঃ।
স ভবেৎ সুত বরশ্রেষ্ঠ মহাবিদ্যাসু সুন্দরঃ ॥৪৫॥

ত্রিপুরাদেবী বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন :—

হে সুতশ্রেষ্ঠ! মন্ত্রাদির অর্থজ্ঞান ব্যতিরেকে কেবল জপ করায় শুধু পরিশ্রমমাত্র সার হয়। তুমি রহস্যবিহীন অর্থাৎ তুমি মন্ত্রের অর্থ জান না—কি প্রকারে তুমি সিদ্ধ হইতে পারিবে? অর্থরহিত বিদ্যার (মন্ত্র) কদাচ আরাধনা করিবে না। (৩৭)

অতএব তোমাকে হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি হরিনাম মন্ত্রের গোপনীয় পরম রহস্য বলিতেছি।৩৮।

হকার সাক্ষাৎ শিব, রেফ্ দশবিদ্যাময়ী ত্রিপুরা দেবী এবং একার যোনিপীঠস্বরূপ। তপোধন! পুনর্ব্বার হকার, শূন্যরূপী অর্থাৎ অব্যক্ত ঈশ্বর রূপী, রেফ্ শরীরধারী ব্যাক্ত ঈশ্বর স্বরূপ।৩৯।

হকার ও রেফ্ মিলিত হরি এই শব্দের অর্থ সাক্ষাৎ আমার মূর্ত্তি (ত্রিপুরা দেবীর মূর্ত্তি) জানিবে। কৃষ্ণ এই পদান্তর্গত ক-কারের অর্থ কামপ্রদা কামরূপিণী নিত্যশক্তি ও "ঋ"কারের অর্থ পরমাশক্তি। আর "ক"কার ও "ঋ"কার মিলিত "কৃ" এই পদে বৈষ্ণবীকলা বুঝায় ।৪০।

"ষ"কারের অর্থ ষোড়শকলাপূর্ণ শশধর এবং মূর্দ্ধণ্য "ণ"কারের অর্থ সাক্ষাৎ নিবৃত্তিরূপিণী। "ষ"কার এবং "ণ" কার মিলিত "ষ্ণ" এই পদের অর্থ সাক্ষাৎ ত্রিপুরভৈরবী ।৪১।

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" এই পদের অর্থ জগন্ময়ী মহামায়া, হরে এই শব্দের অর্থ প্রকৃতি পুরুষাত্মক ব্রহ্ম ।৪২।

"হরে রাম" এই শব্দের অর্থ জ্যোতির্ম্ময়ী প্রকৃতি। রেফ্ সাক্ষাৎ ত্রিপুরা-সুন্দরী, "ম"কার সাক্ষাৎ জ্যোতির্ম্ময়ী নিত্যাশক্তি ।৪৩।

"বিসর্গ" অর্থে কুলকুণ্ডলিনীশক্তি বুঝা যায়, "রাম রাম" এই পদ শিবশক্তি জ্ঞাপক, "হরে হরে" এই পদে উভয়শক্তি বুঝায় ।৪৪।

হে সুতশ্রেষ্ঠ বাসুদেব কৃষ্ণ! এই মন্ত্রের আদি ও অন্তে প্রণব অর্থাৎ ওঁকার যোজনা করিয়া যে সাধক ষোলবার মাত্র জপ করে, তাহার মহাবিদ্যা বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভ হয়। ।৪৫।

যাহা হউক, যাঁহাদের বেদ কিম্বা উপনিষদের ভগবত্তত্বের কিছুমাত্র জ্ঞান আছে, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, এই প্রকার হরেকৃষ্ণ নামের অর্থ সম্পূর্ণ বেদ-বিরোধী।

এই রাধাতন্ত্রে উপরোক্ত বাসুদেব কৃষ্ণকে মায়াগন্ধযুক্ত ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আর শ্রীরাধাকে, ত্রিপুরাদেবীর, পদ্মিনী-মালাস্থ একটি বিদ্যা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, এবং উপরোক্ত অর্থের সহিত হরেকৃষ্ণ নাম জপ এবং কুলাচার করিয়া অর্থাৎ পঞ্চ"ম"কার দ্বারা, ত্রিপুরাদেবীর পূজা করিয়া, বাসুদেব শ্রীরাধাকে বৃন্দাবনে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই রাধাতন্ত্রের ষষ্ঠ পটলে, পদ্মিনী অর্থাৎ শ্রীরাধা বলিতেছেন যে,—

> দুঃখং নাস্তি মহাবাহো মম সংসর্গহেতুনা।
> কুলাচারোপযুক্তা যা সামগ্রী পঞ্চলক্ষণা।
> মালায়াং তব দেবেশ সদা স্থাস্যতি নান্যথা ॥১২॥

ইহার ভাবার্থ এই যে, পদ্মিনী বলিতেছেন—হে মহাবাহো! আমার সংসর্গে কোন দুঃখভোগ করিবেন না। কুলাচারোপযোগী যে পঞ্চলক্ষণা অর্থাৎ পঞ্চমকারের সাধন সামগ্রী, তাহা সর্ব্বদাই তোমার কণ্ঠমালাতে থাকিবে; ইহার অন্যথা হইবে না। ।১২।

এই সমস্ত বর্ণনাও সম্পূর্ণ বেদ এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব-শাস্ত্রবিরোধী।

যাহা হউক, এই সমস্ত কথা পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে শ্রীভগবান্ তুরীয় অবস্থায়ও যে ওঁকার নামে অভিহিত হন, তাহার বেদ প্রমাণ যথা—

নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্। অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ ॥৭॥

সোঽয়মাত্মাঽধ্যক্ষরমোঙ্কারোঽধিমাত্রং পাদা মাত্রা মাত্রাশ্চ পাদা অকার উকারো মকার ইতি ॥৮॥

ইহার ভাবার্থ এই, মাণ্ডুক্যোপনিষদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব বচনে ওঁকারের অর্থাৎ শ্রীভগবানের, জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি অবস্থার বর্ণনা করিয়া জগৎকে বুঝাইয়াছেন যে, শ্রীভগবান্, জাগ্রত অবস্থায় তিনি বহিঃপ্রজ্ঞ, স্বপ্নাবস্থায় তিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ এবং সুষুপ্তি অবস্থায় তিনি প্রজ্ঞানঘন। কিন্তু তাঁহার তুরীয় অবস্থায়, না তিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ, না তিনি বহিঃপ্রজ্ঞ, না তিনি উভয়-বিমিশ্র-প্রজ্ঞ, এক কথায়, এই অবস্থায় তিনি কোন বিষয়ের প্রজ্ঞ নহেন অথচ তিনি জড় পদার্থের ন্যায় অপ্রজ্ঞও নহেন। তিনি অদৃষ্ট অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের গ্রাহ্য নহেন, তিনি অগ্রাহ্য অর্থাৎ তিনি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের দ্বারা কিছু গ্রহণ করেন না। তিনি অব্যবহার্য্য অর্থাৎ তিনি ইন্দ্রিয় এবং মনের বিষয় নহেন বলিয়া, তাঁহার কোন ব্যবহার নাই বা কর্ম্ম নাই, তিনি অলক্ষণ, অর্থাৎ কোন বিশেষ লক্ষণ বা চিহ্ন দ্বারা তাঁহাকে বিশেষ করিবার কিছু নাই। তিনি অচিন্ত্য অর্থাৎ মনবুদ্ধির গম্য নহেন। তিনি অনির্ব্বচনীয়, তিনি আত্মপ্রত্যয়ের সার স্বরূপ অর্থাৎ জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্ত এই তিনটী লীলা-বিলাসের অবস্থায়, তাঁহার গুণকর্ম্ম

এবং স্বভাব ভাল করিয়া নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া বুঝিতে পারিলে বুঝা যায় যে, জীবের সর্ব্বপ্রকার আত্মপ্রত্যয়ের মধ্যে তাঁহার তুরীয় অবস্থা, সারের সার বলিয়া মনে হইবে। তাঁহার এই তুরীয় অবস্থা প্রপঞ্চোপশমং অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শাদির বিচার দ্বারা জীবের আত্ম-প্রত্যয় জন্মে, কিন্তু শ্রীভগবানের তুরীয় অবস্থায় তিনি রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শাদি বিচারের অতীত হন, তখন তিনি শান্তং অর্থাৎ Equipotential সাম্য অবস্থায় অবস্থিত থাকেন, কোন প্রকার আলোচনা করেন না। এই অবস্থায় তিনি "শিবমদ্বৈতং" অর্থাৎ সর্ব্বমঙ্গলময় এবং অদ্বয়-তত্ত্ব স্বরূপ হন। শ্রীভগবানের এই প্রকার অবস্থাকে জ্ঞানীগণ চতুর্থ বা তুরীয় অবস্থা বলিয়া অভিহিত করেন।

তিনি আত্মা অর্থাৎ তিনি মায়াবর্জ্জিত আত্মা বা তুরীয় কৃষ্ণ। তিনি বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য, অর্থাৎ এই মায়াবর্জ্জিত তুরীয় আত্মাকে বা তুরীয় কৃষ্ণকে জীবমাত্রেরই বিশেষ করিয়া জ্ঞাত হইতে হইবে।৭॥

এই আত্মা অর্থাৎ এই প্রকার তুরীয় আত্মা বা তুরীয় কৃষ্ণ "ওঁ" এই অক্ষর অধিকার করিয়া আছেন। তিনিই অর্থাৎ তুরীয় আত্মা বা তুরীয় কৃষ্ণই ওঁকার স্বরূপ। জাগ্রদবস্থা, স্বপ্নাবস্থা এবং সুষুপ্তি অবস্থার এই তিন পাদ, তাহাই ওঁকারের অ, উ, ম এই তিনটী পদ।৮।

এই সমস্ত বেদ-বচন অনুসারে বুঝিতে হইবে, মায়াবর্জ্জিত বিশুদ্ধ আত্মা বা পরমাত্মাকে শ্রীভগবানের তুরীয় অবস্থা বুঝায়, কিন্তু সর্ব্বজীবে এবং সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত প্রাজ্ঞ আত্মাকে বুঝায় না।

এই প্রসঙ্গে আর একটী প্রশ্ন উত্থাপিত হইতেছে যে, বৈষ্ণব-শাস্ত্রে লিখিত আছে :—

"স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পরতত্ত্ব।
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব॥"

ইহাতে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, বেদে শ্রীভগবান্‌কে পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণানন্দ এবং পরম মহত্ত্ব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, আর বৈষ্ণবেরা তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাহাতে কোন আপত্তি হইতে পারে না, কিন্তু এই পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকে ভাগবতে নন্দসুত বলিয়া বর্ণনা করিলেন কেন ?

"নন্দসুত বলি তারে ভাগবতে গায়।" চৈঃ চঃ।

এই প্রশ্নের উত্তর ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে বেদ, উপনিষদ, বেদান্ত-সূত্র এবং ভাগবত ইহাদের মধ্যে প্রত্যেক শাস্ত্র এক অপরের সঙ্গে কি প্রকার সম্বন্ধযুক্ত আছে, তাহা অগ্রে বুঝিতে হইবে। আধুনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে সকলেই উপনিষদ্ এবং ব্যাসদেব-কৃত ব্রহ্মসূত্রকে বেদের স্থায় প্রামাণিক শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে অনেকে মনে করেন যে, শ্রীমদ্ভাগবত একখানি অতি আধুনিক নগণ্য পৌরাণিক গ্রন্থ, কিন্তু শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এই ভাগবতকে বেদ, উপনিষদ বিশেষতঃ ব্রহ্মসূত্রের বিশদভাষ্য বলিয়া বেদাঙ্গের মধ্যে গণনা করিয়া গিয়াছেন। আদর্শ বৈষ্ণব-গোস্বামীদিগের গ্রন্থে এবং তাঁহাদের পরবর্ত্তী বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই মতের সমর্থন করিয়া থাকেন; গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সমুদায় ব্যাখ্যা, এই ভাগবত অবলম্বন করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। যাঁহারা শ্রীল শঙ্করাচার্য্যের উপনিষদ্ এবং ব্রহ্মসূত্রের বিকৃত-ভাষ্য পাঠ করিয়া বিকৃত-মস্তিষ্ক হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে উপনিষদ্, বেদান্ত এবং শ্রীমদ্ভাগবতের সূক্ষ্ম-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা ভগবৎ কৃপা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে হইতে পারে না। সুতরাং তাঁহাদিগকে যুক্তি ও বিচারদ্বারা এই বিষয় বুঝান অসম্ভব; তবে যাঁহারা বিশুদ্ধ ভগবৎ-সিদ্ধান্ত বুঝিতে চাহেন, তাঁহারা ভাল করিয়া বুঝুন যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় একমাত্র শ্রীভগবানের উপাসনা ব্যতীত অন্য কোন পৌরাণিক বা তান্ত্রিক দেবতার উপাসক নহেন এবং তাঁহারা বেদ-প্রমাণ ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণ গ্রাহ্য করেন না, যথা,—

"ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে তে পুরাণাগমাস্তাং
তামেব হি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্তু কল্পাবধি।
সিদ্ধান্তে পুনরেক এক ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগমব্যাপারেষু
বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে॥

চৈঃ চঃ মধ্যলীলা, বিংশ পরিচ্ছেদ॥

ইহার ভাবার্থ যথা,—চরাচর জগতের মোহার্থ বিবিধ পুরাণ ও আগমসমূহ বিরচিত হইয়াছে, তন্নিরূপিত দেবগণও মানবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইতেছেন, কিন্তু নিখিলশাস্ত্র বিচার করতঃ মীমাংসা করিলে কেবল মাত্র বিষ্ণুই ভগবান্ বলিয়া নিশ্চিত হন।

ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ আপন আপন বিদ্যা, বুদ্ধি এবং বিচারশক্তি অনুসারে, শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের যে কোন প্রকারের ব্যাখ্যা করুন না কেন, শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ইহাকে বেদ, উপনিষদ্ এবং বেদান্তসূত্রের বিস্তৃত ভাষ্য বলিয়া জগৎকে বুঝাইয়া গিয়াছেন, যথা,—

"ব্রহ্মাকে ঈশ্বর চতুঃশ্লোকী যে কহিল।
ব্রহ্মা নারদে সেই উপদেশ কৈল॥
নারদ সেই অর্থ ব্যাসেরে কহিল।
শুনি বেদব্যাস মনে বিচার করিল॥
এই অর্থ আমার সূত্রের ব্যাখ্যারূপ।
শ্রীভাগবত করিব সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ॥
চারিবেদ উপনিষদ্ যত কিছু হয়।
তার অর্থ লঞা ব্যাস করিল সঞ্চয়॥
যেই সূত্রে যেই ঋক্ বিষয় বচন।
ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোক নিবন্ধন॥
অতএব সূত্রের ভাষ্য শ্রীভাগবত।
ভাগবত শ্লোক উপনিষদ্ কহে এক অর্থ॥"

চৈঃ চঃ, মধ্যলীলা, ২৫ পঃ।

ইহার দ্বারা বিচারক্ষম পণ্ডিতগণ ভাল করিয়া বুঝুন যে, ভাগবতের অর্থ যে স্থানে বেদ, উপনিষদ্ এবং বেদান্তের সহিত বিরোধ হইবে, তথায় বুঝিতে হইবে যে, ভাগবতের ঠিক অর্থ হইতেছে না, তখনই বিশুদ্ধ বৈষ্ণবের নিকট ইহার অর্থ বুঝিয়া লইতে হইবে। উপনিষদে যে প্রকার এক একটী ইতিহাস প্রদর্শন করিয়া বেদের অভিপ্রায় প্রকাশ করা হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতও সেই প্রকার একটী বৈদিক ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া বুঝিতে হইবে। ইহার মধ্যে দশম স্কন্ধের অন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা, নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে হইবে। ইহা সর্ব্ববেদ এবং বেদান্তের সারের সার সংগ্রহ করিয়া ব্যাসদেব ব্রজ-গোপ-গোপীদিগের ইতিহাস অতি বিকশিতভাবে বর্ণনা করিয়া, ভগবত্তত্ত্ব কি, ভগবৎ-সাধনতত্ত্ব কি, ভগবৎ-সাধনার প্রয়োজন কি, তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবৃন্দাবনধাম এবং ব্রজ-গোপ-গোপীগণ কোনও

মনুষ্য-কল্পিত নহে বা প্রকৃতি-সৃষ্টির অন্তর্গত নহে, সুতরাং প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যও নহে, তাই শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীমুখে জগৎকে বুঝাইয়াছেন যে,—

"অতএব কৃষ্ণের নাম দেহ-বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে হয় স্বপ্রকাশ॥
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ॥"

আবার দেখা যায় যে, বেদ এবং পুরাণে শ্রীভগবানের প্রকাশবিশেষে এবং কার্য্যবিশেষে স্বতন্ত্র সতন্ত্র নাম হইয়াছে। ব্রহ্ম, আত্মা, এবং ভগবান্ এই তিনটী প্রকাশবিশেষের ভাগবত নাম, প্রথম পুরুষ, দ্বিতীয় পুরুষ এবং তৃতীয় পুরুষ, ইহা সৃষ্টিকার্য্যের বিশেষ বিশেষ কার্য্য অনুসারে শ্রীভগবানের নাম হইয়াছে। মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে সৃষ্টির প্রারম্ভে, তুরীয় কৃষ্ণ শ্রীভগবান্, জগৎ সৃষ্টি করিবার জন্য যখন উন্মুখ হইয়াছেন, সর্ব্বজীব এবং সর্ব্বপ্রকার প্রকৃতি-সৃষ্টির বীজ অঙ্কুরিতপ্রায় হইয়া জীবের সুষুপ্তি অবস্থার ন্যায় সত্ত্বতত্ত্ব পরিপুষ্ট রহিয়াছে অথচ তত্ত্বসকল কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ হয় নাই, এই প্রকার অবস্থাযুক্ত শ্রীভগবান্ প্রথম বা কারণ-শরীরী ব্রহ্ম, আদিপুরুষ বা সংকর্ষণ নামে অভিহিত হন। আবার বেদোক্ত হিরণ্যগর্ভের আত্মা পুরাণে গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষ বা বাসুদেব বলিয়া অভিহিত হন। আর ব্যষ্টি জীব অন্তর্য্যামী তৃতীয় পুরুষকে পুরাণে প্রদ্যুম্ন বলিয়া অভিহিত করেন। এই তিন প্রকার পুরুষ-অবতারগণ প্রাকৃতিক কার্য্যে লিপ্ত, সুতরাং ইহাঁদিগকে মায়াগন্ধযুক্ত গুণময় ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু তুরীয় কৃষ্ণ বা ভগবান্, তুরীয় শ্রীরাধা বা স্বধার সহিত মিথুনে সমাগচ্ছ হইয়া পূর্ণানন্দ ভোগ করেন, ইহা তাহার নিজ অবস্থা, ইহাতে তিনি পূর্ণকাম হন, এই তুরীয় মিথুনযুগল, নির্গুণ মায়াগন্ধহীন হইয়া পূর্ণ ভগবান্। এই তুরীয় মিথুনীভূত যুগল-তত্ত্ব মনুষ্য-বুদ্ধির গম্য নহে, এজন্য পরম কারুণিক ব্যাসদেব মহামুনি নারদের প্ররোচনায় সর্ব্ববেদের ভাষ্যস্বরূপ ভাবগত গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহার মধ্যে শ্রীবৃন্দাবন লীলায় এই পরতত্ত্বের সর্ব্বপ্রকার জ্ঞাতব্য বিষয় ভ্রান্তজীবকে বিশদভাবে শিক্ষা দিয়াছেন। ভ্রান্ত জীব যখন ইহাও বুঝিতে অক্ষম হইয়া, নানা সম্প্রদায়-ভুক্ত হইয়া কুপথগামী হইতে আরম্ভ করিতেছিল, তখন শ্রীশ্রীমহাপ্রভু

অযাচিতভাবে জীবের প্রতি কৃপা করিয়া নিজে ভক্তস্বভাব অঙ্গীকার করিয়া, নিজে ভাগবতধর্ম্মের আচার প্রচার করিয়া এবং তাঁহার নিজের শিষ্যদিগের দ্বারা এই ভাগবত শাস্ত্রের বিশদ ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে যাঁহারা ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে তাঁহার শ্রীচরণের স্মরণ লইবেন, তাঁহারাই এই গূঢ় রহস্য বুঝিতে সক্ষম হইবেন; ইহার বিপরীত, যে সমস্ত আত্ম-প্রত্যয় বা নিজবুদ্ধি-প্রবল ব্যক্তি সংশাস্ত্র কিম্বা সাধুব্যক্তিকে গুরুপদে বরণ করিবার ক্ষমতা হারাইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ভগবৎ-চর্চ্চা করা একেবারে নিষ্ফল। কেন না, আমরা বাল্যকাল হইতে ব্যবহারিক জগতে প্রত্যক্ষ করি যে, বর্ণমালা হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যাকরণ, কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞানাদি ক্রমে যে কোন বিদ্যার চর্চ্চায় আমরা নিযুক্ত হই না কেন, শাস্ত্র এবং গুরু-প্রদর্শিত প্রণালী অনুসারে সাধনা করিতে না পারিলে কখন কোন বিদ্যায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারি না, ভগবৎ-চর্চ্চাও এই নিয়মের বহির্ভূত নহে। অর্থাৎ প্রবর্ত্তক এবং সাধকদিগকে শাস্ত্র এবং সাধু বা গুরু প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিয়া অবশ্য কার্য্য করিতে হইবে, কিন্তু সিদ্ধ অবস্থায় অর্থাৎ যাঁহারা ভগবদ্দর্শন প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই প্রকার সিদ্ধকামদিগকে শাস্ত্রযুক্তির প্রতীক্ষা আর করিতে হয় না, তখন তাঁহাদের এক ভগবৎ-জ্ঞানের ফলে সর্ব্ববিজ্ঞানের জ্ঞানলাভ হয়, ইহাই বৈদিক অভ্রান্ত সত্য। *

ইহাকেই বিশুদ্ধ আত্মপ্রত্যয় বলা যায়। ইহার দ্বারা বাউল, সহজীয়া, কর্ত্তাভজা আদি বেদাচার-বিরোধী বৈষ্ণবগণ, খৃষ্টানগণ এবং আদি, সাধারণ,

---

* য এতে ব্রহ্মলোকে তং বা এতং দেবা আত্মানমুপাসতে তস্মাৎ তেষাং সর্ব্বে চ লোকা আত্তাঃ সর্ব্বে চ কামা স সর্ব্বাংশ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি হ প্রজাপতিরুবাচ ॥ ৬ ॥ ছাঃ উঃ ৮।১২।

ব্রহ্মলোকবাসী দেবগণও শ্রীভগবানের উপাসনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা এই পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়াই সর্ব্বলোকের সর্ব্বকাম্যবস্তু প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব যিনি বিচারপূর্ব্বক এই আত্মাকে বিদিত হয়েন, তিনি সকল লোকের সকল কাম্যবস্তু প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ তাঁহার কিছুই অবিদিত থাকে না, সকল বিষয়েরই জ্ঞান হয়। ইহাই প্রজাপতি ইন্দ্রকে উপদেশ করিলেন ॥ ৬ ॥

যাঁহারা সবিশেষ জানিতে চাহেন, তাঁহারা ছান্দোগ্য উপনিষদের ৬ষ্ঠ ও ৭ম অধ্যায় পাঠ করিবেন।

নববৈধানিক আদেশবাদী ব্রাহ্মগণ ভাল করিয়া বুঝুন যে, মায়ামোহে আবদ্ধ ব্যক্তির বা প্রবর্ত্তক বা সাধক ভগবদ্ভক্তের কখন বিশুদ্ধ আত্মপ্রত্যয় হয় না, বা শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ আদেশ কখন পাইতে পারেন না। আজকালকার পাশ্চাত্য উন্নতিশীল বিজ্ঞান-জ্ঞানালোকে আলোকিত হইয়া যাঁহারা এই প্রকার আদেশবাদীদিগের কপটতা বুঝিতে সক্ষম হন না, তাঁহাদের তুল্য অর্ব্বাচীন আর নাই, কেন না, যাঁহারা আবশ্যকমত ভগবদ্দর্শন বা তাঁহার আদেশ প্রাপ্ত হন, তাঁহারা কি বাহ্য-জগতের অলীক সুখশান্তির অনুসন্ধানে ইচ্ছুক হন? ধ্রুব রাজ্যলাভের জন্য পদ্মপলাশলোচনের অনুসন্ধানে কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু যখন তিনি ভগবদ্দর্শন প্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি সর্ব্বকামনা পরিত্যক্ত হইলেন। এমন কি, শ্রীবৈকুণ্ঠধামের উপরিভাগস্থ ধ্রুবলোকে গমন করিতেও সম্মত হইলেন না; এই আখ্যায়িকা অলীক মনে করিলেও ইহার তত্ত্ব উপদেশক বলিতে হইবে। অতএব মায়ামুগ্ধ বিষয়াসক্ত ব্যক্তির প্রতি সাক্ষাৎ ভগবৎ-আদেশ বা ভগবদ্দর্শন কখন হইতে পারে না, ইহাই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে বৃন্দাবন-লীলায় ব্রজ-গোপীদিগের চরিত্র বর্ণনাচ্ছলে—বিশেষতঃ শ্রীরাসমণ্ডলে প্রবেশাধিকারপ্রাপ্তা গোপীদিগের চরিত্র বর্ণনাচ্ছলে ব্যাসদেব ইহাই বুঝাইয়াছেন। ব্যাসদেব সর্ব্ববেদের সারতত্ত্ব জগজ্জনকে বুঝাইবার জন্য, রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণকে তুরীয় আনন্দ চিন্ময় সত্ত্বা স্থানীয় করিয়া দেখাইয়াছেন, এবং রাসেশ্বরীকে তুরীয় আনন্দময়ী স্থানীয় করিয়া দেখাইয়াছেন। রাসেশ্বরীর সখিবৃন্দকে তাঁহার কায়ব্যূহ অনন্ত ভাবময়ী সত্ত্বাস্থানীয়া করিয়া দেখাইয়াছেন, স্বকায়ব্যূহ রাসেশ্বরীর তুরীয় মিথুনের স্বধার ন্যায় কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করা ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য নাই, আর রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণের তুরীয়-মিথুনের প্রাণের ন্যায় স্বধাস্থানীয় স্বকায়ব্যূহ রাসেশ্বরীর সহিত প্রেমাকর্ষণ বা রমণ ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য নাই। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা অনন্ত, প্রত্যেক ইচ্ছার অনুকূল একটী একটী ভাবে ইচ্ছা পূর্ণ হয়, ইহাতে বুঝিতে হইবে অনন্ত-দেবের অনন্ত ইচ্ছা, অনন্তদেবীও অনন্ত ভাবে তাঁহার ইচ্ছা নিশ্চয় পূর্ণ করেন; তাই শ্রীমদ্ভাগবতে এবং তাহার বিশেষ ব্যাখ্যাস্বরূপ 'উজ্জ্বল নিলমণি' প্রভৃতি বৃন্দারণ্যবাসী নিত্যসিদ্ধ গোস্বামীদিগের গ্রন্থে শ্রীরাধিকার কায়ব্যূহরূপিণী গোপীদিগকে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ইচ্ছায় অনন্ত ভাবময়ী করিয়া বর্ণনা করা হই-

য়াছে। এই সমস্ত দুর্ব্বোধ বিষয় বুঝিতে গেলে, সৎশাস্ত্র অথবা গুরুকৃপায় বেদ এবং উপনিষদের সূক্ষ্ম অভিপ্রায় বুঝিতে হয়, কেননা, ভাগবত-গ্রন্থ বেদ এবং উপনিষদের ভাষ্য মাত্র, মূলগ্রন্থ পাঠ না করিলে ভাষ্য দ্বারা মূলগ্রন্থ বুঝা গুরু-কৃপা ব্যতীত কখনও সম্ভবে না। সমগ্র বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় শ্রীভগবৎ-তত্ত্ব, মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ সর্ব্ববেদের এই সারের সার একটি বচনে অতি স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, যথা,—

"সর্ব্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ ॥২॥"

মাণ্ডুক্যোপনিষৎ ॥

ইহার অর্থ এই যে, সমগ্র জগতে, বর্ত্তমানকালে যাহা কিছু বিরাজিত আছে, ভূতকালে যাহা কিছু ছিল, এবং ভবিষ্যৎকালে যাহা কিছু হইবে, এই সমুদয়ই "আত্মা" এবং এই আত্মাই "ব্রহ্ম", এই আত্মা চতুষ্পাৎ অর্থাৎ শ্রীভগবানের চারিটি অবস্থা।

শ্রীভগবানের চারিটী অবস্থা কি, পূর্ব্বে তাহা ওঁকার-তত্ত্বের বর্ণনা করিবার সময়, বিস্তীর্ণ ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। উহা মনোযোগ পূর্ব্বক বিচার করিয়া পাঠ করিলে অনায়াসে বুঝা যাইবে যে, একই ভগবৎ-তত্ত্ব প্রাকৃতিক সৃষ্টির সহিত কার্য্যকারণভাবে সম্বন্ধ-যুক্ত হইয়া বিভিন্ন প্রকার কার্য্যানুসারে তিনটী নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন ; আর অভিন্ন-নিমিত্ত-উপাদান-কারণ-স্বরূপ চতুর্থ বা তুরীয়াবস্থায় নামরূপের অতীত হইয়া শ্রীভগবান্ সৎরূপে বিরাজিত থাকেন। যাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী, যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে,সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে ভগবত্তত্ত্বের এই চারি প্রকার অবস্থার মধ্যে, কোনস্থানে একপ্রকার,কোন স্থানে অন্য প্রকারে বর্ণনা করিতে দেখা যায়। ইহাতে যে সমস্ত ব্যক্তির বেদ প্রকাশক ঋষিদিগের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস এবং ভক্তি নাই, এই প্রকার বিধর্ম্মীগণ অধ্যবসায়ের সহিত সমগ্র বেদ পাঠ করুন না কেন, এবং বেদ ও উপনিষদের অনুবাদ করুন না কেন, বেদোক্ত ভগবত্তত্ত্ব তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হওয়া অসম্ভব, কেননা, ভগবৎ-ভক্তের আশ্রয় ব্যতীত কখনও ভগবত্তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায় না ; এজন্য বেদপ্রকাশক ঋষি এবং ভগবৎ-ভক্তদিগের প্রতি যাঁহাদের দৃঢ় শ্রদ্ধা-ভক্তি আছে, তাঁহারা বুঝিতে চেষ্টা করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, শ্রীভগবানের রাসলীলার ইতিহাসে যে কেবল ভগবত্তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, এমত নহে, পরন্তু,

শ্রীভগবানের চরম সাধন-তত্ত্ব ইহাতে জ্ঞাত হওয়া যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে পরিষ্কার ভাষায়—স্পষ্ট কথায় ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায় স্থির করিয়াছেন, যথা—

তদ্‌যথা প্রিয়য়াস্ত্রিয় সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরং।

৬।৩ বৃঃ আঃ।

ইহার অর্থ পূর্ব্বে বিশদরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, এক্ষণে ইহার স্থূল তাৎপর্য্য বলা হইতেছে যে, যে প্রকার প্রিয়া স্ত্রী অর্থাৎ প্রণয়িনী স্ত্রীতে পুরুষ সম্প্রসক্ত হইলে অর্থাৎ সম্যক্ প্রকারে আসক্ত হইলে, তাহার বাহ্য এবং আভ্যন্তরিক কোন প্রকার জ্ঞান থাকে না, তদ্রূপ শ্রীভগবানে ভক্ত সম্যক্ প্রকারে আসক্ত হইলে তাহার কোন প্রকার বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক জ্ঞান থাকে না। শ্রীভগবান্‌কে প্রণয়িনী স্ত্রীর সহিত উপমা দিয়া বেদান্ত বা উপনিষদ পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতেছেন যে, বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া, পাপ হইতে মুক্ত হওতঃ উৎক্রান্ত হইয়া জীবদেহের পরমোৎকর্ষ লাভ করিতে পারে, যোগ-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া জীবের অন্তর্নিহিত যে সকল ঐশ্বরিক শক্তি ইন্দ্রিয় ও মনের প্রবল বাহ্য বিষয় আসক্তিতে গূঢ় থাকে বা অবিকশিত থাকে, তাহা বিকশিত হইয়া জীবের নিজ স্বরূপের জ্ঞান অর্থাৎ জীবাত্মার জ্ঞান হইতে পারে। অনুশীলন এবং জন্মান্তর গ্রহণ অনুসারে যতটুকু যে জীবাত্মার শক্তিবিকাশ হয়, সেই সসীম শক্তিকে অসীম বলিয়া মনে করিয়া, "আমি ঈশ্বর হইয়াছি," এইপ্রকার জ্ঞান হইতে পারে, আর তত্ত্বদর্শীগণ জ্ঞানের বিচারে অভ্রান্ত ভাবে ভগবত্তত্ত্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ হইতে পারেন। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, প্রণয়িনী যে প্রকার সর্ব্ব-ইন্দ্রিয়গণের বিষয় স্থানীয়া হইয়া পুরুষকে আসক্ত করে, ইন্দ্রিয়-গণের নিরোধ করিলে তাহা কখনও হয় না, ঠিক সেই প্রকার শ্রীভগবানে সম্যক্ প্রকারে আসক্ত হইতে হইলে, যোগীর ন্যায় চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিলে, বা কর্ম্মীর ন্যায় যজ্ঞকার্য্য করিলে, বা জ্ঞানীর ন্যায় মাত্র তত্ত্ববিচার করিলে কখনও ভগবৎ-প্রাপ্তি হয় না, কিন্তু সর্ব্ব-ইন্দ্রিয় দ্বারা শ্রীভগবানে সম্পরিষ্বক্ত হইতে পারিলে শ্রীভগবান্‌কে যে প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা এই রাসলীলায়

ইতিহাসে মহাকারুণিক ব্যাসদেব বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া অজ্ঞান জীবকে বুঝাইয়া গিয়াছেন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৯।১০।১১)

মদ্‌গুণ শ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোহম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তি পুরুষোত্তমে॥

মদীয় গুণশ্রবণ মাত্র সর্ব্বান্তর্য্যামী ও পুরুষোত্তম আমাতে সমুদ্রগামী জাহ্ণবী-জলের ন্যায় অবিচ্ছিন্না, অহৈতুকী (ফলানুসন্ধানশূন্যা), অব্যবহিতা (জ্ঞান কর্ম্মাদির ব্যবধানশূন্যা) মনোগতিরূপ যে ভক্তির সঞ্চার হয়, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ।

তত্রৈব (১২)—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

আমার ভক্তগণ কেবল মৎসেবা ব্যতীত, সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য বা একত্ব * প্রদান করিলেও তাহা গ্রহণ করেন না।

তত্রৈব (১৩)—

স এব ভক্তি যোগাস্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণাং মদভাবায়োযোগস্যতে॥

ইহাই আত্যন্তিক ভক্তিযোগ নামে অভিহিত। ইহা দ্বারা জীব ত্রিগুণাত্মিকা মায়া অতিক্রম পূর্ব্বক মদ্ভাব (মদীয় বিমলপ্রেম) প্রাপ্ত হন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৯।৪।৪৯)

মৎ সেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি চতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণা কুতোহন্যৎকালবিপ্লুতম্॥

---

* সালোক্য—সমান লোকে (বৈকুণ্ঠাদিতে) বাস। সার্ষ্টি—সমান ঐশ্বর্য্য। সারূপ্য—সমান রূপত্ব। সামীপ্য—সমীপে অবস্থিতি। একত্ব—সাযুজ্য।

মদীয় সেবা দ্বারাই ভক্তগণের অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ। তাঁহারা সেই সেবা-প্রভাবে স্বয়ং উপস্থিত সালোক্যাদি মুক্তি-চতুষ্টয়ই যখন কামনা করেন না, তখন যাহা কালবশে বিনষ্ট হয়, সেই স্বর্গাদির কামনা করিবেন কেন? শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ ব্যাসদেব এই চারি শ্লোকের দ্বারা উপনিষদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া, কর্ম্ম যোগ, এবং জ্ঞানাদি কার্য্যের অনুষ্ঠানের মুখ্যফল ভগবৎ-প্রাপ্তি নহে বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যাঁহারা এই সমস্ত তত্ত্বের নিগূঢ় অভিপ্রায় বুঝিতে চাহেন, তাঁহারা মহাপ্রভুর শ্রীচরণ হৃদয়ে ধ্যান করিয়া নিত্যসিদ্ধ গোস্বামীদিগের গ্রন্থ পাঠ করুন, তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, রাসলীলা "তুরীয় তত্ত্ব" বিধি নিষেধের অন্তর্ভুক্ত নহে, এই জন্য মহাপ্রভুর আদেশ অনুসারে বিরচিত শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস নামক বৈষ্ণব স্মৃতিশাস্ত্রে "রাসপূজার কোন প্রকার বিধি বা নিষেধ" এই দুইয়ের কোন উল্লেখ নাই, কেননা জীবতত্ত্ব অতি সসীম বা সান্ত, এজন্য জাগ্রত, স্বপ্ন, এবং সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার বিষয় জ্ঞাত হইতে পারে, কিন্তু তুরীয় তত্ত্বের জ্ঞান জীবতত্ত্বের সাধনার সীমার বহির্ভূত অর্থাৎ জীব ভজন-সাধন দ্বারা বা সাধন ভক্তি দ্বারা শ্রীভগবানের উক্ত প্রকার তিনটি অবস্থার জ্ঞাতা হইতে পারে, কিন্তু শ্রীভগবানের তুরীয় অবস্থার জ্ঞাতা হওয়া সম্পূর্ণ কৃপাসাধ্য, কখন সাধনসিদ্ধ নহে।*

এই কথাটা পৌরাণিক ভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, ভজনসাধন দ্বারা জীব ধ্রুবের ন্যায় ধ্রুবলোক প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু ভগবৎ-কৃপা ব্যতীত কখনও কেহ গোলকের সহচর হইতে পারে না, এইজন্য তুরীয় ভগবান্‌কে

---

* নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥৩॥

মুণ্ডকোপনিষৎ ॥

পূর্ব্বে ইহার অর্থ বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে, ইহার ভাবার্থ এই যে, সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিলে অথবা সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলে বা নানাবিধ সাম্প্রদায়িক শাস্ত্রজ্ঞান থাকিলেও ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। তবে তিনি যাঁহাদের কৃপা করিয়া আত্মদর্শনার্থে বরণ করেন, তাঁহারাই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন। তাঁহাদের নিকটই তিনি তাঁহার স্বকীয় তনু অর্থাৎ স্বীয় শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে নন্দসুত বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। যেহেতু বাসুদেব কৃষ্ণের জন্ম মৃত্যু, সুখ দুঃখ, কর্ম্ম বিপাকাদি জীবধর্ম্ম আছে, আর রাসবিহারী কৃষ্ণের কর্ম্ম নাই, অর্থাৎ অসুর-সংহারাদি কোন কার্য্য করেন না, এবং বিপাকও নাই; কেননা, তিনি চিরকিশোর, তাঁহার সুখ দুঃখের অবস্থা ভেদ নাই, কেননা, তিনি আনন্দ বা রসবিগ্রহস্বরূপ নিত্য আনন্দময়, এক কথায় তিনি আনন্দস্বরূপ—

"বৃন্দাবনং পরিত্যাজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি।"

এই প্রসঙ্গে আর একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইবে যে, আজকালকার অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি সচরাচর মনে করেন, মনুষ্য মাত্রেরই তাহার "নিজেব" জ্ঞান না হইলে, ভগবৎ জ্ঞান হয় না, আবার ইঁহাদের মধ্যে অনেকে জীবের নিজের জ্ঞানকে আত্মজ্ঞান বা আত্মার জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান বলিয়া বুঝেন। আধুনিক শিক্ষিত পণ্ডিতদিগের এই প্রকার ভ্রমবুদ্ধি জন্মিবার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে মনে হয়, বেদাচার্য্য ব্যাসদেবের বেদান্তসূত্রের ভাষ্য করিতে গিয়া শ্রীল শঙ্করাচার্য্য তাঁহার প্রণীত শারীরক ভাষ্যে ইদং এবং অহং বা অস্মদ্ এবং যুষ্মদ্ এই দুইটী শব্দের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহার ভাবার্থ এই যে, অস্মদ্ বা অহং শব্দে Ego বা আমি বুঝায়, এবং যুষ্মদ্ শব্দে Non-Ego আমি ব্যতীত বাহ্যজগৎ বুঝায়। মায়াবাদিগণ এই বিচারের সমাধান এই প্রকারে করেন যে, এই আমি-বাচক তত্ত্বই "আত্মা"। এই আত্মা জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি এই তিনটী অবস্থায় জ্ঞানরূপে বিরাজিত থাকেন বলিয়া, এই জ্ঞানকেই সৎস্বরূপ আত্মা বা পরমাত্মা বলা যায়। আর যুষ্মদ্ বা ইদম্ Non-Ego বা তুমি-বাচক এই সমস্ত বাহ্যজগৎ, অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা মায়ার প্রতীতি মাত্র বলিয়া তাঁহারা বুঝেন। এই প্রকার তত্ত্ব-বিচার দ্বারা মায়ার কুহক হইতে মুক্ত হইয়া, যাঁহারা এই সৎস্বরূপ "আত্ম-তত্ত্ব" বুঝিতে পারেন, তাঁহারাই মায়াতীত মুক্ত পুরুষ।

ব্যবহারিক জগতে এই শ্রেণীর বা এই প্রকারের মুক্ত পুরুষগণ অস্মদ্ বা অহং-তত্ত্বকে বা আপনাকে, শিব অর্থাৎ পরমাত্মা জ্ঞান করিয়া নানাপ্রকার বেশ ধারণ করতঃ "শিবোহম্," "অহং ব্রহ্মোস্মি" ইত্যাদিরূপে আপনাকে ব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া বিচরণ করিতেছেন, কেহ বা ছাই মাখিয়া সন্ন্যাসী, কেহ ভৈরবী, কেহ বা উপাধিগ্রস্থ অধ্যাপক পণ্ডিত সাজিয়া ধর্ম্মতত্ত্বের ব্যবস্থাপক হইতেছেন।

ইঁহাদের কুহকে পড়িয়া, দেশস্থ লক্ষ লক্ষ নরনারী যেপ্রকারে ভগবৎ-বিমুখী হইতেছে, তাহা বিচার করিয়া বুঝিতে পারিলে, সকলেরই হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইবে। এই শ্রেণীর অধ্যাপক পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকে হিন্দু গৃহস্থাশ্রমীদিগের ধর্ম্মের ব্যবস্থাপক। ইঁহাদের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা অনুসারে হিন্দু-সমাজের আধ্যাত্মিক জীবন পরিচালিত হয়। এক্ষণে এই শ্রেণীর অধ্যাপক পণ্ডিতদিগের জীবনী পাঠ করিলে, আমরা বুঝিতে পারি যে, ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই, বাল্যকালে যথাসময়ে বৈদিক গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, দ্বিজ-শ্রেণীভুক্ত হন, পরে বয়োধিক্য হইলে, কি জানি কোন্‌প্রকার শাস্ত্রের যুক্তি অবলম্বন করিয়া, মহামহোপাধ্যায় আদি উপাধিগ্রস্ত পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থা অনুসারে এই গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত (ব্রাহ্মণ) দ্বিজ, কোন একটি তান্ত্রিক গুরুর নিকট তান্ত্রিক মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, শাস্ত্র অনুসারে শূদ্রবর্ণে পরিণত হন, অথচ ব্যবহারিক সমাজে ইঁহাদের দ্বিজ বা ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রতিষ্ঠা থাকে। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ধর্ম্মানুরাগী হন, তাঁহাদিগকে এই তান্ত্রিক গুরুগণ শাক্তাভিষেক করাইয়া তচ্চক্র বা ভৈরবীচক্রে প্রবেশাধিকার দেন, পরে যাঁহারা পঞ্চ-মকার-সাধনে বিশেষ উপযোগী হন, তাঁহারা চক্রেশ্বর বা চক্রেশ্বরী পর্য্যন্ত পদপ্রাপ্ত হন। তখন ইঁহারা কৌল নামে অভিহিত হন। যাঁহারা চক্রের মধ্যে অবস্থিত এই প্রকার তান্ত্রিক সাধকদিগের আচারব্যবহার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, ইঁহারা সর্ব্বতোভাবে বেদাচারবিরুদ্ধ সকল প্রকার পানাহার এবং আচারব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু চক্রের বাহিরে ইঁহারা বাহ্য-ব্যবহারে বেদাচার গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা অধ্যাপক পণ্ডিত, তাঁহারাই আবার হিন্দুসমাজকে, শ্রুতি, স্মৃতি আদি বৈদিক শাস্ত্রের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন, আবার ইহার মধ্যে বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রকাশ্য সভায় বা অন্য কোন স্থানে বাক্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হইলে, ইঁহারা সাম্প্রদায়িক শিক্ষা বা দীক্ষা ভুলিয়া গিয়া, শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদের অবতারণা করিয়া, জগৎ মিথ্যা, অস্মদ্‌ শব্দবাচক অহং বা আমিই ব্রহ্ম বলিয়া সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। এইপ্রকার কপটাচারীগণ, যে সমাজের নেতা, সে সমাজ সংস্কার করা কতদূর দুরূহ কার্য্য! তাই নব্য শিক্ষিত যুবকদিগকে, বিশেষ করিয়া অনুরোধ করি যে, অস্মদ্‌ এবং যুষ্মদ্‌ শব্দবোধক তত্ত্বদ্বয়ের সম্বন্ধ ভাল করিয়া বিচার করিয়া বুঝুন। অস্মদের সহিত যুষ্মদের বৈজ্ঞানিক কিম্বা

দার্শনিক সম্বন্ধ বুঝিতে গেলে বুঝা যায় যে, ইহাদের মধ্যে সাপেক্ষ সম্বন্ধ আছে অর্থাৎ একের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে অপরের জ্ঞানের বিকাশ হয়; সুতরাং একের অভাবে অপরের জ্ঞান অসম্ভব অর্থাৎ কখনও হইতে পারে না। এই কথাটা বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, অস্মদ্ এবং যুষ্মদ্ এক অপরের প্রকাশক। এই সমস্ত বিচারে বুঝিতে হইবে, অস্মদ্ বা অহং যখন ইদং বা যুষ্মদ্ প্রকাশ করে বা সাপেক্ষ সম্বন্ধযুক্ত হয়, তখন অহংকে স্বপ্রকাশ বা স্বতন্ত্র বলা যায় না। যে তত্ত্ব স্বপ্রকাশ বা স্বতন্ত্র বা স্বয়ম্ভু নহে, তাহাকে আত্মা বা পরমেশ্বর বলিয়া অভিহিত করা বেদবিরুদ্ধ. কেননা বেদ এবং উপনিষদের সর্ব্বত্র শ্রীভগবান্‌কে স্বপ্রকাশ, স্বয়ম্ভু, সনাতন ইত্যাদি স্বতন্ত্রপদবাচ্যে অভিহিত করিতে দেখা যায়, যথা—

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধম্ পাপবিদ্ধম্। কবির্ম্মণীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভু র্যাথাতথ্যতোর্থান ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥

যজুর্ব্বেদ, অঃ ৪০, মং ৮॥

তিনি (অর্থাৎ পরমাত্মা) সর্ব্বব্যাপী, জ্যোতির্ম্ময়, অশরীর, শিরা ও ব্রণ-রহিত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ। তিনি সর্ব্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা, সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বয়ম্ভুঃ, তিনি সর্ব্বকালে (প্রজাদিগের ভোগের জন্য) যথোপযুক্ত বস্তুসকল বিধান করিতেছেন॥

এক্ষণে আর এক পূর্ব্বপক্ষ অর্থাৎ আর এক প্রশ্ন উত্থাপন হইতেছে যে, "অহং জ্ঞানের বিষয় যদি আত্মা বা পরমেশ্বর বলিয়া প্রতিপন্ন না হইল, তবে অহং জ্ঞান, জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্ত এই তিন অবস্থায় সৎস্বরূপ বিদ্যমান থাকে কেন? অহং জ্ঞানের বিষয়ই বা কি এবং ইদম্ জ্ঞানের বিষয়ই বা কি? এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে বুঝিতে হইবে যে, অহং জ্ঞানের বিষয় "জীব" বা জীবাত্মা। বেদ অনুসারে জীব নিত্য অর্থাৎ সৎস্বরূপ, সুতরাং জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্ত অবস্থায়, অহং জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে। আর ইদম্ জ্ঞানের বিষয় বাহ্যজগৎ। গম ধাতু হইতে জগৎ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, গম্ ধাতুর অর্থ গমনশীল বা পরিবর্ত্তনশীল। সমষ্টি জগতের অপর নাম প্রকৃতি বা মায়া; বেদ অনুসারে এই পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতিও নিত্যবস্তু অর্থাৎ মিথ্যা নহে। যথা—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥

ঋঃ মঃ ১। সূঃ ১৬৪। মঃ ২০॥

ব্রহ্ম এবং জীব এই উভয় চেতনতা এবং পালনাদি গুণবশতঃ, সদৃশ, ব্যাপ্য-ব্যাপক ভাব হইতে সংযুক্ত এবং পরস্পর মিত্রতাযুক্ত হইয়া যেরূপ সনাতন ও অনাদি, এবং তদ্রূপ অনাদি মূলরূপ কারণ এবং শাখারূপ কার্য্যযুক্ত বৃক্ষ অর্থাৎ যাহা স্থূল হইয়া প্রলয়কালে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, উহাও তৃতীয় অনাদি পদার্থ। এই তিনের গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাবও অনাদি। জীব ও ব্রহ্ম এই উভয়ের মধ্যে জীব এই বৃক্ষরূপ সংসারে পাপপুণ্যরূপ ফল উত্তমরূপে ভোগ করে এবং দ্বিতীয় পরমাত্মা কর্ম্মফল ভোগ না করিয়া চারিদিকে অর্থাৎ ভিতরে বাহিরে এবং সর্ব্বত্র প্রকাশমান হইয়া থাকেন। জীব হইতে ঈশ্বর, ঈশ্বর হইতে জীব এবং উভয় হইতে প্রকৃতি ভিন্নস্বরূপ এবং এই তিনই অনাদি।

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাম্॥

অজোহ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ, অঃ ৪॥মঃ৫॥

"প্রকৃতি, জীব এবং পরমাত্মা এই তিনই অজ অর্থাৎ ইহাদিগের কথনও জন্ম হয় না, এবং ইহারা কথনও জন্মগ্রহণ করে না। অর্থাৎ এই তিনই সমস্ত জগতের কারণ। অনাদি জীব এই অনাদি প্রকৃতির ভোগ করতঃ আসক্ত হয়, কিন্তু উক্ত পরমাত্মা ইহার ভোগও করেন না।" মহাপ্রভুও সার্ব্বভৌমকে বুঝাইবার ছলে জগৎকে বুঝাইয়াছেন।

"জগৎ যে মিথ্যা নয় নশ্বরমাত্র কহে॥

চৈতন্য-চরিতামৃত।

ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, অহংজ্ঞানের বিষয় নিত্যজীব, ইদং জ্ঞানের বিষয় নিত্য প্রকৃতির সহিত সাপেক্ষসম্বন্ধযুক্ত হইয়া বা প্রকাশ্য প্রকাশকভাবে, জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্ত অবস্থায় এক অপরকে প্রকাশ করিয়া থাকে। এই কথাটা অন্য কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, জীবের জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্ত, এই তিন অবস্থার কোন অবস্থায় ভগবৎ-কৃপা ব্যতীত প্রকৃতি বা মায়া হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই। যাহা হউক, এই সমস্ত বিচারে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, অহং জ্ঞানকে আত্মা অর্থাৎ পরমেশ্বর বলিয়া বুঝা নিতান্ত ভ্রম, প্রকৃত ভগবংতত্ত্বজ্ঞান বা চিৎস্বরূপ আত্মার জ্ঞান ইহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি বাঙ্মনাতীত, মায়াগন্ধবিবর্জ্জিত, "তুরীয় তত্ত্ব" চিন্ময় ব্রজ-গোপীদিগের ন্যায় সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা সম্পরিষক্ত অর্থাৎ সম্যক্ প্রকারে আসক্ত হইয়া দেহদেহী সম্বন্ধচ্যুত অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে অহং জ্ঞানের বিলোপ না হইলে, কাহারও কখন "তুরীয় তত্ত্বের" বা শ্রীভগবানের জ্ঞান হয় না।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্ ॥

অবতার-বাদ।

অবতার-বাদ লইয়া আজ কাল নব্যসম্প্রদায়, বৈষ্ণবদিগকে বড় নিন্দা করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের ভক্তিশাস্ত্রানুসারে এই অবতার-বাদ ভাল করিয়া বুঝিলে, মনে হয়, বৈষ্ণবদিগকে এ সম্বন্ধে কেহ নিন্দা করিতে পারিবেন না। নিরীশ্বরবাদীদিগকে কিম্বা শান্তরসের ভগবৎ-ভক্তদিগকে অবতারবাদ, যুক্তি-তর্ক দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করা বিফল চেষ্টা; কারণ শ্রীভগবানের অবতার বিষয় জ্ঞাত হওয়া ভগবৎ-কৃপা-সাপেক্ষ, ইহা সাধন-তত্ত্বের বিষয়; তবে নিরপেক্ষ বিচার-শক্তিসম্পন্ন লোকেরা, অবতারের জীবনী পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, যে যে কালে যে যে স্থানে অবতার হইয়াছেন, তখন এবং তথায় অবতারগণ যাঁহাদের নিকট নিজে প্রকাশ হইয়াছেন, তাঁহারাই মাত্র তাঁহাকে অবতার বলিয়া বুঝিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্থলে দেখা যায় যে, কৃষ্ণ অবতারে, বসুদেব,

দেবকী, বিদুর, ভীষ্ম, পাণ্ডবগণ এবং মুনিঋষিরা ইত্যাদি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু লোকসাধারণ শ্রীকৃষ্ণকে তখন অবতার বলিয়া স্বীকার করেন নাই ; যীশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধাদি অবতারগণের জীবিত কালে, লোকসাধারণমধ্যে অনেকেই তাঁহাদিগকে অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের নদীয়ায় অবতার লইয়া বিচার করিতে গেলেও দেখা যায় যে, যে সময়ে নদীয়ায় শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার হন, তখনকার নদীয়ায়, আজ-কালকার কলিকাতার ন্যায় প্রধান প্রধান বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ধনবান এবং শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর বাস ছিল, কেবল তাহাই নহে, কলিকাতার ন্যায় তথায় রাজপ্রতিনিধি এবং দেশস্থ প্রধান প্রধান জমিদার, চোর-ডাকাইতদিগেরও বাস ছিল। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, গৌরাঙ্গকে, নদীয়ার রাজপ্রতিনিধি (কাজি), প্রায় সমগ্র পণ্ডিতগণ, ডাকাইতগণ (জগাই মাধাই), এবং ধার্ম্মিকগণ, এক কথায় প্রায় সকলেই তাঁহাকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। সেই সময়ে প্রধান রাজমন্ত্রী সর্ব্বধর্ম্মশাস্ত্র এবং রাজনীতি-বিশারদ রূপ-সনাতনও গৌরাঙ্গদেবকে অবতার জ্ঞান করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া ভিখারীর বেশে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের শ্রীচরণে তাঁহাদের জীবন সর্ব্বতোভাবে (Devotion) সমর্পণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে বঙ্গের সর্ব্ব-উজ্জ্বলরত্নস্বরূপ ন্যায়শাস্ত্রের অদ্বিতীয় পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম—যিনি মিথিলা দেশ হইতে ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া নবদ্বীপকে ন্যায়শাস্ত্রাধ্যয়নের সর্ব্বপ্রধান স্থান বলিয়া পরিগণিত করিয়াছিলেন, সেই অদ্বিতীয় পণ্ডিত, গৌরাঙ্গদেবকে অবতার বলিয়া তাঁহার শ্রীচরণে চিরদাসত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন।

যে বেদান্ত শাস্ত্রের শ্রীল শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্য পাঠ করিয়া আজকালকার ব্রাহ্মণগণ, বেদান্তবিদ্ মনে করিয়া অভিমান করেন, সেই বেদান্ত শাস্ত্রের সেই সময়ে ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত এবং সমস্ত মায়াবাদী সন্ন্যাসী-দিগের শিক্ষাগুরু শ্রীল প্রকাশানন্দ সরস্বতী, শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে অবতার জ্ঞান করিয়া, ব্রজগোপীদিগের ন্যায়, "সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" এই নীতির অনুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার যোগধর্ম্ম, জ্ঞানমার্গ, নির্ব্বিশেষ-বাদ, মায়াবাদ ইত্যাদি সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে শাস্ত্রযুক্তি এবং জ্ঞানের বিচারে পূর্ণ ভগবান্ বলিয়া বুঝিয়া চরম বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে

আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, এই মহাত্মাকৃত "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত" নামক গ্রন্থ পাঠ করিলে তাঁহার বিষয় জ্ঞাত হইতে পারা যায়।

এই প্রকার লক্ষ লক্ষ হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধসম্প্রদায়ের লোকেরা গৌরাঙ্গদেবকে অবতার বলিয়া বুঝিয়াছিল। আবার কোটী কোটী লোক তাঁহার কোন সংবাদ রাখেন নাই। আবার যাঁহারা তাঁহার সংবাদ রাখিতেন, তাঁহাদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক গৌরাঙ্গদেবকে অবতার বলিয়া স্বীকার করেন নাই। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, কাহাকেও অবতার বিশ্বাস করান যুক্তিতর্কের দ্বারা কখনও হয় না, ভক্তির আধিক্য হইলেই অবতারবাদ আসিয়া পড়ে। কেন না, ভক্তি, যুক্তি-বিরোধী; এই ভক্তির পরিপাক দশায় প্রেম-আখ্যা প্রাপ্ত হয়। তাই বলি, এই ভক্তি বা প্রেম, কাহার কখনও নিজের চেষ্টা বা সাধনা দ্বারা হয় না, পরন্তু ইহা সর্ব্বসময়ে ভগবৎকৃপাসাধ্য। তাই ভক্তি শাস্ত্রে লিখিত আছে:—

"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম কভু সাধ্য নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥"

——:০:——

অবতারের কারণ।

——:(০):——

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের কারণ কি?

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানম্ সৃজাম্যহম্॥

ইহার ভাবার্থ এই যে, যে সময় ধর্ম্মের গ্লানি হয় অর্থাৎ যে যে সময় বেদপ্রতিপাদ্য ধর্ম্মের গ্লানি হয়, দুর্জ্জনের প্রশ্রয় হয়, ধার্ম্মিক ব্যক্তির প্রতি অত্যাচার হয়, তখনই শ্রীভগবান্ ইহা নিবারণের জন্য কখন মহাপুরুষরূপে, কখন অবতার রূপে আবির্ভূত হইয়া ইহার প্রতিকার করেন, শাস্ত্রের এইপ্রকার অভিপ্রায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, ইহাকে Evolution of Religion বা অবতার-বাদ বলে। এক্ষণে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের Evolution

বা অবতার প্রাপ্ত হইবার Surrounding বা আবশ্যকতা কি? ইহা ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে ইতিহাসের সাহায্যের আবশ্যক। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ অখণ্ড যুক্তি দ্বারা বিশেষভাবে বিচার করিয়া বুঝিয়াছেন যে, পূর্ব্ব-ভারতবর্ষে বহুকাল হইতে বেদাচারী আর্য্যজাতির বাসভূমি ছিল না, মহাভারত এবং অন্যান্য প্রামাণিক ইতিহাসাদি মিলন করিয়া এই পণ্ডিতগণ বুঝিয়াছেন যে, দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণ-অবতারের পূর্ব্ব হইতে পূর্ব্ব-ভারতে এই প্রকার অনার্য্য জাতির নিবাস ছিল। আবার জৈন এবং বৌদ্ধদিগের ধর্ম্ম-পুস্তক অনুসারে এই পণ্ডিতেরা বুঝিয়াছেন যে, বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বকাল হইতে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থান, প্রথমে জৈনধর্ম্ম পরে বৌদ্ধধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লীলাভূমি ছিল। আবার তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের প্রাচীনতা অনুসন্ধান করিতে গেলে বুঝা যায় যে,বৌদ্ধ-ও জৈনধর্ম্মের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বকাল হইতে তান্ত্রিকদিগের প্রভাব ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বর্ত্তমান ছিল। পরে আর্য্যজাতির রাজ্য-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বৈদিক ধর্ম্মের প্রাধান্য যে যে প্রদেশের লোকেরা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিল, সেই সেই দেশ হইতে রাজশাসনে তান্ত্রিকধর্ম্মের বিলুপ্তি হইয়াছিল,কিন্তু মহাভারতের যুদ্ধের পর হইতে বৈদিক রাজশাসনের অভাবে জৈন এবং বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বিমিশ্রভাবে তান্ত্রিকধর্ম্ম সর্ব্বদেশে প্রচলিত হয়। বিশেষতঃ পূর্ব্ব-ভারতবর্ষে আর্য্যজাতির মৌলিক বৈদিক ধর্ম্ম কখনও পূর্ণভাবে প্রচার হইয়াছিল বলিয়া কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। তাহার উপর শ্রীল শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয় হইবার পরে, যখন সর্ব্বদেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়াছিল, সেই সময়ের অনেক পরে ক্রমে ক্রমে বঙ্গ বিহারাদি পূর্ব্বভারত হইতেও বৌদ্ধ-ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদের সহিত তান্ত্রিকধর্ম্ম এবং বৌদ্ধাচারের একত্র সম্মিলনে একপ্রকার অভিনব ধর্ম্ম এই পূর্ব্বভারতে এরূপ-ভাবে প্রচারিত হয় এবং দেশস্থ লোকের হৃদয়ে উহা এ প্রকার বদ্ধমূলসংস্কার হয় যে, এক্ষণে বিংশ শতাব্দীর সুশিক্ষিত অধ্যাপক পণ্ডিতাদি শাস্ত্রজ্ঞ এবং আজ-কালকার পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী সাহিত্যসেবী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ পর্য্যন্ত সেই কুসংস্কারে পড়িয়া, প্রথমতঃ তাঁহারা বেদ-বিহিত উপনয়ন সংস্কার বা বৈদিক দীক্ষা-মন্ত্র (গায়ত্রী) গ্রহণ করিয়া দ্বিজশ্রেণীভুক্ত হন। আবার মহামহোপাধ্যায় আদি উপাধিগ্রস্ত পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা অনুসারে, এই বেদবিহিত দীক্ষিত দ্বিজকে

পুনরায় তান্ত্রিক গায়ত্রী-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া, শাস্ত্রানুসারে শূদ্রবর্ণে পতিত করিতেছেন,অথচ.পূর্ব্বভারতের এই প্রকারের পতিত দ্বিজগণের এবং শূদ্রাদি সর্ব্ব-বর্ণের বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি সর্ব্বপ্রকার বেদবিহিত কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান এই প্রকার পতিত ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের অদ্ভুত ব্যবস্থা অনুসারে চলিতেছে। আবার আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই প্রকার পাণ্ডিত্যাভিমানীরা এবং তাঁহাদের ব্যবস্থার অনুবর্ত্তী ব্রাহ্মণ, কায়স্থাদি সর্ব্ববর্ণের ব্যক্তিরা তান্ত্রিকমন্ত্র গ্রহণ করিয়া সাধনার উৎকর্ষতা লাভ করিতে পারিলে, তাঁহারা তান্ত্রিক শাস্ত্রানুসারে প্রথমতঃ শাক্তাভি-ষেক পরে পূর্ণাভিষেক ইত্যাদিতে ক্রমে ক্রমে অভিষিক্ত হয়েন। এই প্রকার অভিষিক্ত স্ত্রী-পুরুষগণ, তচ্চক্র, ভৈরবীচক্রাদির অনুষ্ঠান করিয়া বিশেষ বিশেষ সাধন অঙ্গে প্রবেশ করিয়া বেদাচার ভুলিয়া গিয়া, বৌদ্ধাচার গ্রহণ করিয়া এই সমস্ত সাধনায় প্রবৃত্ত হন। এই চক্রের মধ্যে পঞ্চ-মকারের উপাসনা হয়। স্মৃতি বা বেদে মদ্য, মাংস, মৎস্য, পরস্ত্রীগমন একেবারে নিষেধ, তবে রাজসিক ও তামসিক বৃত্তির লোকের পক্ষে বিশেষ বিশেষ জন্তুর মাংস এবং বিশেষ বিশেষ মৎস্যভোজনের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু তান্ত্রিকদিগের ভৈরবীচক্রের মধ্যে আনীত সর্ব্বপ্রকার মাংস, মৎস্য, মদ্য, মুদ্রা (মদের চাট্) আহার করা এবং স্বকীয়া বা পরকীয়া সধবা কি বিধবাদি, উচ্চবর্ণের বা হীনবর্ণের পরস্ত্রীগমন ইত্যাদি পঞ্চ-মকারের সেবা করা, প্রশস্ত বলিয়া গ্রহণ করেন। ইহাতেও বঙ্গদেশবাসী হিন্দুসম্প্র-দায়ের বেদাচার-বিরোধী হওয়া হয় না; আশ্চর্য্যের বিষয়,দেশস্থ পণ্ডিতেরাও ইহা অনুমোদন করেন। এক্ষণে ভারতের নব্য যুবকগণ, তোমরা ভাল করিয়া বুঝ যে, আমাদের দেশের এই তান্ত্রিক শ্রেণীর কপটাচারী শাস্ত্রব্যবসায়ীগণ কি প্রকার হিন্দুসমাজের সর্ব্বনাশ করিতেছেন। ইহাদের কুহকে পড়িয়া দেশস্থ লোকেরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ বেদাচার-বিরোধী এবং সুসভ্য সমাজ-বিরোধী, মদ্যমাংস আহার ও বেশ্যাবৃত্তির প্রশ্রয় দিতেছেন। এই শ্রেণীর কপট মূর্ত্তিধারী অধিকাংশ সাহিত্য-সেবীগণ, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস আদি কবিগণের দোহাই দিয়া অসংখ্য নাটক নভেল লিখিয়া এবং থিয়েটারে বাজারের বেশ্যাদিগের সাহায্যে তাহার অভিনয় করিয়া, স্ত্রীপুরুষের কামবৃত্তিকে ভগবৎ-প্রেম বলিয়া বুঝাইয়া, দেশের অন্তঃসার শূন্য করিয়া ফেলিয়াছেন এবং ফেলিতেছেন। এক্ষণে বিচার্য্য, আজকালের সময়ে এই কলিকাতা সহরে যখন শিক্ষিত লোকদিগের এই প্রকার কুস্বভাব

হইল, তখন ইহার সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সময় বঙ্গদেশের অবস্থা কি প্রকার ছিল, তাহা একবার স্মরণ করুন। তখন এই শ্রেণীর তান্ত্রিকগণ সমাজে কি প্রকার বীভৎস আচারেরই অভিনয় করিত! ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, মহারাজা আদিশূর প্রথমতঃ কাণ্যকুব্জ হইতে পাঁচনী বৈদিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ডের অনুষ্ঠান করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। মহারাজা বল্লাল সেন যদিও তান্ত্রিক বা কৌলদিগের মধ্য হইতে নির্ব্বাচন করিয়া কৌলিন্য প্রথার প্রচলন করেন বটে, কিন্তু এই প্রকার ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ কুলীনদিগের বংশপরম্পরা লইয়া বিচার করিতে গেলে বুঝা যায় যে, ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বঙ্গদেশবাসী নহেন, ইঁহারা কাণ্যকুব্জ দেশবাসী বৈদিকাচারী ছিলেন। আদিশূরের যজ্ঞ উপলক্ষে তাঁহারা বঙ্গদেশে আসিয়া রাজা কর্ত্তৃক প্রদত্ত জমিদারী পাইয়া এদেশে বাস করিতে করিতে, তন্ত্রের কুহকে পড়িয়া বেদাচারের সহিত তন্ত্রাচারের বিমিশ্রিত এক অভিনব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন, ইহাদিগকে সাধারণতঃ হিন্দু-তান্ত্রিক বলে। ইহার ভাবার্থ এই যে, বৌদ্ধাচারের সহিত তন্ত্রাচার-বিমিশ্রণে যে সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাদিগকে বৌদ্ধ-তান্ত্রিক বলে; দার্জ্জিলিংএর নিকটবর্ত্তী নেপাল, ভূটান এবং তিব্বত দেশে কালী, তারাদি তান্ত্রিক মহাবিদ্যার মন্ত্রে দীক্ষিত অনেক বৌদ্ধাচারী লোক আছে; আর আজকালকার ন্যায়বাগীশ, বিদ্যাবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় ইত্যাদি উপাধিগ্রস্ত পাণ্ডিত্যাভিমানীদিগের মধ্যে যাঁহারা বৈদিক দীক্ষার পর তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ করেন বা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বেদাচারী তান্ত্রিক বা হিন্দু-তান্ত্রিক বলে। ইতিহাসের সাহায্যে বুঝা যায় যে, মহারাজা বল্লাল সেন, প্রথমতঃ বৌদ্ধ তান্ত্রিক ছিলেন, পরে এই শ্রেণীর হিন্দু-তান্ত্রিক হইয়াছিলেন এবং তিনি এই হিন্দু-তান্ত্রিকদিগের উন্নতিকল্পে ব্রাহ্মণদিগকে যজ্ঞোপবীত পরিধান করিবার প্রথা প্রচলন করেন, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে কৃতকার্য্য হইতে না হইতেই তিনি পরলোকগত হন। তাঁহার আজ্ঞানুসারে তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেন আইন প্রচার করেন যে, "যে ব্যক্তি যজন, যাজন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে, তাহাদিগকে উপবীত গ্রহণ করিতে হইবেই হইবে।" এই আইনের বলে এদেশের ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন, ক্রমে ক্রমে সমস্ত ব্রাহ্মণগণ গায়ত্রী-মন্ত্র গ্রহণের সময় যে উপবীত গ্রহণ করিতেন, তাহা

আজীবন রক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, লক্ষ্মণ সেনের অকালে রাজ্যচ্যুতি হওয়ায় বৈদিক ধর্ম্মের প্রচার বঙ্গদেশে আর অধিক দিন হইতে পায় নাই। মহম্মদ ঘোরীর রাজত্ব সময় ১২০৩ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ৭০৮ বৎসর হইতে চলিল, বঙ্গের শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেন রাজ্যচ্যুত হইয়াছেন, ইহার ২৮৩ বৎসর পরে বঙ্গে স্মৃতিশাস্ত্র-প্রচারক রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আবির্ভাব হয়। এই রঘুনন্দন গৌরাঙ্গদেবের সমপাঠী ছিলেন। রঘুনন্দন, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ৪২৫ বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এক্ষণে যাঁহার কিছুমাত্র বিচারশক্তি আছে, তিনি একবার চিন্তা করিয়া বুঝুন যে,রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যচ্যুতির এবং গৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের সময় পর্য্যন্ত এই ২৮৩ বৎসর বঙ্গদেশে কি প্রকার ধর্ম্মবিপ্লব ঘটিয়াছিল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভারতের কি প্রকার ধর্ম্মবিপ্লব ঘটিয়াছিল, তাহাও চিন্তা করা কর্ত্তব্য। মহাভারত যুদ্ধের পর হইতেই ভারতের বৈদিক ধর্ম্মের অধোগতি হইতে আরম্ভ করে; ইহাতে পণ্ডিতদিগেরও মতভেদ নাই, কেন না, প্রজা এবং ধর্ম্মরক্ষক প্রধান রাজন্যবর্গ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে নিহত হন, আধুনিক পণ্ডিতদিগের মতে এই যুদ্ধ প্রায় ৫০০০ পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল, সুতরাং গীতাও পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতে প্রচার হইয়াছিল। পরে ধর্ম্ম-রক্ষক অভাবে বেদধর্ম্ম-বিরোধীদিগের ক্রমশঃ প্রাদুর্ভাব হইয়া, প্রায় ২৫০০।৩০০০ হাজার বৎসর মধ্যে বেদ-বিরোধী পৌত্তলিক ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক জৈনসম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়। ইহারাই ভারতের বৈদিক ধর্ম্মকে একেবারে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মহাভারত যুদ্ধের পর হইতে অজ্ঞান-তমস দ্বারা সমগ্র ভারত আচ্ছন্ন হয়, কাজে কাজেই বেদের জ্ঞানকাণ্ডের আলোচনা হ্রাস হইবার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বত্রই, মাত্র কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানের ফলে, আমাদের জীবহিংসা-প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে, এই সময় ইহার নিবৃত্তির জন্য জৈনধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়। জৈনগণ বৈদিক ধর্ম্মের জ্ঞানকাণ্ডের দার্শনিক অংশের ভিতর প্রবেশ করিতে না পারিয়া, ক্রিয়াকাণ্ডকে বৈদিক ধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া বেদমূলক সকল প্রকার ধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ করিতে চেষ্টা করেন, এই সময় দেশে বেদজ্ঞানী এবং কর্ম্মকাণ্ডের যে সকল অল্প সংখ্যক পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারা দেখিলেন যে, দেশের মূর্খতার দোষে লোকে বেদের জ্ঞানকাণ্ড কোন

ক্রমে বুঝিতে পারিতেছে না. কর্ম্মকাণ্ডেরও মূল উদ্দেশ্য বুঝে না, এজন্য দেশস্থ লোক জৈন, বৌদ্ধাদি বেদ-বিরোধী ধর্ম্মাবলম্বী হইতে আরম্ভ করিল। তখন তাঁহারা আপন আপন বিদ্যাবুদ্ধি অনুসারে বৈদিকধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য পুরাণের অদ্ভুত গল্পচ্ছলে বৈদিক ধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ করেন। আধুনিক পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, প্রায় তিন হাজার বৎসর অর্থাৎ জৈন ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সমসময়ে সর্ব্বপ্রথম বিষ্ণুপুরাণের সৃষ্টি হয়। জৈন এবং বুদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণ নিতান্ত পৌত্তলিক ছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের গ্রন্থে ইন্দ্রাদি দেবগণের অনেক প্রকার অদ্ভুত গল্পের অবতারণা করেন। পৌরাণিকগণ বেদোক্ত দেবতাদিগকে এক এক অদ্ভুত গল্পের ভিতর অবতারণা করিয়া এক এক পুরাণ লিখিতে আরম্ভ করেন। এই প্রকারে বহুসংখ্যক পুরাণের সৃষ্টি হইলেও কালের প্রতিকূল গতি কিছুতেই রোধ হইল না। জৈন ধর্ম্মের পরে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে প্রায় সমগ্র ভারত বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইল। মহারাজা অশোকের রাজ্য-বিস্তার এবং ধর্ম্ম-প্রচারের ইতিহাস পাঠ করিলে, ইহার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। যাহা হউক, প্রায় ২২০০ বৎসর হইতে চলিল, উজ্জয়িনী নগরে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী মহারাজা সুধন্বা নৃপতির রাজসভায় শ্রীল শঙ্করাচার্য্য জৈন পণ্ডিতদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া, তাঁহার মায়াবাদ স্থাপন করেন। মহারাজ সুধন্বা, শ্রীল শঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত মায়াবাদী বৈদিক ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। শ্রীল শঙ্করাচার্য্য ক্রমে ভারতের তদানীন্তন রাজাদিগের সাহায্যে, সমগ্র ভারত হইতে, বৌদ্ধধর্ম্মের মূল উচ্ছেদ করিয়াছিলেন। এক্ষণে বিচারক্ষম ব্যক্তি মাত্রেই সমদর্শীভাবে, মায়াবাদের সহিত বৌদ্ধদিগের চারি প্রকার বাদের বিচার করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, উভয় ধর্ম্মই বেদ-বিরোধী, এবং মায়াবাদের সহিত বৌদ্ধমতের বিশেষ সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। বৌদ্ধ শব্দের অর্থ "বুদ্ধ্যা নিবর্ত্ততে যঃ স বৌদ্ধ" যিনি বুদ্ধি অনুসারে সিদ্ধ অর্থাৎ যে বিষয় আপন বুদ্ধি অনুসারে বুঝিতে পারে, তাহাই মানিবে, আর যাহা বুদ্ধিতে আসিবে না, তাহা মানিবে না। এই বৌদ্ধদিগের মধ্যে অনেক সম্প্রদায় আছে, তাহার মধ্যে এই কয়েক সম্প্রদায় প্রধান, যথা,—মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক এবং বৈভাষিক, ইহাদের মধ্যে কেহ ঈশ্বরের কর্তৃত্ব স্বীকার করে না; প্রকৃতি এবং জীবাত্মাকে নিত্য স্বীকার করে।

মাধ্যমিক,—ইহাদিগকে সর্ব্বশূন্যবাদী বা ক্ষণিকবাদী বলে, ইহাদের মতে এই জগৎ বা জাগতিক কোন বস্তু পূর্ব্বে ছিল না, এবং পরেও থাকে নাই, অর্থাৎ শূন্য হইতে আসিয়াছে এবং শূন্যে বিলীন হইয়া যায়; ক্ষণিকের জন্য আমাদের বস্তুজ্ঞান হয় মাত্র। ইহার ভাবার্থ এই যে, সম্মুখে দোয়াত, কলম, কাগজ দেখিতেছি, কিন্তু ইহাদের মতে যখন কাগজ দেখি, তখন কাগজের অস্তিত্ব থাকে, কিন্তু কলম দেখিবার সময় কাগজের অস্তিত্ব থাকে না। এই প্রকার দোয়াত দেখিবার সময় দোয়াতের অস্তিত্ব থাকে, কিন্তু কাগজ কলমের অস্তিত্ব থাকে না, সুতরাং তাহাদের মতে বস্তুর জ্ঞান ক্ষণিক মাত্র। এই প্রকার সর্ব্বশূন্যবাদী বা ক্ষণিকবাদী, কল্পনাপ্রিয়-সম্প্রদায়গণের এববিধ সামান্য জ্ঞান নাই যে, জগৎ যদি সর্ব্বশূন্য হইল এবং জাগতিক সমস্ত পদার্থ যদি ক্ষণিক জ্ঞানের বিষয় হয়, তবে জ্ঞেয় বস্তু এবং জ্ঞাতা অর্থাৎ বস্তুজ্ঞানের কর্ত্তা কি করিয়া সম্ভবে? অথবা জ্ঞাতার পূর্ব্ববস্তুর জ্ঞানের স্মৃতি কোথা হইতে আসিবে?

দ্বিতীয় সম্প্রদায় যোগাচার,—ইহারা বলে যে, জাগতিক সমস্ত বস্তু আমাদের অন্তরে আছে, বস্তুর বাহ্য বিকাশ নাই, তবে যে আমরা এইটী ঘট, এইটী পট, এই প্রকার বস্তু জ্ঞান করিতেছি, ইহা বস্তুর বাহ্য বিকাশ নহে, এই সমস্ত বস্তু আমাদের অন্তরে আছে বলিয়া আমরা বুঝিতেছি যে, এইটী ঘট এইটী পট। এই প্রকার কল্পনাপ্রিয় সম্প্রদায়কে বিচারে পরাস্ত করিতে বিশেষ বিচারের আবশ্যক হয় না, সকলেই বুঝিতে পারেন যে, পাহাড়, পর্ব্বতাদি বৃহৎ অথবা অতি ক্ষুদ্র বস্তু কখনও আমাদের অন্তরে অবস্থান করিতে পারে না, তবে কোনও বস্তু আমাদের প্রত্যক্ষ হইলে তাহার বিজ্ঞান আমাদের অন্তরে সংস্কাররূপে অবস্থিতি করে, ইহাই যুক্তি এবং বিজ্ঞানসম্মত; ইহা হইতে আমাদের স্মৃতিজ্ঞান হয়।

তৃতীয় সম্প্রদায় সৌত্রান্তিক,—এই সম্প্রদায়, বাহ্য-পদার্থের প্রত্যক্ষ হয়, ইহা স্বীকার করে না, ইহারা বলে যে, পদার্থের একদেশ মাত্র আমরা প্রত্যক্ষ করি, কিন্তু অপরাংশ প্রত্যক্ষ হয় না, অনুমান দ্বারা আমরা বুঝি। এই সম্প্রদায় এক অদ্ভুত কল্পনাপ্রিয়। ইহারা বুঝে না যে, পদার্থসকলের অনুমান করে কে? ইহারা বুঝিতে পারে না যে,এই বিচারের অনুমান-কর্ত্তা অনুমেয় হইয়া যায়।

চতুর্থ বৈভাষিক,—ইহাদের মতে বাহ্য-পদার্থের বাহ্য জ্ঞান হয় মাত্র, কিন্তু বাহ্য-পদার্থের কোন জ্ঞান আমাদের অভ্যন্তরে হয় না, এই প্রকার বিচার একেবারে যুক্তি এবং বিজ্ঞানবিরুদ্ধ, কেননা, দর্শন এবং বিজ্ঞান বিশেষ বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা জগৎকে বুঝাইয়াছেন যে, বাহ্য পদার্থসকলের ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষে আমাদের অন্তঃকরণে যখন বস্তুব বিজ্ঞান হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে ; এজন্যই পদার্থের জ্ঞানের স্মৃতি আমাদের রহিয়া যায়। বৌদ্ধদিগের এই প্রকার অনেক দার্শনিক বিচার আছে, ইহার সমস্তই নিদ্রিত ব্যক্তির স্বপ্নদর্শনবৎ সমস্তই যুক্তি-বিরোধী। এই সকল দর্শনানুমোদিত ইহাদের শাস্ত্রে যে সমস্ত পুরাণ আছে, তাহা অতি অদ্ভুত গল্পে পরিপূর্ণ। আরব্য উপন্যাস কিম্বা হিন্দুদিগের অনেক প্রকার পুরাণের গল্প, বৌদ্ধদিগের পুরাণের গল্পের তুলনায়, অতিশয় অদ্ভুত বলিয়া মনে হইবে না। এই সমস্ত বিষয় যিনি ভাল করিয়া বুঝিতে চাহেন, তিনি ইহাদের "রত্নসারভাগ" নামক পুস্তক পাঠ করুন, ইহাতে ঋষভদেব হইতে মহাবীর পর্য্যন্ত চতুর্ব্বিংশতি তীর্থঙ্করদিগের উপদেশ লিখিত আছে। ইহাদের মতে পৃথিবীস্থ জীবের আয়ুর সংখ্যা ২২ সহস্র বৎসর, দশ সহস্র ক্রোশে যে এক যোজন হয়, এই প্রকার চারি সহস্র যোজন বৃক্ষের শরীর হয়, ইহাদের আয়ুষ্কাল দশ সহস্র বৎসর ; শঙ্খ, কড়ি এবং উকুনাদির শরীর অষ্টচত্বারিংশ ক্রোশ স্থূল হইয়া থাকে, কিন্তু ইহাদের আয়ুঃ দ্বাদশ বৎসর ; বৃশ্চিক, আটালু, মক্ষিকাদি কীটের শরীরের আয়তন এক যোজন অর্থাৎ দশ সহস্র ক্রোশ হইয়া থাকে, কিন্তু ইহাদের আয়ুঃ মাত্র ছয়মাস ; মৎস্যাদির শরীর এক কোটি ক্রোশ হইয়া থাকে, ইহাদের আয়ুষ্কাল এক কোটি বৎসর ; হাতীর শরীর দুই ক্রোশ হইতে নয় ক্রোশ পর্য্যন্ত, ইহাদের আয়ুষ্কাল ৮৪ সহস্র বৎসর। জৈনদিগের "রত্নসারভাগ" গ্রন্থে, এবং অন্যান্য অনেক গ্রন্থে এই প্রকার অনেক অনেক অদ্ভুত কথার বর্ণনা আছে। মহাভারতের যুদ্ধে ধর্ম্মের সংরক্ষক রাজন্যবর্গের নিধন হওয়াতে, দেশস্থ লোকসাধারণ এই প্রকার জ্ঞানভ্রষ্ট হইয়াছিল যে, এই সকল অদ্ভুত বাক্য বিশ্বাস করিয়া সকলেই নাস্তিকবাদী এবং বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিল, দেশের এই প্রকার দুর্দ্দিনে মহাভাগবত শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব হয়। তিনি জৈন এবং বৌদ্ধদিগকে এই বলিয়া বিচারে পরাস্ত করেন যে, ঋষভ হইতে মহাবীর পর্য্যন্ত চতুর্ব্বিংশতি তীর্থঙ্করদিগকে তোমরা ঈশ্বর

অর্থাৎ দেবতা বলিয়া মান, কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ, অনাদি পরমেশ্বরকে এই বিশ্বজগতে সর্ব্বকারণ বলিয়া মান না, ইহা তোমাদের ভ্রম। ইহার ভাবার্থ এই যে, ইহারা তাহাদের ২৪টি দেবতাকে ঈশ্বর বলিয়া মানে, অনাদি সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর প্রত্যক্ষ হয় না, যাঁহার প্রত্যক্ষ হয় না, তাঁহার অনুমানও হয় না, সুতরাং তাঁহার শব্দ প্রমাণও গ্রাহ্য নহে; এই বিচারে বৌদ্ধ ও জৈন, পরমেশ্বরের এবং বেদের অপৌরুষত্ব স্বীকার করে না। তাহারা মাত্র বিশ্বাস করে যে, সর্ব্বজ্ঞ, বীতরাগ, অর্হন্, কেবলী, তীর্থঙ্কৃত এবং জিন এই ছয় নামীয় দেবতার সাধনা করিলে, জীব এই ছয় প্রকারের ঈশ্বররূপে পরিণত হয়, অর্থাৎ জীব শিব হয় অর্থাৎ দেবতা হইয়া যায়—ইহাই নির্ব্বাণমুক্তি।

এক্ষণে বিচারক্ষম সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই বুঝুন যে, আধুনিক পণ্ডিতদিগের মতে মহাভারত যুদ্ধ ৫০,০০০ হাজার বর্ষ পূর্ব্বে হইয়াছিল। ইহা যদি সত্য হয়, তবে তাহার ২২০ হাজার বৎসর পরে পুনরায় মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য, ব্রহ্মজ্ঞানের প্রচার করেন। তিনি বিচারে জৈন এবং বৌদ্ধ পণ্ডিতদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু রাজশক্তি-প্রয়োগে দেশ হইতে বৌদ্ধ এবং জৈনধর্ম্মের উচ্ছেদ করিয়াছিলেন। তাঁহার অতি অল্পকাল জীবিত সময়ের মধ্যে, তিনি বেদ এবং উপনিষদের অনেক নুতন ভাষ্য করেন এবং অনেকস্থলে বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে না হইতেই পরলোকগত হন। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, দেশস্থ লোকসাধারণ অনুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন নাই। কাজে কাজেই তাহাদের হৃদয়ে বংশ পরম্পরাগত বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কার বদ্ধমূল ছিল, সুতরাং শ্রীল শঙ্করাচার্য্যের অকালমৃত্যুতে আশানুযায়ী ফল হইল না অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্যের "ব্রহ্মজ্ঞান" লোকের হৃদয়ে সংস্কাররূপে পরিগ্রহণের পূর্ব্বেই তাঁহার অকালমৃত্যু হয়। ইহার বিষময় ফলে, শ্রীল শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণ তাঁহার অভিপ্রায়ের ভিতর ভাল করিয়া প্রবেশ করিতে না পারিয়া, এক অদ্বৈতবাদের নানাপ্রকারে ব্যাখ্যা করিয়া, তাঁহার পরবর্ত্তী শিষ্যগণ নানাসম্প্রদায়ে বিভক্ত হইল, ইহারা কি প্রকার ভ্রষ্টাচারী হইয়া পড়িয়াছে, এবং তাহাদের সংস্রবে অন্যান্য অনেক সম্প্রদায় কি প্রকার ভ্রষ্টাচারী হইয়াছে, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে, মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্তের "উপাসকসম্প্রদায়" নামক গ্রন্থ পাঠ করিতে হয়।

আবার বৌদ্ধদিগের মধ্যে মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক এবং বৈভাষিক এই চারি সম্প্রদায়। ইহাদের অনেক শাখাপ্রশাখাবৎ অনেক সম্প্রদায় আছে। ইহা ব্যতীত বৌদ্ধদিগের মধ্যে তান্ত্রিক সম্প্রদায় বলিয়া একপ্রকার সম্প্রদায় বহুকাল হইতে প্রবেশ করে। এই প্রকার বৌদ্ধ-তান্ত্রিকগণ সাধারণ বৌদ্ধ-সম্প্রদায় হইতে, মতভেদপ্রযুক্ত স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। ইহারা বৌদ্ধদিগের উপরোক্ত চারিপ্রকার দর্শনশাস্ত্রের বিচার স্বীকার করিয়াও, কালী, তারা, ইত্যাদি দশমহাবিদ্যার উপাসক ছিল। তিব্বত দেশ হইতে দালাই লামা নামক সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মযাজক ভারত গবর্ণমেণ্টের নিমন্ত্রণে যখন কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে এই প্রকার তারা এবং কালীমন্ত্রে দীক্ষিত তান্ত্রিক-বৌদ্ধ আসিয়াছিলেন। যাহা হউক, মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের দিগ্বিজয়ের পর যখন দেশস্থ রাজন্যবর্গের শক্তিতে বৌদ্ধধর্ম্ম দেশ হইতে বিদূরিত হইল, তখন এই বৌদ্ধ-তান্ত্রিকগণ নানাবিধ পুরাণের সাহায্যে, হিন্দু-তান্ত্রিক-বেশে, অতিশয় পরাক্রমশালী হইয়া উঠে। রাজশাসনের ভয়ে ভারতের অন্যান্য দেশে ইহাদের পরাক্রম বৃদ্ধি পায়। ফল্গুনদীর ন্যায় অন্তঃসলিলা ভাবে ইহারা সমাজে প্রচলিত হয়, কিন্তু বঙ্গদেশে ইহাদের পরাক্রম অত্যন্ত অধিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল, কেন না, বঙ্গের মহারাজা বল্লাল সেন নিজেই প্রথমতঃ বৌদ্ধ-তান্ত্রিক ছিলেন। পরে তিনি হিন্দুতান্ত্রিকদলভুক্ত হইয়া দশমহাবিদ্যার উপাসক হন। ইহার ভাবার্থ এই যে, যাঁহারা বৌদ্ধাচার গ্রহণ করিয়া তন্ত্রোক্ত দশমহাবিদ্যার উপাসক হইতেন, তাঁহারা বৌদ্ধতান্ত্রিক নামে অভিহিত হইতেন। আর যাঁহারা বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অন্তর্গত দশবিধ সংস্কার গ্রহণ করিয়া, তন্ত্রোক্ত দশমহাবিদ্যার উপাসক হইতেন, তাঁহাদিগকে হিন্দুতান্ত্রিক নামে অভিহিত করা হইত। এই প্রসঙ্গে বুঝিতে হইবে যে, তান্ত্রিক ক্রিয়া এবং আচার সমস্তই স্মৃতি বা বর্ণাশ্রম, এক কথায় বেদ-বিরোধী। এজন্য রাজার, সমাজের এবং শাস্ত্রের শাসন-ভয়ে, অতি গোপনে, চক্রের অনুষ্ঠান করিয়া, তাহার গণ্ডীর মধ্যে এই তান্ত্রিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে বাধ্য করা হইত। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, মহারাজা বল্লাল সেন বঙ্গদেশস্থ লোকদিগকে বৈদিক সংস্কারান্বিত করিতে বিশেষ কৃতকার্য্য হন নাই, কেন না, তাঁহার সময়ে দেশস্থ লোকেরা, বৈদিক সংস্কারের উপর বিশেষ আস্থাস্থাপন করিত না।

যাঁহারা বেদাচার অনুসারে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতেন, তাঁহারাও কখন কখন তাহা ফেলিয়া দিতেন। মহারাজা বল্লালসেনের মৃত্যু-সময় তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেনকে, যাহাতে দেশে বৈদিক সংস্কার বদ্ধমূল হয়, তাহার বিধান করিতে বিশেষ করিয়া বলেন, তাই মহারাজা লক্ষ্মণ সেন রাজ-আইন এই ভাবে প্রচার করেন যে, যে ব্যক্তি যাজন-ক্রিয়া করিবেন বা অধ্যাপক হইবেন, পূজাপাঠ করিবেন, তাঁহারা বৈদিক যজ্ঞোপবীত সদাসর্ব্বদা পরিধান না করিলে, এই সমস্ত কার্য্য করিতে পারিবে না।

মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের রাজশাসনে দেশস্থ অনেকেই উপবীত গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতে সক্ষম হইলেন। আবার কৌলিন্য-প্রথা প্রচলন হওয়াতে, সমাজ-শাসনের ভয়ে অন্ন-বিচার প্রবর্ত্তন হওয়াতে বৌদ্ধাচার অনেক পরিমাণে হ্রাস হইল। লোকে অতি সংগোপনে তান্ত্রিক চক্রের গণ্ডির ভিতর ব্যতীত, কেহ প্রকাশ্য ভাবে অন্নবিচার ত্যাগ করিতে সাহসী হইত না। যাহা হউক, লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের পর বঙ্গদেশে বৈদিকধর্ম্ম আর বিশেষভাবে প্রচার হয় নাই। কারণ বঙ্গদেশ, তাঁহার রাজত্বের পর মুসলমানদিগের হস্তগত হয়। ইহার মধ্যে এক সুবিধা এই ছিল যে, মুসলমান নবাবগণ, হিন্দুদিগের দ্বারা বঙ্গদেশের প্রজাশাসন এবং রাজস্ব আদায় করিতেন। ইহার ফলে, বঙ্গদেশ-বাসী হিন্দুগণের, মুসলমানদিগের সংস্পর্শে, সামাজিক আচারব্যবহার এবং ধর্ম্মনীতির কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হয় নাই। যাহা হউক, এই সকল কারণে লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের পর শ্রীগৌরাঙ্গদেব এবং রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের আবির্ভাব পর্য্যন্ত প্রায় তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত তান্ত্রিকগণ অপ্রতিহতপ্রভাবে বঙ্গদেশে যে বীভৎস্ আচার প্রচার করিতেছিলেন, তাহা স্মরণ হইলে এক্ষণ পর্য্যন্ত হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। কৌতুহলাক্রান্ত পাঠকদিগের অবগতির জন্য নিম্নে কয়েক খানি তন্ত্র হইতে কিছু উদ্ধৃত করা হইল—

মদ্যং মাংসং চ মীনং চ মুদ্রা মৈথুনমেবচ।
এতে পঞ্চ মকারাঃ স্যুর্মোক্ষদা হি যুগে যুগে॥

কালীতন্ত্র॥

মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা অর্থাৎ মদের চাট, এবং স্ত্রী-সম্ভোগ, এই পঞ্চ মকারের সাধনায়, যুগে যুগে মোক্ষ প্রদান করে।

প্রবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ
নিবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণাঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥

কুলার্ণব তন্ত্র ॥

মুচি, চণ্ডাল, হীনশূদ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাদি যে কোন বর্ণের বা যে কোন জাতীয় লোক ভৈরবীচক্রের মধ্যে আসিবে, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া বুঝিতে হইবে, কিন্তু চক্রের বাহির হইলে তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ বলিয়া বুঝিবে। এক কথায় ভৈরবীচক্রের গণ্ডির মধ্যে বেদোক্ত বর্ণ বা জাতি-বিচার করিতে হয় না—

পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা যাবৎ পততি ভূতলে।
পুনরুত্থায় বৈ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রে প্রথম মদ্যপানের মাত্রা স্থির করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহার গুণের বর্ণনা করিতে করিতে এই ভাবে মদ্যের গুণ বর্ণনা করিয়াছেন যে, "মদ্য পান করিতে করিতে যাবৎ নেশাধিক্য বশতঃ ভূতলে পতিত না হয়, ততক্ষণ মদ্যপান করিবে", পরে যখন ভূতল হইতে উঠিবার শক্তি হইবে, তখন পুনরায় যে ব্যক্তি মদ্য পান করে, তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না।

আজকাল অনেকে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের এই সমস্ত বচনের অনেক প্রকার সুসভ্য সমাজোপযোগী শ্রুতিমধুর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন এবং এই সকল ব্যাখ্যা বিশেষ বিশেষ তন্ত্রে আছে বলিয়া প্রকাশ করেন; কিন্তু নিরপেক্ষ ভাবে যাঁহারা মহানির্ব্বাণ তন্ত্রখানি পাঠ করেন, তাঁহাদিগকে আর কেহ কোন মিষ্ট কথায় ভুলাইতে পারিবেন না, কেন না, এই তন্ত্রে কি প্রকারে পঞ্চ-মকার সংগ্রহ এবং প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, অর্থাৎ মদ্য কোন্ কোন্ দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত করিতে হইবে, কোন্ কোন্ জন্তুর মাংস বা কোন্ কোন্ মৎস্য অথবা কোন্ শ্রেণীর স্ত্রীলোক

সংগ্রহ করিতে হইবে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ সর্ব্বতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে উল্লেখ আছে। উহা পাঠ করিলে পঞ্চ-মকারের আর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা চলে না। এই সমস্ত বিষয় অতি অশ্লীল, এজন্য তাহার মূল বচন উল্লেখ করা হইল না। ইহা ব্যতীত 'উড্ডীসাদি' তন্ত্রে অনেক বিষয় উল্লেখ আছে এবং ব্যবহারে দেখা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন নির্জ্জন ঘরে মদ্যের কলসী বা বোতল রাখিয়া, কৌল এক ঘরে প্রবেশ করিয়া এক বোতল মদ্যপান করিয়া দ্বিতীয় ঘরে প্রবেশ করিবে, এইরূপে তৃতীয় ঘরে প্রবেশ করিয়া মদ্য পান করতঃ, যে পর্য্যন্ত কৌল নেশায় অজ্ঞান হইয়া কাষ্ঠের ন্যায় ভূতলে পতিত না হইবে, ততক্ষণ এই প্রকার মদ্যপান করিবে, পরে নেশা ছুটিলে পুনরায় এইরূপে পান করিবে। এই প্রকার তৃতীয়বার পান করতঃ পতিত হইবার পরে উঠিলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না, অর্থাৎ মোক্ষ হয়। এই স্থলে ইহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করা এক অসাধ্য ব্যাপার; নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই বুঝিবেন যে, উড্ডীস তন্ত্রের এই প্রকার ক্রিয়া, মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের উপরোক্ত "পীত্বা পীত্বা" ইতি বচনের ব্যাখ্যা স্বরূপ। তান্ত্রিকদিগের স্ত্রী-সম্ভোগ-প্রকরণ অতি বীভৎস ব্যাপার:—

"মাতৃযোনিং পরিত্যজ্য বিহরেৎ সর্ব্বযোনিষু।
বেদ শাস্ত্র পুরাণানি সামান্যগণিকা ইব।
একৈব শাম্ভবী মুদ্রা গুপ্তা কুলবধূরিব॥

জ্ঞানসঙ্কলনী তন্ত্র॥

অর্থাৎ গর্ভধারিণী মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া মাসি, পিসী, ভগিনী, কন্যা ইত্যাদি ক্রমে কোন বর্ণের কোন স্ত্রীলোক পরিত্যাগ করিবে না, সকলকেই সম্ভোগ করিবে। যদি বল, মূল বেদ, পুরাণ, স্মৃতিশাস্ত্রাদিতে এই প্রকার পরস্ত্রী-গমনে নিষেধ আছে, তখন কি প্রকারে এই অধর্ম্মের কার্য্য করা যায়। তাহার প্রত্যুত্তরে "জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র" বলিতেছেন যে, বেদ পুরাণ ও অন্যান্য শাস্ত্রকে সামান্য বেশ্যা বলিয়া জানিবে, কিন্তু একমাত্র "শাম্ভবী" মুদ্রা অর্থাৎ শিববাক্য স্বরূপ তন্ত্র এবং ইহাতে উল্লিখিত ক্রিয়াসকল কুলবধূদিগের ন্যায়

গুপ্তা অর্থাৎ অন্য কেহ জানিতে পারে না, কেন না, ইহা গুরুগম্য। অনেকে এই বচনের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলেন যে, জপমালার সাক্ষী-মালাটীকে মাতৃযোগী বলে, কিন্তু তাঁহারা কখন ইহার সঙ্গতি করিতে পারিবেন না। আবার স্থানান্তরে এই "জ্ঞানসঙ্কলিনী" তন্ত্রে তান্ত্রিকদিগের মুক্তি বা সিদ্ধির বিষয় এই প্রকার লিখিত আছে যথা :—

"পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ ॥"

জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র।৪৭।

অর্থাৎ ঘৃণা, লজ্জা, কুল, শীল, মান, ভয়, রাগ, দ্বেষ ইত্যাদি আট প্রকার পাশ হইতে মুক্ত হইতে পারিলে, পূর্ণভাবে সিদ্ধ হয়। এই প্রকার পাশমুক্ত ব্যক্তির তন্ত্রে এইরূপ উল্লেখ আছে, যথা :—

হালাং পিবতি দীক্ষিতস্য মন্দিরে সুপ্তো নিশায়াং
গণিকা গৃহেষু বিরাজতে কৌলব চক্রবর্ত্তী।

জ্ঞাঃ সঃ তন্ত্র।

যিনি দীক্ষিতের অর্থাৎ মদ্যবিক্রেতার দোকানে গমন করিয়া, বোতল বোতল মদ্যপান করিয়া, বেশ্যা-বাড়ীতে গিয়া তাহার সহিত সমস্ত রাত্রি অতি-বাহিত করিয়া, কোন প্রকার দেশাচার, কুলাচার, সমাজের শাসন, বেদাদি সৎশাস্ত্রের শাসন এবং স্ত্রী-পুত্রাদি বন্ধুবান্ধবের গঞ্জনাদির প্রতি যে কৌল কোন প্রকার লক্ষ্য না করে, সেই কৌল রাজচক্রবর্ত্তী স্বরূপ অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

এই প্রকার বর্ণনা পাঠ করিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন যে, এইপ্রকার বীভৎস-আচারী মনুষ্য, পশুবৎ না হইলে, কি প্রকারে ইহার অনুষ্ঠান করে! তান্ত্রিকযুগে অর্থাৎ গৌরাঙ্গদেব এবং রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের আবির্ভাবের পর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের তান্ত্রিকদল নিতান্তই পশুবৎ ছিল, স্ত্রীলোকদিগের বেদোক্ত সতীত্বধর্ম্ম রক্ষা করা বিশেষ দায় হইয়া উঠিয়াছিল। এই সকল নরপশু সর্ব্বশাস্ত্র-বিরোধী, রজস্বলা স্ত্রী, কি হীনবর্ণা স্ত্রী গমনে কোন দোষ মনে করিত না। রুদ্রযামল তন্ত্রের উপদেশ অনুসারে, ইহারা সাধনার দোহাই দিয়া, প্রচার করিত যে,—

রজস্বলা পুষ্করং তীর্থং চাণ্ডালী তু স্বয়ং কাশী,
চর্ম্মকারী প্রয়াগঃ স্যাদ্রজকী মথুরা মতা।
অযোধ্যা পুসমী প্রোক্তা।

রুদ্রযামল তন্ত্র।

রজস্বলা স্ত্রীগমনে পুষ্করতীর্থে স্নানের ফল, চণ্ডালিনী গমনে কাশীযাত্রার ফল, চর্ম্মকারী অর্থাৎ চামার বা মুচির স্ত্রীগমনে প্রয়াগতীর্থে স্নানের ফল, রজকিনী-গমনে মথুরাতীর্থে গমনের ফল, আর ব্যাধ অর্থাৎ বেদিয়ার স্ত্রীগমনে অযোধ্যা-তীর্থে ভ্রমণের ফল হয়। এই প্রকার নরপশুরূপী তান্ত্রিকগণ সাধন-গৃহের ভিতর, নিজ কন্যাই হউক, নিজ ভগিনীই হউক, অথবা অন্য কোন স্ত্রীলোক হউক, নিজ গর্ভধারিণী মাতা ব্যতীত অন্য কাহাকেও পরিত্যাগ করে না! কিন্তু যাহারা দশমহাবিদ্যার মধ্যে মাতঙ্গী-বিদ্যার উপাসক, তাহাদের সাধনগৃহে যদি তাহাদের নিজ মাতাও আইসে, তবে তাহারা বলে যে,

"মাতরমপি ন ত্যজেৎ"

অর্থাৎ মাতাকেও ত্যাগ করিবে না। যদি কেহ এই সকল বীভৎস-আচার প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে যে দেশে বৈদিক ধর্ম্মের শাসন নাই, তিনি সেই দেশে গমন করুন, তথায় এইপ্রকার বীভৎস-আচারের অভিনয় দেখিতে পাইবেন। মুসলমান এবং খৃষ্টানদিগের বিবাহ-নীতির ভিতর প্রবেশ করিয়া বুঝুন, ইহারা কত ঘনিষ্ঠ স্বগোত্রে বিবাহ করে। তাহার পর বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বিগণের দেশে গমন করুন, বিশেষতঃ যেখানে তান্ত্রিক আচার এখন পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে, তথায় দেখিতে পাইবেন, স্ত্রীলোকদিগের সতীত্বধর্ম্মের কোন গৌরব নাই। ভারতবর্ষের বাহিরের, চীন, জাপানদেশ পরিত্যাগ করিয়া, ভুটান, সিকিম ও দারজিলিংএর অনেক স্থানের বৌদ্ধমতাবলম্বীদিগের আচার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করুন, তাহাতে বুঝিতে পারিবেন, এই সমস্ত দেশের স্ত্রী-পুরুষ এতই ব্যভিচারী যে, সন্তানের পিতা নির্দ্দিষ্ট করা অতি কঠিন কার্য্য। এই জন্য উত্তরাধিকারী নির্দ্দেশ হয় না বলিয়া, রাজার আইন অনুসারে, এই প্রদেশে পুত্র পিতার উত্তরাধিকারী হয় না। আসাম প্রদেশের কোন কোন স্থানের লোকের সামাজিক আচারব্যবহার লক্ষ্য করুন, ইহারা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয় বটে,

কিন্তু এ দেশের স্ত্রীলোকদিগের চরিত্র কি প্রকার শোচনীয় এবং সমাজ কি প্রকারে এই সকল রীতির প্রশ্রয় দিতেছে, তাহা একবার চিন্তা করুন। ঘরের কথা প্রকাশ করা নিতান্ত দুঃখজনক। এক কথায় বুঝুন যে, আসাম অঞ্চলের অনেক স্থানে স্ত্রীলোকদিগের সতীত্বধর্ম্মের কোন গৌরব নাই।

এই বিষয়ের গবেষণায় বিচারক্ষম ব্যক্তিমাত্রেই অনায়াসে অনুমান করিতে পারিবেন যে, মহারাজা আদিশূরের সময় পর্যান্ত বঙ্গদেশে সামাজিক অবস্থা কি ছিল। মহারাজা আদিশূর তাঁহার রাজ্যে বৈদিকধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য প্রথমে কাণ্যকুব্জ হইতে পাঁচটি ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহারা বঙ্গদেশে আসিয়া পতিত হন। তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই পণ্ডিত ছিলেন, তাহা তাঁহাদের বিরচিত গ্রন্থ পাঠে জানা যায়; এবং তাঁহারা কেন বঙ্গদেশে আসিয়া পতিত হইলেন, ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, যে প্রকার চীন, তিব্বত, ভুটান প্রভৃতি স্থানে গমন করিলে কোন বৈদিক হিন্দু স্বধর্ম্মরক্ষা করিতে পারেন না, সেইরূপ সমগ্র বঙ্গদেশ বৌদ্ধাচারী থাকাতে, এইস্থানে বেদাচারী হিন্দু আগমন করিলে ধর্ম্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইতেন না। কেবল তাহা নয়, দায়ভাগ কিম্বা মিতাক্ষরার মতে উত্তরাধিকারী নির্ণয় পর্য্যন্ত হইত না, আজ কালও ভুটানে যে প্রকার ব্যভিচার চলিতেছে, তাহাতে উত্তরাধিকারী নির্ণয় করা বড় কঠিন কার্য্য। এইরূপ বঙ্গদেশে কি প্রকার অবস্থা ছিল, তাহার বর্ণনা করা যায় না। মহারাজা আদিশূর এবং বল্লাল সেনের জন্ম সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী আছে। আদিশূর রাজার প্রকৃত পিতা কে, তাহা কেহ বলিতে পারে না; কেহ কেহ বলেন, ব্রহ্মপুত্র নদী ব্রাহ্মণ রূপ ধারণ করিয়া আদিশূরের জন্ম দেন। মহারাজ বল্লাল সেন সম্বন্ধেও এইরূপ অনেক গল্প আছে। কোন কোন ঘটকদিগের খাতাপত্রে লেখা আছে যে,—

"সোম বংশের বংশ ধ্বংস, সেন বংশ তাজা।
ভীম্মক সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লাল সেন রাজা॥"

ইহার ভাবার্থ—বল্লাল সেন তাঁহার পিতার ঔরসজাত পুত্র নহেন। ঘটকগণ রাজার সম্মানরক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে ভীম্মক সেনের ক্ষেত্রজপুত্র বলিয়া ঘটক-কারিকায় লিখিয়া গিয়াছেন; ইহাতে শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে, যে দেশে বৌদ্ধাচার প্রবল, তথায় বৈদিক কালের ক্ষেত্রজপুত্র কি

প্রকারে সম্ভবে ? বিশেষতঃ কলিকালে, বিবাহের পূর্ব্বে বাগ্দত্তা সংস্কার, নিয়োগ অর্থাৎ পরপুরুষ নিয়োগ করিয়া স্ত্রীলোকের গর্ভে ক্ষেত্রজ সন্তানোৎপত্তি করা, মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত, সমুদ্রযাত্রা, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করা, ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে হীনবর্ণের শূদ্রের স্পৃষ্ট অন্নভোজন করা, মধুপর্কে পশুবলি অর্থাৎ অতিথি এবং আত্মীয়কুটুম্ব বাটী আসিলে তাহাদের আহারের জন্য পশুবলি ইত্যাদি অনেক কার্য্য কলিকালে একেবারে নিষেধ আছে; এই নিষেধ বাক্যসকল ভারতের সর্ব্বত্র এবং সকল রাজাদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল; বিশেষতঃ কলিকালে ক্ষেত্রজপুত্রের স্থানে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করার বিধি শাস্ত্রে আছে এবং তাহাই সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, বল্লাল-সেন ক্ষেত্রজ পুত্র ছিলেন না, তিনি জারজ পুত্র ছিলেন। বল্লাল প্রথম বয়সে কায়স্থ বা বৈদ্য, ইহার কিছুই ছিলেন না, প্রকৃতপক্ষে তিনি বৌদ্ধ-তান্ত্রিক ছিলেন। পরে হিন্দু তান্ত্রিকগণের অর্থাৎ বেদাচারী তান্ত্রিকদিগের পরামর্শে হিন্দু-তান্ত্রিক দলভুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি বৈদিক দীক্ষা, বৈদিক প্রণালী অনুসারে বিবাহ, শ্রাদ্ধ, দায়ভাগ অনুসারে উত্তরাধিকারী নির্ণয়, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, কিন্তু তাঁহার অকালমৃত্যুতে তিনি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, এজন্য তাঁহার একমাত্র পুত্র লক্ষ্মণসেন আইনের শাসনে এই সমস্ত কার্য্য প্রজাদিগকে অনুষ্ঠান করিতে বাধ্য করেন; এবিষয় পূর্ব্বে একবার বর্ণনা করা হইয়াছে। লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের পর বঙ্গদেশে মুসলমান-রাজত্ব স্থাপিত হয়। এক্ষণে চিন্তা করিয়া বুঝিতে হইবে যে, লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের পরে এবং মহা-প্রভু গৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের সময় পর্য্যন্ত—এই সুদীর্ঘকালে বঙ্গের কি প্রকার আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক অবস্থা ছিল? দেশের লোকেরা, সমাজের ভয়ে এবং নিজেদের প্রতিষ্ঠার জন্য বৈদিক কার্য্যগুলি অনুষ্ঠান করিতেন; তান্ত্রিক দীক্ষা ও তান্ত্রিক কার্য্যের বীভৎস অনুষ্ঠান অনেকেই করিতেন, তাহার বিষময় ফলে প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান, অযথা মাংস-মৎস্য আহার, পরস্ত্রীগমন ইত্যাদি বেদানুমোদিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম-বিরোধী কার্য্য অপ্রতিহত ভাবে প্রচলিত হইয়া বঙ্গীয় সমাজ একেবারে কলুষিত হইয়াছিল। তান্ত্রিক বিপ্লবে বঙ্গদেশের কি প্রকার দুর্দ্দশা হইয়াছিল, এবং তাহার বিষময় ফলে, এক্ষণে এই বিষয়

শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত, বঙ্গদেশস্থ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের ধর্ম্মজীবন এবং সামাজিক চরিত্রের কি প্রকার বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তাহা বিচার করিলে অনায়াসে বুঝিতে পারা যাইবে।

এই সকল ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ বৈকুণ্ঠবাসী লক্ষ্মী-নারায়ণের প্রতিনিধি স্বরূপ শালগ্রাম শিলা বা রাধাকৃষ্ণের, কেহ কেহ বা কৈলাস-পর্ব্বতবাসী মহাদেব, কেহ কেহ বা চণ্ডমুণ্ড-বিনাশিনী বা শ্মশানবাসিনী কালীতারাদি দশমহাবিদ্যার মধ্যে কোন বিদ্যার উপাসনায় নিযুক্ত আছেন। বড়ই দুঃখের বিষয়, "প্রণব" স্বরূপ সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বাধার, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্ব-কারণ-কারণ পূর্ণ ভগবান্‌কে কেহই উপাসনা করেন না। চিরপ্রথানুসারে সাবিত্রী অর্থাৎ বৈদিক দীক্ষা দিতে হয় বলিয়া, ইঁহারা বৈদিক মতে দীক্ষিত হন এবং দ্বিজজাতি বলিয়া গৌরব করিবার জন্য ছেলেখেলার ন্যায়, শুক-পাখীর পাঠের ন্যায়, গায়ত্রী মন্ত্র জপ করেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সকলেই তান্ত্রিক-গুরু-[illegible] আশ্রয় করিয়া, পৌরাণিক অথবা তান্ত্রিক দেবতার পূজায় অনুরক্ত আছেন। ইহাতে বিজ্ঞব্যক্তি মাত্রেই অনুমান করিতে পারিবেন যে, বর্ত্তমান সর্ব্ববিষয়ে উন্নতির সময় বঙ্গদেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগেরও যখন এই প্রকার আধ্যাত্মিক অবনতি হইল, তখন লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের পর হইতে মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সময় পর্য্যন্ত—এই অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন সময়—তান্ত্রিক-গণ কি প্রকার বীভৎস-আচার, বঙ্গদেশবাসীদিগকে শিক্ষা দিয়াছিল! বর্ত্তমান সময়েও যদি গাছ-পাথরকে দেবদেবী জ্ঞান করিয়া তাহার পূজায় শিক্ষিত ব্যক্তি সকল অনুরক্ত থাকেন, তবে সেই সুদীর্ঘ তমসাচ্ছন্ন সময়ে, লোকে পুরুষমাত্রকেই 'ভৈরব' এবং স্ত্রীলোক মাত্রকেই 'ভৈরবী' জ্ঞান করিয়া মদ্যমাংসসহ যদৃচ্ছা আচার-ব্যবহার করিবে, তাহার আর বৈচিত্র্য কি? এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, এই তিমিরাচ্ছন্ন সময় তান্ত্রিক অনুষ্ঠান ব্যতীত মনসা-পূজা, বেহুলার ভাসান, বিষহরির পূজা ইত্যাদি ধর্ম্মচর্চ্চার চরম সীমা ছিল। নবদ্বীপের বিদ্যাচর্চ্চার বিষয় বুঝিতে গেলে দেখা যায়, কলাপ ব্যাকরণ নবদ্বীপে অধ্যয়ন করান হইত, কাব্য এবং অলঙ্কারাদি শাস্ত্র পঠন হইত, অনেকে মিথিলা দেশ হইতে ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আসিতেন। মহাপ্রভুর প্রিয়শিষ্য বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মিথিলা হইতে ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া আসিয়া, নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রের

প্রথম টোল স্থাপন করেন। শ্রীল রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর সমপাঠী ছিলেন, তিনি স্মৃতিশাস্ত্রের সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া, স্মৃতি-শাস্ত্রের টোল স্থাপনা করেন। এই প্রকার জগদীশ, রঘুনাথ, এবং ভবানন্দ, মহাপ্রভুর সমসময়ে ন্যায়শাস্ত্রের টোল করেন এবং কৃষ্ণানন্দের "তন্ত্রসার" নামক পুস্তক এই সময় প্রণীত হয়। ইহাদ্বারা বুঝিতে হইবে, মহাপ্রভুর আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তীকালে এবং তাঁহার সমসময়ে নবদ্বীপে বিদ্যাচর্চ্চার বিশেষ উন্নতি হয়, কিন্তু ধর্ম্মচর্চ্চাসম্বন্ধে কোন প্রকার উন্নতি হয় নাই। বিদ্যাচর্চ্চাও নির্দ্দিষ্ট কয়েকজন ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের মধ্যে আবদ্ধ ছিল; লোকসাধারণ অজ্ঞানাচ্ছন্ন ছিল, এজন্য যাঁহারা এই দুর্দ্দিনে বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তাঁহারাও একপ্রকার দক্ষিণাচারী তান্ত্রিক ছিলেন অর্থাৎ ইঁহারা পঞ্চ-মকারী তান্ত্রিকদিগের ন্যায় বীভৎসাচার করিতেন না বটে, কিন্তু ইঁহাদের উপাস্য রাধাকৃষ্ণকে ইঁহারা একটী পৌরাণিক দেবতা বলিয়া বুঝিতেন, এবং তান্ত্রিক মন্ত্রের আকর্ষণে এই রাধাকৃষ্ণ নামক দেবতাকে আকর্ষণ করা যায় বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু রাধাকৃষ্ণকে তখন কেহ পূর্ণ ভগবান্ জ্ঞান করিয়া তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত হইতেন না। বঙ্গদেশের দুর্দ্দশার বিষয় আর অধিক কি বলিব, এক্ষণ পর্য্যন্ত অধিকাংশ বৈষ্ণব রাধাকৃষ্ণকে একটী দেবতা জ্ঞান করিয়া পৌরাণিক ও তান্ত্রিক উপচারে এবং মন্ত্রে তাঁহাদের পূজা করিতেছেন। যদি আজকালকার বৈষ্ণবদিগের এই প্রকার দুর্দ্দশা হয়, তবে ইহার চারি শত বৎসর পূর্ব্বে বৈষ্ণবদিগের কি প্রকার শোচনীয় অবস্থা ছিল, তাহা একবার চিন্তা করিয়া বুঝিলে অনায়াসে অনুমান করা যায়। এই সময়ের অধিকাংশ বৈষ্ণবগণ জয়দেব ঠাকুরের ন্যায় কেহ কেহ স্বকীয়, এবং বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের ন্যায় কেহ কেহ পরকীয় ভাবে স্ত্রীলোকের সাহায্যে অর্থাৎ দর্শন, স্পর্শন, স্তম্ভন, সম্ভোগাদি তান্ত্রিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া ভজন সাধন করিতেন। যখন দেশস্থ সর্ব্বশ্রেণীর লোকসকল এই প্রকার ভগবৎবিমুখী হইয়া, কাল্পনিক দেবদেবীর উপাসনায় নিযুক্ত ছিলেন, ব্রহ্মচর্য্য এবং সতীত্বধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া যখন ব্যভিচারের প্রশ্রয় দিতেছিলেন, যখন বৈদিক শাস্ত্রের জ্ঞানকাণ্ড বা উপনিষদ বা বেদান্ত শাস্ত্রের চর্চ্চা একেবারে ছিল না, সর্ব্বোপরি যখন ভগবদ্ভক্তি কাহাকে বলে, দেশস্থ লোক জানিত না, এই সময় শ্রীগৌরচন্দ্র একমাত্র কৃপার বশবর্ত্তী হইয়া, বেদের উদ্ধার, বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপন এবং

ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় যে ভগবদ্ভক্তি, তাহা জীবকে অকাতরে শিক্ষা দান করিবার জন্য, অদ্য ৪২৫ বৎসর হইল নবদ্বীপে শচীগর্ভে আবির্ভূত হন। দেশস্থ লোক তখন পুরাণ এবং তন্ত্র ব্যতীত বেদাদি সৎশাস্ত্রের চর্চ্চা করিত না ; এজন্য তিনি পুরাণ এবং তন্ত্র অবলম্বন করিয়া, উপনিষদ বা বেদান্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য একমাত্র পরমেশ্বর-উপাসনার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি কি, তাহা নিজে ভক্ত সাজিয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব যিনি ভাল করিয়া বুঝিতে চাহেন, তিনি মহাপ্রভুর জীবনী এবং তাঁহার শিক্ষা, বিশেষ বিচার করিয়া আপন আপন ভাব অনুসারে পাঠ করুন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, জগতে যতপ্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, তাহার সূক্ষ্মতত্ত্বসকল মহাপ্রভু-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মে আছে, কিন্তু মহাপ্রভু-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মে সে সমস্ত উচ্চতত্ত্বসকল আছে, তাহা অন্য কোন ধর্ম্মে নাই ; ভক্তিপন্থী মাত্রেই এই প্রস্তাব পাঠ করিলে নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন। যাঁহারা জ্ঞানপন্থী অথবা মায়াবাদী, তাঁহারাও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-শাস্ত্র বা মহাপ্রভুর শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহা-দের মুক্তি অর্থাৎ ত্রিতাপ হইতে মুক্তি বা মায়া হইতে মুক্তির প্রকৃষ্ট উপায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রে আছে। আবার তাহার উপরের তত্ত্ব, সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবদ্দর্শনের প্রকৃষ্ট উপায় যে ভগবৎ-প্রেম, তাহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের মুখ্য সাধনার বিষয়। এই প্রকার পৌরাণিক, তান্ত্রিক, বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম্মাবলম্বিগণ, পরমেশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া, উচ্চজীবপ্রকৃতিযুক্ত দেবতা-দিগের উপাসক হইয়াছেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের বিধিমার্গে ইহা অতি প্রকৃষ্ট ভাবে আছে, তাহার অতিরিক্ত সর্ব্বকারণ-কারণস্বরূপ শ্রীভগবৎ-ভজনসাধনের প্রকরণ অতি বিশদ ভাবে এই বৈষ্ণব-ধর্ম্মে আছে। জৈন এবং বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ-নীতি 'দয়া ধর্ম্মমূলং' এই নীতির উপদেশ যে প্রকার অতি উচ্চ এবং অতি বিস্তীর্ণ ভাবে বৈষ্ণবধর্ম্মে আছে, অন্য কোন ধর্ম্মে সে প্রকার নাই। কেবল ইহাই নহে, জ্ঞানের বিচার, বৈরাগ্যের ত্যাগ স্বীকার, পৌরাণিক বা তান্ত্রিকদিগের জীবন্ত বিগ্রহ-সেবা, খৃষ্টান ও মুসল-মানাদির অবতারবাদ, বাইবেল, কোরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্রসকলের অপৌরুষ বাদ, ব্রাহ্মদিগের সবিশেষ ঈশ্বরোপাসনা, মায়াবাদীদিগের নির্ব্বিশেষ ভগবত্তত্ত্ব অনুসন্ধান, দ্বৈতবাদীদিগের ভগবৎ-সেবা এবং অদ্বৈতবাদীদিগের জীবের

স্বরূপতত্ত্বে পরিণত হইবার সাধনা ইত্যাদি সর্ব্বতত্ত্বের মীমাংসা এবং সাধনা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মে যে প্রকার উৎকৃষ্ট ভাবে আছে, অন্য কোন ধর্ম্মে তাহা নাই। যাঁহারা এই সমস্ত বিষয়ের সত্যতা বুঝিতে চাহেন, তাঁহারা শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস, গোপাল ভট্ট এই ছয় নিত্যসিদ্ধ গোস্বামী-বৃন্দের আচরিত এবং প্রচারিত ধর্ম্মের অনুকূল গ্রন্থসকল নিরপেক্ষ ভাবে পাঠ করুন; তাহা হইলে, সর্ব্বতত্ত্বই বুঝিতে পারিবেন। আর যাঁহারা অবতার-বাদ লইয়া তর্কবিতর্ক করেন, তাঁহারাও বুঝিতে পারিবেন যে, বৈদিক অবতার-বাদ সমর্থিত করিবার জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব-শাস্ত্র ইহার অনেক বিচার করিয়াছেন; কিন্তু অবতারগণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মৌলিক উপাস্য নহে। তাহার বিপরীত, বেদোক্ত তুরীয় ব্রহ্ম বা তুরীয় কৃষ্ণ বা সর্ব্ব-কারণ-কারণ সর্ব্ব-অবতারী পরম কৃষ্ণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের একমাত্র উপাস্য—

"ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব-অবতারী সর্ব্বকারণ প্রধান॥

শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত।

যাঁহারা বেদ কিম্বা উপনিষদ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জ্ঞাত আছেন যে, তুরীয় ভগবান্ সৃষ্টিপ্রকরণে যখন কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ-যুক্ত হন, তখনই বেদ এই ভগবান্‌কে প্রকৃতি বা মায়াসম্বন্ধযুক্ত বলিয়া, কার্য্য অনুসারে এক একটী নাম ও এক একটী রূপ দিয়া বর্ণনা করেন। একটু সূক্ষ্ম-ভাবে বিচার করিলে বুঝা যায় যে, শ্রীভগবান্‌কে বিকারী বা পরিণামী বলিলে, বেদ এবং যুক্তিবিরুদ্ধ হয়, আবার প্রকৃতিকে বিকারী বা পরিণামী বলা নিতান্ত অজ্ঞানের কার্য্য; কারণ প্রকৃতি চিৎশক্তিবিহীন জড়পদার্থ অথচ এই পরিদৃশ্য-মান জগৎ নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, অর্থাৎ এক জগতের সর্ব্বদাই নানা প্রকার (Chemical, Physical এবং Physiological) বিকৃতি বা পরিণতি হইতেছে। একণে এই গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা শ্রীশ্রীমহাপ্রভু অতি অল্প কথায় এই প্রকাশে ব্যক্ত করিয়াছেন, যথা :—

জগৎ কারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা॥

কৃষ্ণ শক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ।
অগ্নি শক্ত্যে লৌহ যেন করয়ে জারণ॥
অতএব কৃষ্ণমূল জগৎকারণ।
প্রকৃতি কারণ যৈছে অজা-গলস্তন॥

শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত।

ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, জড়প্রকৃতি কখনও জগতের কারণ হইতে পারে না; আবার সর্ব্ব-কারণ-কারণ পরম কৃষ্ণ বা তুরীয় কৃষ্ণ কখনও সৃষ্টিকার্য্যে লিপ্ত হন না। ইহা জগৎকে বিশেষ করিয়া বুঝাইবার জন্য পরবর্ত্তী পয়ারে দেখান হইয়াছে যে, পূর্ণ ভগবানের বেদোক্ত "এক পাদ" কার্য্যকারণ-সম্বন্ধযুক্ত হইয়া প্রথম পুরুষ মহাবিষ্ণু, আদি নারায়ণ, মহাসঙ্কর্ষণ, হিরণ্যগর্ভ ইত্যাদি নাম গ্রহণ করিয়া হেতুকর্ত্তা হইয়া এই প্রকৃতিতে শক্তি-সঞ্চারিত করেন, তদ্‌যথা :—

সেহো নহে, (১) যাতে কর্ত্তা হেতু নারায়ণ (২)।
হেতুকর্ত্তা করে তারে শক্তি সঞ্চারণ॥
ঘটের নিমিত্ত হেতু যৈছে কুম্ভকার।
তৈছে জগতের কর্ত্তা পুরুষাবতার॥(৩)

আবার এই পুরুষাবতার বা হিরণ্যগর্ভ পুরুষ, শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ শ্রীভগবান্ এবং প্রকৃতির মধ্যবর্ত্তী হইয়া, এই দুইয়ের অর্থাৎ মূলকর্ত্তা শ্রীভগবান্ এবং গৌণকর্ত্তা প্রকৃতি বা মায়ার সাহায্যে কি প্রকারে জগৎ সৃষ্টি করিলেন, তাহা পরবর্ত্তী পয়ারে বলা হইয়াছে, যথা ;—

কৃষ্ণ (৪) কর্ত্তা, মায়া তার (৫) করেন সহায়।
ঘটের কারণ চক্র দণ্ডাদি উপায়॥

---

(১) সেহো নহে—তুরীয় কৃষ্ণ নহে। ইহার ভাবার্থ এই যে, তুরীয় কৃষ্ণ প্রকৃতিতে শক্তি সঞ্চারিত করেন না।

(২) আদি নারায়ণ।

(৩) নারায়ণ, হিরণ্যগর্ভ ইত্যাদি নামধারী প্রথম পুরুষাবতার।

(৪) মূলকর্ত্তা।

(৫) তার অর্থাৎ পুরুষাবতারের।

ইহার ভাবার্থ এই যে, ঘটের সৃষ্টি-প্রকরণে ঘট গড়িবার কুমারের চাকা এবং দণ্ডাদি যে প্রকার জড়পদার্থ হইয়াও, কুম্ভকারের শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া, ঘট নির্ম্মাণের বা সৃষ্টির নিমিত্তকারণ স্থানীয় হয়, তদ্রূপ প্রকৃতি জড় হইয়াও পুরুষাবতারের শক্তিতে শক্তিমতী হইয়া জগৎ গঠন বা সৃষ্টি করেন; কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারে বুঝিতে গেলে বুঝা যায় যে, এই সৃষ্টির মূলকর্ত্তা, পুরুষাবতার নহেন, বা প্রকৃতিও নহেন, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণই মূলকর্ত্তা। তাই বলা হইতেছে, প্রকৃতি পুরুষের সন্নিধানে শক্তিমতী হইয়া, পুরুষকে সৃষ্টিকার্য্যের সহায়তা করেন, আর পুরুষ, মূলসৃষ্টিকর্ত্তা তুরীয় কৃষ্ণের সান্নিধ্যে শক্তিমান হন। প্রকৃতি কি প্রকারে পুরুষের সৃষ্টিকার্য্যের সাহায্য করেন, তাহা পরবর্ত্তী পয়ারে এই প্রকারে বর্ণনা করা হইয়াছে যথা,—

দূর হইতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান।
জীবরূপ বীর্য্য তাতে করেন আধান॥
এক অঙ্গাভাসে করে মায়াতে মিলন।
মায়া হৈতে জন্মে তবে ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥
অগণ্য অনন্ত যত অণ্ড সন্নিবেশ।
তত রূপ পুরুষ করে সবাতে প্রবেশ॥
পুরুষের নাসাতে যবে বাহিরায় শ্বাস।
নিশ্বাস সহিতে হয় ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ॥
পুনরপি শ্বাস যবে প্রবেশে অন্তরে।
শ্বাস সহ ব্রহ্মাণ্ড পৈশে পুরুষ শরীরে॥
গবাক্ষের রন্ধ্রে যেন ত্রসরেণু চলে।
পুরুষের লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডের জালে॥

শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত।

এই প্রকার সৃষ্টির কার্য্যভেদে আদি পুরুষ, দ্বিতীয় পুরুষ এবং তৃতীয় পুরুষ অবতারণা করিয়া, অবতার শব্দের অর্থ এই প্রকার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যথা:—

সৃষ্ট্যাদি নিমিত্তে যেই অংশের অবধান।
সেই তো অংশেরে কহি অবতার নাম॥

ইহার ভাবার্থ এই যে, তুরীয় ভগবানের যে একপাদ বা অংশ সৃষ্টিকার্য্য পরিচালন করিবার জন্য অবধান করা হইয়াছে, সেই অংশকে অবতার বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। এক্ষণে এই অবতার সম্বন্ধে ঋক্‌বেদ কি প্রকার বলিতেছেন, একবার মিলন করিয়া বুঝুন।

ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈতপুরুষঃ পাদোঽস্যেহা ভবৎ পুনঃ
ততো বিষঙ্‌ব্যক্রামৎসাশনাশনে অভি ॥

ঋগ্বেদীয় পুরুষ সূক্ত। চতুর্থী।

ইহার অর্থ এই যে, ত্রিপাদ-পুরুষ উর্দ্ধে উদিত রহিয়াছেন। তাঁহার একপাদ মাত্র মায়াতে পুনঃ পুনঃ আসিতেছেন। মায়াতে আসিয়া অনন্তর স্বয়ংই চেতন ও অচেতন বহুল বিবিধরূপী জগৎ হইয়া ব্যাপিয়া রহিয়াছেন।

ত্রিপাদ পুরুষ অর্থে নির্গুণ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। এই নির্গুণ পুরুষের নামান্তর আদিপুরুষ, মহাবিষ্ণু বা আদি নারায়ণ, এক কথায় প্রথম পুরুষ বুঝায়। এই আদিপুরুষকে কেহ কেহ কারণ-শরীরী ব্রহ্ম বা মহাসঙ্কর্ষণ বলেন। বৈষ্ণবগ্রন্থে ইহাকে বলরাম বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই প্রথম পুরুষ মায়াতীত। ইনিই আমাদের বিধাতা পুরুষ, ইনি এই জগৎ সৃষ্টির কর্ত্তা। এই আদিপুরুষের একপাদ মায়ার সহিত মিলিত হইয়া নানাপ্রকার নাম এবং রূপধারণ করতঃ এই চিত্রবিচিত্র জগৎ উৎপন্ন করিয়াছেন।

এই বিষয়টা আর একটু বিস্তার করিবার জন্য ইহার পর মন্ত্র উল্লেখ হইয়াছে যথা :—

তস্মাদিরাড়্‌জায়ত বিরাজো অধিপুরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথোপুরঃ ॥৫॥

ঋগ্বেদীয় পুরুষ সূক্ত। পঞ্চমী।

ইহার অর্থ এই :—

সেই আদিপুরুষ হইতে ব্রহ্মাণ্ড হইল। সেই ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডকেই অধিকরণ করিয়া সেই ব্রহ্মাণ্ড-শরীরাভিমানী কোন এক অনির্ব্বচনীয় পুরুষ স্বয়ং আবির্ভূত হইলেন। তিনি জন্মিয়া দেব, তির্য্যক্ ও মনুষ্যাদি বিবিধরূপ জীবভাব প্রাপ্ত হইলেন। পশ্চাৎ ভূমি সৃষ্টি করিলেন। তৎপশ্চাৎ সপ্তধাতু দ্বারা জীবশরীরসকল নির্ম্মাণ করিলেন।

এই মন্ত্রে পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে, আদিপুরুষ হইতে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হইয়াছে; তাহার পশ্চাৎ ব্রহ্মাণ্ড-শরীরাভিমানী এক স্বয়ম্ভূ পুরুষ আবির্ভূত হইলেন।

এই দ্বিতীয় পুরুষকে বেদে, স্বয়ম্ভূ, হিরণ্যগর্ভ, প্রজাপতি, ব্রহ্মা, বিরাট ইত্যাদি কার্য্য অনুসারে অনেক নামে অভিহিত করা হইয়াছে। পশ্চাৎ এই ব্রহ্মাণ্ড-শরীরাভিমানী পুরুষ বা সমষ্টিবিরাটপুরুষ, ব্যষ্টিভাব ধারণ করতঃ তৃতীয় পুরুষ নামধারণ করিয়া, দেব, তির্য্যক্ ও মনুষ্যাদি বিবিধ রূপ জীবভাব প্রাপ্ত হইলেন।

অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রই বুঝিতে পারেন যে, বেদানুসারে শ্রীভগবান্ গূঢ়ভাবে সর্ব্বভূতে বিরাজিত আছেন। এক্ষণে বৈষ্ণবশাস্ত্রের অবতারবাদ বুঝুন।

শ্রীভগবানের—

"সৃষ্ট্যাদি নিমিত্তে যেই অংশের অবধান।
সেই তো অংশেরে কহে অবতার নাম॥" চৈঃ চঃ।

এই বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে বুঝিতে হইবে, জগতের সর্ব্বভূতেই শ্রীভগবান্ অংশ বা কলা ভাবে, নানা প্রকার রূপ গ্রহণ করিয়া নানাবিধ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া বিরাজিত আছেন। এই অংশ এবং কলা রূপ পুরুষ বৈষ্ণবশাস্ত্রে অবতার নামে খ্যাত হইয়াছেন। এই বিষয়টা শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে, অতি স্পষ্ট ভাবে বর্ণনা আছে, যথা—

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য, কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি, বিরাট্‌স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্ন
অহং ভবো যজ্ঞ ইমে প্রজেশা, দক্ষাদয়ো যে ভবদাদয়শ্চ।
স্বর্লোকপালাঃ খগলোকপালা, নৃলোকপালাস্তললোকপালাঃ॥
গন্ধর্ব্ববিদ্যাধরচারণেশা, যে যক্ষরক্ষোরগনাগনাথাঃ।
যে বা ঋষীণামৃষভাঃ পিতৃণাং, দৈত্যেন্দ্রসিদ্ধেশ্বরদানবেন্দ্রাঃ॥
অন্যে চ যে প্রেতপিশাচভূত-কুষ্মাণ্ডযাদোমৃগপক্ষ্যধীশাঃ।

যৎ কিঞ্চ লোকে ভগবন্মহস্বদোজঃ সহস্বদ্বলবৎক্ষমাবৎ ॥
শ্রীহ্রীবিভূত্যাত্মবদদ্ভূতার্ণং, তত্ত্বং পরং রূপবদস্বরূপম্ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ১।২৬।৪০।৪৩।

"ব্রহ্মা দেবর্ষি নারদকে বলিয়াছিলেন, "বৎস, সেই সর্ব্বাতিশায়ী শক্তি ও স্বরূপ-সম্পন্ন পরমপুরুষ পরমেশ্বরের প্রথম অবতার—পুরুষ (কারণার্ণবশায়ী)। আর কাল, স্বভাব, সৎ ও অসৎ অর্থাৎ কার্য্যকারণাত্মক প্রকৃতি, মন (মহত্তত্ত্ব), দ্রব্য (পঞ্চমহাভূত), বিকার (অহঙ্কারাদি), সত্ত্বাদি গুণ, বিরাট্ (সমষ্টিশরীর), স্বরাট্ (সমষ্টিজীব), স্থাবর, জঙ্গম (ব্যষ্টিশরীর), আমি (ব্রহ্মা), রুদ্র, যজ্ঞ (বিষ্ণু), এই দক্ষাদি প্রজাপতিগণ, তুমি (নারদ) প্রভৃতি দেবর্ষিবৃন্দ, স্বর্লোক-পালকগণ, খগলোকপালকসমূহ, নৃলোক-পালকবৃন্দ ও তললোকপালকগণ গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও চারণসমূহের অধিপতিগণ, যক্ষ, রাক্ষস, সর্প (একমস্তক-বিশিষ্ট) ও নাগ (বহুমস্তকবিশিষ্ট) সমূহের নাথগণ, ঋষি ও পিতৃগণের শ্রেষ্ঠগণ, দৈত্যেন্দ্র, সিদ্ধেশ্বর ও দানবেন্দ্রবৃন্দ, এবং প্রেত, পিশাচ, ভূত, কুষ্মাণ্ড, জলজন্তু, পশু ও পক্ষিগণের অধিপতিগণ, অধিক কি,এই লোকে ঐশ্বর্য্যযুক্ত তেজঃসম্পন্ন, ইন্দ্রিয় মন ও শরীরের পটুতাবিশিষ্ট, ক্ষমান্বিত, শোভা, লজ্জা ও বিভূতি-সংযুক্ত বুদ্ধিমান, আশ্চর্য্যবর্ণসম্পন্ন, অস্মদাদির ন্যায় আকারবিশিষ্ট ও কালাদির ন্যায় আকারশূন্য, যাহা কিছু আছে, সে সমস্তই পরমতত্ত্ব।"

এই প্রসঙ্গে আর একটী বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত বুঝিতে হইবে। বৈষ্ণব-গ্রন্থে বেদোক্ত আদিপুরুষ, দ্বিতীয় পুরুষ এবং তৃতীয় পুরুষকে যথাক্রমে কারণাব্ধি-শায়ী, ক্ষীরোদাব্ধিশায়ী এবং গর্ভোদকশায়ী নামে অভিহিত করিয়া তাহার এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

কারণাব্ধি ক্ষীরোদ গর্ভোদকশায়ী।
মায়াদ্বারে সৃষ্টি করে তাতে সব মায়ী ॥
সেই তিন জন শায়ী সর্ব্ব-অন্তর্য্যামী।
ব্রহ্মাণ্ডবৃন্দের আত্মা যে পুরুষ নামী ॥
হিরণ্যগর্ভের আত্মা গর্ভোদকশায়ী।
ব্যষ্টি জীব অন্তর্য্যামী ক্ষীরোদকশায়ী ॥

এ সবার দর্শনেতে আছে মায়াগন্ধ।
তুরীয় কৃষ্ণের নাহি মায়ার সম্বন্ধ॥

চৈতন্য-চরিতামৃত।

ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, ঋগ্বেদের উপরোক্ত মন্ত্রের আদিপুরুষকে, কারণাব্ধিশায়ী, ব্রহ্মাণ্ডশরীরাভিমানী পুরুষকে বা সমষ্টি হিরণ্যগর্ভপুরুষকে গর্ভোদকশায়ী, এবং ব্যষ্টিজীব-অন্তর্য্যামীপুরুষকে ক্ষীরোদকশায়ীপুরুষ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। উপরোক্ত বর্ণনা দেখিয়া আজকালকার অনেক বাবু পণ্ডিতেরা এই প্রকার এক আপত্তি উত্থাপন করেন যে, বেদের আদিপুরুষকে বৈষ্ণবেরা একটী বিকৃত পৌরাণিক কল্পিত গল্পে পরিণত করিয়াছেন। ইহার প্রত্যুত্তরে বলা যাইতেছে, ইহা পুরাণের কল্পনা নহে। কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদে সপ্তমকাণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে, যথা :—

"আপো বা ইদমগ্রে সলিলমাসীৎ অস্মিন্ প্রজাপতির্ব্বায়ুর্ভূত্বা চরৎ স ইমামপশ্যাৎ তাং বরাহো ভূত্বা হরৎ তাং বিশ্বকর্ম্মা ভূত্বা ব্যমার্ট্ সা প্রথত সা পৃথিব্যভবৎ।"

ইহার ভাবার্থ এই যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র জল বা কারণার্ণব বা একার্ণব ছিল। এই কারণাব্ধিশায়ী পুরুষ, প্রজাপতি নাম গ্রহণ করতঃ বায়ু হইয়া বা বায়ু রূপে পরিণত হইয়া চরৎ অর্থাৎ বিচরণ করিতেছিলেন এবং এই জল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি বিশ্বকর্ম্মা হইয়া, এই জল ব্যমর্ট (অর্থাৎ মন্থন) করিলেন। তাহাতে এই জলের তরলতা দূর হইয়া পৃথিবীর উৎপত্তি হইল; পরে তিনি বরাহরূপ ধারণ করিয়া এই পৃথিবীকে জল হইতে হরণ করিলেন। এই যজুর্ব্বেদের মন্ত্রের সংসৃষ্ট বায়ু, বিশ্বকর্ম্মা এবং বরাহ ঈশ্বরবাচক। কখন ইহার দেব বা জীববাচক বা প্রাকৃতিক পদার্থবাচক অর্থ করিবেন না। যিনি এই প্রকার কদর্থ করেন, তাঁহাদের বেদে অধিকার নাই বলিয়া বুঝিতে হইবে। ইহার বেদপ্রমাণ পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে।

এই প্রকার কারণজল হইতে সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে, ইহা কেবল যে যজুর্ব্বেদে আছে, এমত নহে। ঋক্‌বেদের প্রজাপতি-সূক্তে দেখা যায় ;—

"আপোহ যদ্ বৃহতীর্ব্বিশ্বমায়ম্ গর্ভং দধানা জনয়ন্তীরগ্নিং"

ইহার ভাবার্থ এই যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে সৃষ্টির কারণরূপ "আপোহ বৃহতী বিশ্বমায়ম্" অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী জল ছিল অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে কারণার্ণব ছিল। বৈষ্ণব-গ্রন্থে এই কারণার্ণবশায়ী পুরুষকে প্রথম পুরুষ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, বেদে ইহাকে কারণশরীরী ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। সেই কারণার্ণব অর্থাৎ কারণ শরীরী-ব্রহ্ম বা প্রথম পুরুষের গর্ভ হইতে হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা বা দ্বিতীয় পুরুষ হইলেন। বেদ অনুসারে বলিতে গেলে এই প্রথম পুরুষ অভিন্ননিমিত্তোপাদানস্বরূপ ব্রহ্ম। তাহা হইতে দ্বিতীয় পুরুষ হিরণ্যগর্ভ উৎপত্তি হইল। এস্থলে অগ্নি উপলক্ষ্য মাত্র; কেননা যদি অগ্নির অর্থ তৃতীয় ভূত করা যায়, তবে বেদ অনুসারে অগ্নি হইতে জলের উৎপত্তি হয় বলিতে হইবে, কিন্তু জল হইতে কখনও অগ্নি উৎপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং এ স্থলে অগ্নি, ঈশ্বর বা পুরুষবাচক; অর্থাৎ প্রথম পুরুষ হইতে দ্বিতীয় পুরুষ ও দ্বিতীয় পুরুষ হইতে তৃতীয় পুরুষ এইরূপ যথাক্রমে সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ তৈত্তিরীয় শাখার আরণ্যক-কাণ্ডে প্রথম প্রপাঠকের ত্রয়োবিংশতি অনুবাকে দেখা যায়:—

"আপোবা ইদমাসন্ৎ সলিলমেব। স প্রজাপতিরেবঃ পুষ্কর পর্ণে সমভবৎ। তস্যান্তর্মনসি কামঃ সমবর্ত্তত ইদং সৃজেয়মিতি।"

"সৃষ্টির পূর্ব্বে জল ছিল। তৎপরে প্রজাপতি একটি পদ্মপত্রে আবির্ভূত হইলেন। আমি সৃষ্টি করিব, তাঁহার এই প্রকার কামনা হইল।"

এই সমস্ত বচনে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, অবতারবাদ বেদ, উপনিষদ এবং যুক্তিসঙ্গত।

এক্ষণে আর একটী অতি গুরুতর প্রশ্ন, অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি এই ভাবে উত্থাপন করেন যে, যখন বেদ, উপনিষদ এবং অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রসকলে এক স্থানের সহিত অন্য স্থানের বা এক শাস্ত্রের সহিত অন্য শাস্ত্রের বিরোধ রহিয়াছে, তখন এই বেদপ্রমাণকে স্বতঃ প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য করিব কেন? দৃষ্টান্ত স্থলে দেখা যাইতেছে যে, এক সৃষ্টি প্রকরণে বেদ, উপনিষদ এবং ষড়-

দর্শনে নানা প্রকার মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকার বৈদিক শাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক তর্ক বিতর্ক সচরাচর হইয়া থাকে, এই সমস্ত বাদ প্রতিবাদের মীমাংসা করিতে হইলে, বাদী এবং প্রতিবাদীদিগকে কয়েকটী বিধির অনুশাসনে চলিতে হয়। অতি সংক্ষেপে এই বিষয়ের অবতারণা করা হইল।

তত্ত্ববিচার বা বাদপ্রতিবাদ।

কোন এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মতের সহিত অন্য কোন সম্প্রদায়ের মতভেদ হইতে দেখিলে, রজঃপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বিরোধী-সম্প্রদায়ের মত খণ্ডন করিয়া নিজ সম্প্রদায়ের মত মণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। এই সমস্ত উগ্র প্রকৃতির লোকদিগের বুঝা উচিত যে, জীব, প্রকৃতি এবং ঈশ্বর এই তিন মৌলিক তত্ত্বের বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, কয়েকটী নিয়মের অধীন হইয়া চলিতে হয়, অর্থাৎ বিচার সত্য কি মিথ্যা হইল, তাহার প্রমাণ প্রথমতঃ স্থির করিতে হয়। তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ এই প্রমাণসকল সংক্ষেপে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রত্যক্ষ অনুমান এবং শাব্দ বা আপ্তবাক্য, এই তিন শ্রেণীর প্রমাণের উপর নির্ভর করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাহার মধ্যে প্রত্যক্ষ এবং অনুমান, জীব, প্রকৃতি এবং ঈশ্বরবিষয়ক বিচারে গ্রাহ্য নহে, কেন না, এই সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের অতীত, সুতরাং শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা যে বাক্য নিষ্পন্ন হয়, তাহাই প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিতে হয়। আর শাস্ত্র অর্থে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিগণের পক্ষে সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ প্রমাণ বলিয়া বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রয়োজক মুনিগণ যথা—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীৎ, যাজ্ঞবল্ক্য, উশন, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বশিষ্ঠ ইত্যাদি ঋষি-প্রণীত গ্রন্থ ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া বুঝিতে হইবে। যথা :—

মন্বত্রিবিষ্ণুহারীত যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ,
যমাপস্তম্ব সংবর্ত্তাঃ কাত্যায়ন বৃহস্পতি।

পরাশর ব্যাস শঙ্খ লিখিতা দক্ষ গৌতমা,
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রয়োজকাঃ ॥

ইহার মধ্যে আর এক সূক্ষ্ম বিচার করিতে হইবে যে, এই সমস্ত শাস্ত্র-কর্ত্তাদের প্রণীত যে সমস্ত শাস্ত্র সূত্ররূপে লিখিত হইয়াছে, তাহার ব্যাখ্যা ব্যতীত কেহ বুঝিতে পারে না, সুতরাং ভাষ্যকারদিগের প্রকৃতি এবং অভি-প্রায়ের উপর শাস্ত্রের অর্থ নির্ভর করে; একারণ কোন্ শাস্ত্রের কোন্ ভাষ্য-কারের ব্যাখ্যা প্রামাণ্য, তাহা বিচার করিয়া নির্ব্বাচন করা এক দুরূহ ব্যাপার; কিন্তু বিশেষ নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলে ইহার অনেকটা বুঝা যায়। ইহা বুঝিতে হইলে এই ভাবে বুঝিতে হইবে :—

যেরূপ ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব, এই চারিটী বেদ ঈশ্বর-কৃত বলিয়া প্রামাণ্য, তদ্রূপ, ঐতরেয়, শতপথ, সাম ও গোপথ, যথাক্রমে চারিবেদের এই চারিটী ব্রাহ্মণ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নির্ঘণ্ট, নিরুক্ত, ছন্দ এবং জ্যোতিষ এই ছয়টি বেদাঙ্গ বলিয়া বুঝিতে হইবে। মীমাংসা, ন্যায়, সাংখ্য ইত্যাদি ছয় খানি দর্শন, বেদের উপাঙ্গ বলিয়া বুঝিতে হইবে। আবার আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ এবং অথর্ব্ববেদ এই চারিটীকে বেদের উপবেদ বলে। এই সমস্ত গ্রন্থ ঋষি-প্রণীত বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই বিষয় অন্য ভাবে বলিতে গেলে এই ভাবে বলিতে হয় যে, বেদ ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়া মানিলেই স্বীকার করিতে হইবে যে, ঈশ্বর-বাক্যই বেদ, সুতরাং বেদের প্রমাণই "স্বতঃ প্রমাণ" অর্থাৎ অভ্রান্ত সত্য এবং বেদের প্রমাণ বেদ হইতেই জানিতে হইবে, টীকাকারগণের মনো-মত অর্থ মানিলে চলিবে না। ইহার ভাবার্থ এই যে, বেদপাঠ করিতে করিতে কোন স্থানের কোন অভিপ্রায় দুর্বোধ হইলেও স্থানান্তরে এই বেদের ভিতর ইহার ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আর যে সমস্ত ব্যক্তি মনে করেন যে, ভিন্ন ভিন্ন বেদ, এক অপর হইতে বিরোধী মত প্রকাশ করিতেছে, শ্রুতিসকলও এক অপর হইতে বিরোধী মত প্রচার করিতেছে, শাস্ত্রকর্ত্তা মুনিদিগের মত এক হইতে অপর বিরোধী, এই প্রকার বুদ্ধিযুক্ত লোকের সহিত কখনও কোন ঈশ্বরবাদী ব্যক্তির, বিচার করা দূরে থাকুক, কোন সংশ্রব পর্য্যন্ত রাখা উচিত নহে, কারণ চারিবেদ ঈশ্বর-

প্রণীত; ঈশ্বর-বাক্যে কখনও "বদতো ব্যাঘ্যাৎ" অর্থাৎ এক বাক্য একবার খণ্ডন আবার মণ্ডন হয় না। যে ব্যক্তি এই প্রকার ভ্রম প্রমাদাদি দোষ ঈশ্বর-বাক্যে আরোপ করে, সে বিষ্ণু-নিন্দাপরাধে অপরাধী। এই প্রকার চারিটী ব্রাহ্মণ, ছয়টী বেদাঙ্গ, ছয়টী উপাঙ্গ, এবং চারিটি উপবেদ, ইহাদের কোন শাস্ত্র এক অপর হইতে কখনও বিরোধী হইতে পারে না। যে স্থলে বিরোধ উপস্থিত হইবে, তখনই বুঝিবে, ভাষ্যকার বা টীকাকারদিগের দোষে এই প্রকার ঘটিয়াছে, অথবা যদি এই সমস্ত শাস্ত্রের কোন অংশ বেদের সহিত ঐক্য না হয়, তবে তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে; কেন না, বেদ স্বতঃ প্রমাণ এবং ব্রাহ্মণাদি ঋষি-প্রণীত গ্রন্থ "পরতঃ প্রমাণ" বলিয়া বুঝিতে হইবে। এক্ষণে কোন্ গ্রন্থে কাহার ভাষ্য, নিরপেক্ষ ভাবে লিখিত হইয়াছে, বৈদিক পণ্ডিতগণ তাহার এক প্রকার মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। সর্ব্ব-বেদাচার্য্য শ্রীল দয়ানন্দ সরস্বতী মহাশয় এই মত সমর্থন করেন। পূর্ব্ব-মীমাংসার উপর ব্যাস মুনি-কৃত ব্যাখ্যা, বৈশেষিকের সহিত গৌতমমুনি-কৃত ব্যাখ্যা, ন্যায়সূত্রের সহিত বাৎস্যায়ন মুনি-কৃত ভাষ্য, পতঞ্জলীর সূত্রের সহিত ব্যাসমুনি-কৃত ভাষ্য, কপিল-মুনি-কৃত সাঙ্খ্যসূত্রের সহিত ভাগুরিমুনিকৃত ভাষ্য এবং ব্যাসমুনির কৃত বেদান্ত-সূত্রের সহিত বাৎস্যায়ন মুনি-কৃত ভাষ্য অথবা বৌদ্ধায়ন মুনিকৃত ভাষ্যবৃত্তি সহিত পড়িবে; তাহা হইলে শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। পরে, আপন আপন ভাবে, শাস্ত্রের মৌলিক অভিপ্রায় পরিবর্ত্তন না করিয়া, উপাসক-সম্প্রদায় তাহার বিশদ ব্যাখ্যা সাম্প্রদায়িক ভাবে করিলে কোন দোষ হয় না।

আবার ইহার বিপরীত, মীমাংসা সম্বন্ধে, ধর্ম্মসিন্ধু ও ক্রতাকাদি, বৈশেষিক সম্বন্ধে তর্ক-সংগ্রহাদি, ন্যায় সম্বন্ধে জাগদিশী প্রভৃতি, যোগবিষয়ে হঠদীপিকাদি, সাংখ্যবিষয়ে সাঙ্খ্যতত্ত্ব-কৌমুদী প্রভৃতি, বেদান্তবিষয়ে যোগবাশিষ্ঠ ও পঞ্চদশ্যাদি গ্রন্থ পাঠ করিলে, কেহ কখনও কোন তত্ত্বের প্রকৃত সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিতে পারিবেন না। কেন না, তাহা হইলে শাস্ত্রে শাস্ত্রে বিরোধ উপস্থিত হইবে।

আবার যাঁহারা মীমাংসক নহেন, তাঁহারা শাস্ত্রে শাস্ত্রে বিরোধ উপস্থিত করেন। দৃষ্টান্ত স্থলে দেখান যাইতেছে, যেমন সৃষ্টি-প্রকরণ সম্বন্ধে ছয়টি দর্শন-শাস্ত্রের মত লইয়া, এক অপরের বিরোধ বলিয়া কলহ উপস্থিত করেন।

তাঁহারা বলেন যে, মীমাংসামতে কর্ম্ম হইতে, ন্যায়মতে পরমাণু হইতে, বৈশেষিক মতে কাল হইতে, যোগশাস্ত্র মতে পুরুষার্থ হইতে, সাংখ্যমতে প্রকৃতি হইতে এবং বেদান্তমতে ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, সুতরাং এক দর্শন অপর দর্শন হইতে বিরোধী ; কিন্তু মীমাংসকের দৃষ্টিতে ইহাতে কোন বিরোধ নাই, কেননা বিচার করিলে বুঝা যায় যে, মনুষ্য যতই বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন হউক না কেন, যতদিন তাহাদের বাহ্য-প্রতীতি থাকিবে, ততদিন কাহারও নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান বা স্বয়ংপ্রভাজ্ঞান (Positive knowledge) হইতে পারে না। ব্যক্তি মাত্রকেই সাপেক্ষ জ্ঞানে জ্ঞানী বলিয়া বুঝিবে। সকলের স্বয়ং-প্রভাজ্ঞান হয় না ; ইহার ভাবার্থ এই যে, বাহ্যজগৎ পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং এই পরিবর্ত্তনশীল বাহ্যজগৎকে সাপেক্ষ করিয়া ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক আমাদের যে জ্ঞান হয়, তাহা ধ্রুবজ্ঞান বা নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান কথনও হইতে পারে না। কাজে কাজেই কোন মনুষ্যের জ্ঞানকে স্বতঃ প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। এক্ষণে যাহার কিছুমাত্র বিচার শক্তি আছে, তিনি বুঝুন যে, একটি আদর্শ স্বতঃসিদ্ধ সত্যজ্ঞানের আধার স্থির না করিতে পারিলে, কেহ কথনও কোন বিচারে বা কোন বস্তু-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। এই জন্য হিন্দু বেদকে, মুসলমান কোরাণকে, খ্রীষ্টয়ান বাইবেলকে, আদর্শ স্বতঃসিদ্ধ সত্য গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাঁহারা কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক গ্রন্থকে সত্য বলিয়া গ্রহণ না করেন, তাঁহাদিগকেও একটি সত্যের আদর্শ স্থির করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হয়। যাঁহারা এই নীতির অনুবর্ত্তী হইয়া আদর্শ সত্য নির্দ্ধারিত না করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা বিচারের যোগ্য ব্যক্তি নহে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

এক্ষণে উপরোক্ত যুক্তি অনুসারে, ষড়দর্শনের বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইলে প্রথমে বুঝিতে হইবে, ষড়দর্শন যথন বেদের উপাঙ্গ মধ্যে পরিগণিত, তথন, ইহা বেদের প্রতিকূল কথনও হইতে পারে না, আর দর্শনে দর্শনে যদি বিরোধ হয়, তবে ষড়দর্শন কথনও বেদের উপাঙ্গ হইতে পারে না। এই প্রকার দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া সৃষ্টিপ্রকরণ বুঝিতে গেলে, বুঝিতে পারা যায় যে, কর্ম্ম, কাল, পরমাণু, পুরুষার্থ, প্রকৃতি, এবং ব্রহ্ম, এই ছয়টি কারণের

সমবায় না হইলে, কখনও ঘট-পটাদি পর্য্যন্ত সৃষ্টি হয় না। অতএব জগৎ সৃষ্টি-প্রকরণে ইহাদের সমাবেশ না হইলে চলে না, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

এক্ষণে যাঁহার বিচার শক্তি আছে, তিনি বুঝিতে পারেন, কর্ম্ম, কাল, পরমাণু, পুরুষার্থ, প্রকৃতি এবং ব্রহ্ম এই ছয় কারণের বিশেষ ব্যাখ্যা যথাক্রমে মীমাংসা, বৈশেষিক, ন্যায়, যোগ, সাংখ্য এবং বেদান্ত এই ছয় খানি পৃথক্ পৃথক্ দর্শনশাস্ত্রে রহিয়াছে। এইরূপ বিচারে আর কোন বিরোধ থাকে না। যখন বিরোধশূন্য হইবে, তখন এই ছয় শাস্ত্রকে বেদের উপাঙ্গ বলিয়া স্বীকার করা যায়। এই বিষয়টা আর একটু বিশদ ভাবে বুঝিতে গেলে, জীব, প্রকৃতি এবং ঈশ্বর এই তিন তত্ত্বের বিচার ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, অনেক শাস্ত্রের গূঢ় তাৎপর্য্য বুঝা যায়। বেদে জীব, প্রকৃতি এবং পরমেশ্বর এই তিন তত্ত্ব নিত্য এবং চিরস্বতন্ত্র, এ সম্বন্ধে বিচার যথা :—

ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আ বভূব যদি বা দধে যদি বা ন। যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্‌ৎসো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ॥১॥

তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রে প্রকেতং সলিলঃ সর্ব্বমা ইদম্। তুচ্ছেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনা জায়তৈকম্ ॥২॥

ঋঃ ।মঃ ১০। সূঃ ১২৯। মং ৭।৩

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥৩।

৩ ঋঃ ।মঃ ১০। সূঃ ১২১। মঃ ১॥

পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদভূতং যচ্চ ভাব্যম্। উতামৃতত্বস্যে-শানো যদন্নেনাতিরোহতি ।৪॥

যজুঃ। অঃ ৩১। মঃ ২॥

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি। যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম ॥৫॥

তৈত্তিরীয়োপনিষদ ভৃগুবল্লীঃ। অনুঃ ১॥

হে (অঙ্গ) মনুষ্য ! যাঁহা হইতে বিবিধ সৃষ্টি প্রকাশিত হইয়াছে, যিনি ধারণ এবং প্রলয় করেন, যিনি এই জগতের স্বামী, যিনি ব্যাপক বলিয়া যাঁহাতে এই সমস্ত জগৎ উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয় প্রাপ্ত হয়, তিনিই পরমাত্মা এবং তাঁহাকে তুমি জান এবং অপরকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিও না ॥১॥ এই সৃষ্টির পূর্ব্বে এই সমস্ত জগৎ অন্ধকারাবৃত ; রাত্রিকালে অজ্ঞেয় আকাশের ন্যায় তুচ্ছ অর্থাৎ অনন্ত পরমেশ্বরের সম্মুখে একদেশস্থ হইয়া আচ্ছাদিত ছিল। পশ্চাৎ পরমেশ্বর আপনার সামর্থ্য দ্বারা কারণরূপ হইতে কার্য্যরূপ করিয়াছেন ॥২॥ হে মনুষ্যগণ ! যিনি সমস্ত সূর্য্যাদি তেজস্বী পদার্থের আধার, যিনি ভূত এবং ভবিষ্যৎ জগতের এক অদ্বিতীয় পতি, যিনি জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন এবং যিনি এই পৃথিবী হইতে সূর্য্যলোক পর্য্যন্ত জগৎ উৎপন্ন করিয়াছেন, সেই পরমাত্মা দেবকে প্রেমপূর্ব্বক ভক্তিপ্রদর্শন কর ॥৩॥ হে মনুষ্যগণ ! যিনি সর্ব্ববিষয়ে পূর্ণ পুরুষ, যিনি নাশরহিত কারণ, যিনি জীবের স্বামী এবং যিনি পৃথিব্যাদি জড় হইতে এবং জীব হইতে অতিরিক্ত, সেই পুরুষই এই সকল ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান জগৎ রচনা করিয়াছেন ॥৪॥ যে পরমাত্মার রচনা বশতঃ এই সমস্ত পৃথিব্যাদি ভূত ও জীব উৎপন্ন হইতেছে এবং যাহাতে প্রলয়প্রাপ্ত হয়, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহাকেই জানিবার ইচ্ছা কর ॥৫॥

জন্মাদ্যস্য যতঃ ॥

শারীরিকসূত্র, অঃ ১। পাঃ ১ সূঃ ২॥

যাঁহা হইতে এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয় হয়, সেই ব্রহ্মই জানিবার যোগ্য।

জীব বা জীবাত্মা এবং পরমাত্মা বা পরমেশ্বর যে চির স্বতন্ত্র, তাহার বৈদিক যুক্তি যথা—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি।

ঋঃ মঃ ১। সূঃ ১৬৪। মঃ ২০॥

শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥২॥

যজুঃ অঃ ৪০। মঃ ৮॥

(বা) ব্রহ্ম এবং জীব এই উভয় (সুপর্ণা) চেতনতা এবং পালনাদি গুণ বশতঃ সদৃশ, (সযুজা) ব্যাপ্য ব্যাপকভাব হইতে সংযুক্ত এবং (সখায়া) পরস্পর মিত্রতাযুক্ত হইয়া যেরূপ সনাতন ও অনাদি এবং (সমানম্) তদ্রূপ (বৃক্ষম্) অনাদি মূলরূপ কারণ এবং শাখারূপ কার্য্যযুক্ত বৃক্ষ অর্থাৎ যাহা স্থূল হইয়া প্রলয় কালে ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়, উহাও তৃতীয় অনাদি পদার্থ। এই তিনের গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাবও অনাদি। জীব ও ব্রহ্ম এই উভয়ের মধ্যে জীব এই বৃক্ষরূপ সংসারে পাপপুণ্য রূপ ফল (স্বাদ্বত্তি) উত্তমরূপে ভোগ করে এবং দ্বিতীয় পরমাত্মা কর্ম্মফল (অনশ্নন্) ভোগ না করিয়া চারিদিকে অর্থাৎ ভিতরে বাহিরে এবং সর্ব্বত্র প্রকাশমান হইয়া আছেন। জীব হইতে ঈশ্বর, ঈশ্বর হইতে জীব এবং উভয় হইতে প্রকৃতি ভিন্নস্বরূপ এবং এই তিনিই অনাদি ॥১॥ (শাশ্বতীঃ) অর্থাৎ পরমাত্মা অনাদি সনাতন জীবরূপ প্রজাদিগের জন্য বেদ দ্বারা বিদ্যার বোধ করিয়াছেন ॥২॥

জীব, প্রকৃতি এবং পরমাত্মা বা পরমেশ্বর যে নিত্য, তাহার উপনিষদের প্রমাণ ঃ—

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজোহ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ ॥

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ। অঃ ৪। মঃ ৫।

প্রকৃতি, জীব এবং পরমাত্মা এই তিনিই অজ অর্থাৎ ইহারা কখনও জন্মগ্রহণ করে না। অর্থাৎ এই তিনই সমস্ত জগতের কারণ এবং ইহাদের কোন কারণ নাই। অনাদি জীব এই অনাদি প্রকৃতির ভোগ করতঃ আসক্ত হয়, কিন্তু উক্ত পরমাত্মা ইহার ভোগও করেন না এবং ইহাতে আসক্তও হয়েন না।

প্রকৃতির লক্ষণ।

শাঙ্খসূত্রের মত—

সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ, প্রকৃতের্মহান্ মহতোঽহঙ্কারোঽহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং পঞ্চতন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ ॥

শাঙ্খসূত্রঃ ॥ অঃ ১। সূঃ ৬১ ॥

(সত্ত্ব) শুদ্ধ, (রজঃ) মধ্য, (তমঃ) জাড্য অর্থাৎ জড়তা এই তিনবস্তু মিলিত হইয়া যে সংঘাত হয়, উহার নাম প্রকৃতি। উহা হইতে মহত্তত্ত্ব বুদ্ধি, তাহা হইতে অহঙ্কার, তাহা হইতে পঞ্চতন্মাত্র সূক্ষ্মভূত, দশ ইন্দ্রিয় এবং একাদশ মন, পঞ্চতন্মাত্র হইতে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব উৎপন্ন হইয়াছে এবং পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব পুরুষ অর্থাৎ জীব এবং পরমেশ্বর। ইহার মধ্যে প্রকৃতি অবিকারিণী। মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার এবং পঞ্চ সূক্ষ্মভূত ইহারা প্রকৃতির কার্য্য এবং ইন্দ্রিয়দিগের, মনের ও স্থূলভূতের কারণ। পুরুষ কাহারও প্রকৃতি, উপাদান কারণ, অথবা কার্য্য নহে।

ইহাদ্বারা বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রই বুঝুন যে, ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ এবং উপনিষদ দ্বারা সপ্রমাণ হইল, জীব, প্রকৃতি এবং পরমেশ্বর নিত্য পদার্থ এবং এক অপর হইতে পৃথক্ বটে, কিন্তু নিত্যসহচর। কিন্তু একদেশদর্শী ব্যক্তিগণ কি প্রকার শাস্ত্রে শাস্ত্রে বিরোধ উপস্থিত করেন, তাহাই দেখান যাইতেছে,—

সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ ॥

ছান্দোগ্য, প্রঃ ৬। খঃ ২॥

এইটি ছান্দোগ্য উপনিষদের বচন, ইহার অর্থ এই যে, এই জগৎ পূর্ব্বে সৎ ছিল।

অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ ॥

তৈত্তিরীয়োপনিষদ, ব্রহ্মানন্দবল্লী। অনুঃ ৭॥

এইটী তৈত্তিরীয় উপনিষদের বচন, ইহার অর্থ—পূর্ব্বে এই জগৎ অসৎ ছিল।

আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ ॥

বৃহঃ।অঃ ১। ব্রঃ ৪॥ মঃ ১ ॥

এইটি বৃহদারণ্যক উপনিষদের বচন, ইহার অর্থ—পূর্ব্বে এই জগৎ আত্মা ছিল।

ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ ॥

শতঃ ১১।১।১১।১॥

এইটি শতপথ ব্রাহ্মণের বচন, ইহার অর্থ—পূর্ব্বে এই জগৎ ব্রহ্মরূপে ছিল।

পশ্চাৎ—

তদৈক্ষত বহুঃ স্যাং প্রজায়েয়েতি।

সোঽকাময়ত বহুঃ স্যাং প্রজায়েয়েতি ॥

তৈঃ উপঃ। ব্রহ্মানন্দবল্লী। অনুঃ ৬॥

ইহা তৈত্তিরীয় উপনিষদের বচন, ইহার অর্থ—উক্ত ব্রহ্ম বা পরমাত্মা আপনার ইচ্ছাবশতঃ বহুরূপ হইয়াছেন।

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥

ইহাও উপনিষদের বচন। এই যে সমস্ত জগৎ আছে, উহা নিশ্চিতরূপে ব্রহ্ম। উহাতে দ্বিতীয় নানাপ্রকারের কোন পদার্থ নাই, পরন্তু উহা সমস্তই ব্রহ্ম।

এক্ষণে বিচারক্ষম ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে, কুতার্কিকগণ স্ব স্ব অনুকূল অর্থে বচন উদ্ধৃত করিয়া শাস্ত্রে শাস্ত্রে বিরোধ প্রদর্শন করতঃ সাধারণের নিকট আজকাল শাস্ত্রবাক্যসকল অশ্রদ্ধেয় বলিয়া ভ্রম জন্মাইয়া দিতেছেন। যাহা হউক, মীমাংসকগণ, ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদেব এই সমস্ত বচনের অর্থ করিবার সময় মনে করিবেন যে, উপনিষদের অর্থ যদি মূল বেদ-বিরোধী হয়, তবে উপনিষদের বাক্য সাধারণে পরিত্যাগ করিবে, সুতরাং ইহার অর্থ বেদ অনুকূল হওয়া আবশ্যক। এই যুক্তি অনুসারে তাঁহারা উপনিষদ-সকল বিশেষ গবেষণার সহিত পড়িতে আরম্ভ করিলে দেখিতে পাইবেন যে, ছান্দোগ্য উপনিষদে "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে

এই জগৎ সৎ ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। স্থানান্তরে সেই ছান্দোগ্য উপনিষদ বলিতেছেন ঃ—

এবমেব খলু সোম্যান্নেন শুঙ্গেনাপো মূলমন্বিচ্ছাদ্ভিঃ সোম্য শুঙ্গেন তেজোমূলমন্বিচ্ছ তেজসা সোম্য শুঙ্গেন সন্মূলমন্বিচ্ছ সমূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ ॥

ছান্দোঃ প্রঃ ৬। খঃ ৮। মঃ ৪।

হে শ্বেতকেতো! তুমি অন্নরূপ পৃথিবী কার্য্য হইতে জলরূপ মূল কারণ জানিবে। কার্য্যরূপ জল হইতে তেজোরূপ মূল এবং তেজোরূপ কার্য্য হইতে সদ্রূপ কারণ প্রকৃতিকে জানিবে। উক্ত সত্যস্বরূপ প্রকৃতি সমস্ত জগতের মূলগৃহ এবং স্থিতির স্থান ॥

এই প্রকার বিচারে উপরোক্ত চারিখান উপনিষদের বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করিয়া এই প্রকার মণ্ডন করিতে হইবে যে, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ-সৃষ্টির পূর্ব্বে অর্থাৎ মহাপ্রলয় অবস্থায় "অসতের সদৃশ হইয়া, অর্থাৎ বিকাশশূন্য অবস্থার মনের অতীত হইয়া জীবাত্মা, ব্রহ্ম এবং প্রকৃতিতে লীন থাকিয়া, "সৎ" অর্থাৎ বর্ত্তমান ছিল, এবং ইহার অভাব ছিল না। এই সৎবস্তুকে শাস্ত্রে ব্রহ্ম বলে ; পশ্চাৎ তাঁহার ইচ্ছায় তিনি বহু হইয়াছেন। কি প্রকারে ব্রহ্ম বহু হইলেন, তাহার বিচার পরে দেখান হইবে। তাহার পর "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইহাও কুতার্কিকগণ, সম্বন্ধশূন্য দুইটি উপনিষদ হইতে দুইটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া, নবীন অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন "সর্ব্বং খল্বিদম্ ব্রহ্ম" ইহা ছান্দোগ্য উপনিষদের অসম্পূর্ণ পাঠ। ইহার পরবর্ত্তী পাঠ "তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত" ইহার অর্থ এই যে, হে জীব! তুমি ব্রহ্মের উপাসনা কর, যে ব্রহ্ম জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং জীবন হয়েন এবং যাঁহার নির্ম্মাণ এবং ধারণা বশতঃ জগৎ বিরাজিত রহিয়াছে অথবা ব্রহ্মের সহচরিত রহিয়াছে, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অপরের উপাসনা করিবে না। তাহার পর "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইহা কঠোপনিষদের সম্বন্ধশূন্য বাক্য, ইহার ভাবার্থ এই যে, উক্ত চেতন মাত্র, অখণ্ডৈকরস, ব্রহ্মরূপ, ইহা নানা বস্তুর সমষ্টি নহে, কিন্তু সমস্ত বস্তু পৃথক্ পৃথক্ ভাবে, পরমেশ্বর রূপ আধারে অবস্থিত। উক্ত বচনের পূর্ব্বাপর পদ এই ;—

মনসৈ বেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুঙ্গচ্ছতি য় ইহ নানেব পশ্যতি ॥১১॥

কঠোপনিষৎ, ৪র্থ বল্লী।

এই বিষয়টা আর একটু বিশদ ভাবে বুঝিতে গেলে, সৃষ্টিকারণতত্ত্ব একটু ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। "কারণ" তিন প্রকার—প্রথমতঃ নিমিত্ত-কারণ, দ্বিতীয়তঃ উপাদান-কারণ, তৃতীয়তঃ সাধারণ-কারণ।

১ম। পরমেশ্বর জগৎ-সৃষ্টির মৌলিক নিমিত্ত-কারণ বা কর্ত্তা; মনুষ্যাদি জীবগণ, ঘটপটাদি নানাবিধ পদার্থ প্রস্তুত করে বলিয়া জীবকেও নিমিত্ত-কারণ বলা যায়। কোন বীজ জমিতে বপন করিলে, শীত, উষ্ণ, আর্দ্র, শুষ্কাদিদ্বারা, জড়পদার্থ যে বীজ, তাহা হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন করে বলিয়া এই জড়পদার্থকেও সমবায়ী ভাবে নিমিত্ত-কারণ বলা যায়।

২য়। যাহা ব্যতিরেকে কিছু নির্ম্মাণ হয় না, যাহার অবস্থান্তর প্রাপ্তি হইয়া বস্তু নির্ম্মিত হয়, এবং যাহা বিকৃত হয়, তাহাকে উপাদান-কারণ বলে। জগৎ সৃষ্টির এই উপাদান-কারণ প্রকৃতি ও পরমাণু, ইহারা জড়, সুতরাং ইহারা স্বয়ং নির্ম্মিত বা বিকৃত হইতে পারে না, পরমেশ্বর এবং জীব ইহাদিগকে নির্ম্মাণ এবং বিকৃত করিতে পারেন।

৩য়। যখন কোন বস্তু নির্ম্মিত হয়, তখন যে যে সাধন হইতে নির্ম্মিত হয়, অর্থাৎ জ্ঞান, দর্শন, বল, হস্ত এবং অন্যান্য নানাবিধ সাধন, এবং দিক্, কাল, আকাশ, ইহারা সাধারণ-কারণ।

দৃষ্টান্ত দেখান যাইতেছে,—কুম্ভকার নিমিত্ত-কারণ, মৃত্তিকা উপাদান-কারণ এবং দণ্ডচক্রাদি সামান্য-কারণ। তাহার পর দিক্, কাল, আকাশ, প্রকাশ, চক্ষু, হস্ত, জ্ঞান ও ক্রিয়া আদি নিমিত্ত-কারণ ও নিমিত্ত-সাধারণ-কারণও বলা যায়। যাহা হউক, এই তিনটী কারণ ব্যতীত কোন বস্তু নির্ম্মাণ ও বিকৃত হইতে পারে না। সুতরাং এই কারণ-তত্ত্ব ভাল করিয়া মনে রাখিতে পারিলে, নবীন বৈদান্তিকদিগের মতানুযায়ী পরমেশ্বরকে সৃষ্টির নিমিত্ত এবং উপাদান-কারণ বলিয়া মনে হইবে না।

এই শ্রেণীর কুতার্কিকগণ বলেন যে,—

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ ॥

মুণ্ডকোপনিষৎ, মুঃ ১।মঃ ১।মঃ ৭।

ইহা মুণ্ডক উপনিষদের বচন। ইহার অর্থ এই যে, মাকড়সা যেরূপ বাহির হইতে কোন পদার্থ গ্রহণ করে না, কিন্তু নিজের অবয়ব হইতে তন্তু নির্গত করিয়া জাল নির্ম্মাণ করিয়া স্বয়ংই উহাতে ক্রীড়া করে, তদ্রূপ ব্রহ্মা আপনা হইতে জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া নিজে জগদাকার হইয়া স্বয়ংই ক্রীড়া করিতেছেন। উক্ত ব্রহ্ম, ইচ্ছা এবং কামনা করিলেন যে, "আমি বহুরূপ অর্থাৎ জগদাকার হইব" এবং মাত্র তাদৃশ সঙ্কল্প হইতেই সমস্ত জগদ্রূপ রচিত হইল।

এই বচন কখনও অদ্বৈতবাদের পোষক হইতে পারে না, অর্থাৎ প্রকৃতিকে জগতোপাদান-কারণ না বলিয়া যদি পরমেশ্বরকে সৃষ্টির নিমিত্ত এবং উপাদান-কারণ বলিয়া স্থির হয়, তবে জগৎ বিকারী, পরিণামী বা অবস্থান্তরযুক্ত দোষে দোষী হইয়া পড়েন। ইহা ব্যতীত মাকড়সার জড়রূপ শরীর, অন্য কথায়, প্রকৃতিই, তন্তুর উপাদানের কারণ। জীব বা জীবাত্মা নিমিত্ত-কারণ, পরমেশ্বর মৌলিক সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহার সৃষ্টির বিচিত্রতা এই যে, তিনি অন্য জীবকে এপ্রকার ক্ষমতা না দিয়া, মাত্র মাকড়সাকে দিয়াছেন।

অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিবার গৌড়পাদীয়-কারিকার একটি বচন, যথা :—

আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তত্তথা।

গৌরপাদীয় কারিকা, শ্লোক ৩২ ॥

ইহা মাণ্ডুক্যোপনিষদের উপর কারিকা। যাহা প্রথমে ছিল না এবং অন্তে থাকিবে না, উহা বর্ত্তমানেও নাই। অতএব যখন সৃষ্টির আদিতে জগৎ ছিল না, এবং অন্তে যখন সংসার থাকিবে না, তখন বর্ত্তমানে সমস্ত জগৎ কেন ব্রহ্ম নহে?

ইহাতেও পরমেশ্বরের বিকারী বা পরিণামী ইত্যাদি অনেক দোষ হয়। জগৎ পূর্ব্বে ছিল না, ইহার প্রমাণাভাব।

তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রে ॥

ঋঃ। মঃ ১০। সূঃ ১২৯ ॥

আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্ ।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ ॥

মনুঃ ১। ৫ ॥

ইহার ভাবার্থ এই যে, এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রলয়কালে অন্ধকারে আবৃত ছিল, প্রসিদ্ধ লক্ষণ দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের উপলব্ধি করিবার যোগ্য ছিল না, কিন্তু বর্ত্তমান কালে সৃষ্টি জগৎপ্রসিদ্ধ চিহ্নযুক্ত বলিয়া জ্ঞাত হইবার যোগ্য হইয়াছে। অতএব গৌড়পাদীয় কারিকাকার-লিখিত জগতের বর্ত্তমানেও অভাব ; ইহা সম্পূর্ণ অপ্রমাণিত।

এই প্রকার বেদবিরোধী অনেক প্রকার নাস্তিক আছে, তাহাদের মধ্যে পাঠকগণের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত সঙ্ক্ষেপে কয়েক প্রকারের উল্লেখ করা গেল।

১। শূন্যং তত্ত্বং ভাবো বিনশ্যতি বস্তুধর্ম্মত্বাদ্বিনাশস্য ॥

সাংখ্য দঃ অঃ ১ ॥ সূঃ ৪৪ ॥

২। অভাবাৎ ভাবোৎপত্তির্নানুপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাৎ ॥

৩। ঈশ্বরঃ কারণম্ পুরুষকর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ ॥

৪। অনিমিত্ততো ভাবোৎপত্তিঃ কণ্টকতৈক্ষ্ণ্যাদিদর্শনাৎ ॥

৫। সর্ব্বমনিত্যমুৎপত্তিবিনাশধর্ম্মকত্বাৎ ॥

৬। সর্ব্বং নিত্যং পঞ্চভূতনিত্যত্বাৎ ॥

৭। সর্ব্বং পৃথক্ ভাবলক্ষণপৃথক্ত্বাৎ ॥

৮। সর্ব্বমভাবো ভাবেষ্বিতরেতরাভাবসিদ্ধেঃ ॥ ৮ ॥

ন্যায় সূঃ। অঃ ৪।

ইহার ভাবার্থ এই যে, প্রথম শ্রেণীর নাস্তিকেরা বলেন, শূন্য বলিয়া এক পদার্থ আছে, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই শূন্য ছিল, পরেও শূন্য হইয়া যাইবে। ভাব অর্থাৎ যে সমস্ত পদার্থ বর্ত্তমান আছে, তাহার অভাব হইয়া শূন্য হইয়া যাইবে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর নাস্তিকেরা বলেন যে, অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হইয়াছে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে অভাব ছিল এবং অভাব হইতে এই ভাবরূপ জগৎ উৎপত্তি হইয়াছে।

তৃতীয় শ্রেণীর নাস্তিকেরা বলেন যে, যিনি যে প্রকারের কার্য্য করিবেন, তিনি ভগবান্ কর্ত্তৃক স্বীয় কর্ম্মের অনুরূপ ফল প্রাপ্ত হইবেন। এই বেদ-বিহিত বাক্য সত্য নহে, কেন না, কোন কোন প্রকার কার্য্য করিলে তাহার ফল পাওয়া যায় না। এজন্য তাঁহারা বলেন যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে জীব কর্ম্মফল ভোগ করে, কিন্তু স্বীয় স্বীয় কর্ম্মানুরূপ নহে।

চতুর্থ শ্রেণীর নাস্তিকেরা বলেন, যে প্রকার বাবলাদি কণ্টকবৃক্ষে, নিমিত্ত বা কর্ত্তা ব্যতীত, আপন হইতেই কণ্টক উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ নিমিত্ত-কারণ ব্যতীত জগৎ উৎপত্তি হইয়াছে। এই শ্রেণীর নাস্তিকেরা বুঝেন না যে, যে যাহাকে উৎপন্ন করে, সে তাহার নিমিত্ত-কারণ; বাবলাদি কণ্টকজাতীয় বৃক্ষসকল কণ্টক উৎপত্তি করিতে পারে, আম জামাদি অকণ্টকবৃক্ষে কণ্টক উৎপত্তি করিতে পারে না, সুতরাং কণ্টক জাতীয় বৃক্ষ কণ্টক উৎপত্তির নিমিত্ত-কারণ। অতএব নিমিত্ত ব্যতীত সৃষ্টি বা কোন পদার্থ উৎপন্ন হয় না।

পঞ্চম শ্রেণীর নাস্তিকেরা বলেন যে, জাগতিক সমস্ত পদার্থ যখন উৎপত্তি এবং বিনাশশীল, তখন সমস্তই অনিত্য। ইঁহারা জীব, প্রকৃতি এবং ঈশ্বর নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন না।

ষষ্ঠ শ্রেণীর নাস্তিকেরা বলেন যে, পঞ্চভূত নিত্য বলিয়া সমস্ত জগৎ নিত্য। ইঁহারা বুঝেন না, সমস্ত স্থূল জগৎ নশ্বর অর্থাৎ উৎপত্তি এবং বিনাশধর্ম্মযুক্ত, সুতরাং ইহা নিত্য নহে। কিন্তু জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান-কারণ জীব, প্রকৃতি এবং ঈশ্বর নিত্য।

সপ্তম শ্রেণীর নাস্তিকেরা বলেন যে, এ জগতে আমরা সমস্ত পদার্থ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দেখি। ইহাদের মধ্যে কোন একটী একত্ব পদার্থ নাই, সুতরাং জগতে সমস্ত পদার্থ পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে উৎপন্ন হইয়াছে। ইঁহারা বুঝেন না, বর্ত্তমানকাল, পরমাত্মা, আকাশ, জাতি ইত্যাদি বস্তু সর্ব্বপদার্থে একভাবে বিরাজিত আছে, সুতরাং পদার্থসকল স্বরূপতঃ পৃথক্ পৃথক্ হইলেও, পৃথক্ পৃথক্ পদার্থে এক পদার্থত্ব আছে।

অষ্টম শ্রেণীর নাস্তিকেরা বলেন যে, সকল পদার্থে ইতরেতরের অর্থাৎ পরস্পরের অভাব সিদ্ধ হয় বলিয়া সমস্তই অভাবস্বরূপ। ইহার ভাবার্থ এই যে, গো অশ্ব নহে এবং অশ্ব গো নহে; এজন্য বুঝিতে হইবে যে, যখন এক বস্তুর

তুলনায় অপর বস্তুর অভাব জ্ঞান হয়, তখন এই বিচারে সমস্ত বস্তুরই অভাব। ইঁহারা বুঝেন না, অশ্বে অশ্বত্ব এবং গরুতে গোত্ব এই ভাব বিদ্যমান আছে, কখন অভাব হয় না, আবার যদি অশ্ব এবং গো এই প্রকার সমস্ত পদার্থের যদি অভাব থাকে, তবে ইতরেতর অর্থাৎ পরস্পরের সম্বন্ধ কি প্রকারে সম্ভবে ?

নবম শ্রেণীর নাস্তিকেরা বলেন,—যে প্রকার অন্ন এবং জল একত্র মিশ্রিত করিয়া কিছুদিন রাখিলে কৃমি উৎপন্ন হয়, বীজ ভূমিতে বপন করিলে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, এই প্রকার স্বভাব হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। ইঁহারা বুঝেন না যে, জড়শক্তির দ্বারা এক প্রকার বস্তু বা পরমাণুর সহিত অপর প্রকার পরমাণুর সম্মিলনে তৃতীয় বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে, তর্কস্থলে ইহা সত্য বলিয়া মানিলেও, সঙ্কল্প বা Design, জড়পদার্থে করিতে পারে না, সৃষ্টি-প্রকরণের সর্ব্বত্রই সঙ্কল্প দৃষ্ট হয়, সুতরাং নিমিত্ত এবং উপাদান-কারণ ব্যতীত সৃষ্টি হইতে পারে না।

যাঁহারা বেদ-প্রমাণকে "স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ" বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে এইপ্রকার নাস্তিকদিগের বাক্যের প্রতিবাদ করা অতি সহজ। যথা—

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ ॥

যজুঃ। অঃ ৪০। মঃ ২॥

"পরমেশ্বর আজ্ঞা করিতেছেন যে, মনুষ্য শতবর্ষ পর্য্যন্ত অর্থাৎ যতদিন জীবিত থাকিবে, ততদিন কর্ম্মকরতঃ জীবনের ইচ্ছা করিবে, কখন আলস্য-পরতন্ত্র হইবে না।"

ইহাতে বুঝিতে হইবে, জীবের কর্ম্মে নিযুক্ত থাকাই ঈশ্বরেচ্ছা, সুতরাং জীব স্বীয় কার্য্যানুসারে ফলভোগ করে, ঈশ্বরেচ্ছায় নহে।

সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতার্যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবং চ পৃথিবীং চান্তরীক্ষমথো স্বঃ ॥

ঋঃ মঃ ১০। সূঃ ১৯০। মঃ ৩॥

ইহা ঋগ্বেদের বচন, ইহার ভাবার্থ এই যে, "(ধাতা) পরমেশ্বর যেরূপ পূর্ব্বকল্পে সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, পৃথিবী এবং অন্তরীক্ষ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এক্ষণেও তদ্রূপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন।"

বেদে সৃষ্টি সম্বন্ধে পরিষ্কার সিদ্ধান্ত থাকিলেও, নাস্তিকেরা শাস্ত্রে শাস্ত্রে নানা প্রকার বিবাদ উপস্থিত করিয়া বেদপ্রমাণকে অসিদ্ধ করিতে চাহেন। পাঠকগণের কৌতুহল নিবৃত্তি করিবার জন্য নিম্নে অতি সঙ্ক্ষেপে তাহার কিছু উল্লেখ করা গেল।

তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরূপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধিভ্যোঽন্নম্। অন্নাদ্রেতঃ। রেতসঃ পুরুষঃ। স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ॥

তৈত্তিরীয়োপনিষদ, ব্রহ্মানন্দ বল্লী। অনুঃ ১॥

ইহা তৈত্তিরীয়োপনিষদের বচন; ইহার ভাবার্থ এই যে, উক্ত পরমেশ্বর এবং প্রকৃতি হইতে, আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধি, ওষধি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে বীর্য্য, বীর্য্য হইতে পুরুষ অর্থাৎ শরীর উৎপন্ন হইয়াছে। এতদ্দ্বারা দেখা যায় যে, তৈত্তিরীয় উপনিষদের মতে আকাশাদি, ক্রম অনুসারে সৃষ্ট হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদ পাঠ করিলে দেখা যায়, অগ্ন্যাদি ক্রম অনুসারে সৃষ্ট হইয়াছে। ঐতরেয় উপনিষদ পাঠ করিলে দেখা যায়, জলাদি ক্রমানুসারে সৃষ্ট হইয়াছে। আবার বেদে কোন কোন স্থানে পুরুষ এবং কোন কোন স্থানে হিরণ্যগর্ভাদি হইতে সৃষ্টির উল্লেখ আছে। ষড়্‌দর্শনের মধ্যে মীমাংসা মতে কর্ম্ম হইতে, বৈশেষিকে কাল হইতে, ন্যায়ে পরমাণু হইতে, যোগে পুরুষার্থ হইতে, সাংখ্যে প্রকৃতি হইতে এবং বেদান্তে ব্রহ্ম হইতে, সৃষ্ট হইয়াছে, এইরূপ উল্লেখ আছে। এই সমস্ত দেখিয়া নাস্তিকেরা এক ঘোর আপত্তি করেন যে, যখন বেদ, উপনিষদ, এবং দর্শনের মত এক নহে, তখন কোন্ মত সত্য এবং কোন্ মত মিথ্যা বলিয়া স্থির করি।

মহাপ্রলয় এবং খণ্ডপ্রলয়, এই দুইটী বিষয়ের বিজ্ঞান তাঁহারা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করেন না বলিয়া, এই প্রকার কুতর্ক উপস্থিত করিয়া থাকেন। যে ক্রমে পঞ্চমহাভূতের লয়প্রাপ্তি হইয়া, জগৎ যখন প্রকৃতিতে লয়প্রাপ্ত হয়,তাহাকে মহাপ্রলয় বলে। এই মহাপ্রলয়ের পরে যখন সৃষ্টি আরম্ভ হয়, তখন আকাশাদি ক্রমানুসারে সৃষ্টি আরম্ভ হয়, এই সৃষ্টির পর পর ক্রম তৈত্তিরীয়োপনিষদে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা আছে।

আর যখন সমস্ত পঞ্চমহাভূতের লয় না হয়, একটী বা একাধিক মহাভূতের লয় হয়, তখন তাহাকে খণ্ডপ্রলয় বলে। যে কল্পে পৃথিবী এবং জল এই দুইটি মাত্র লয় হয় অর্থাৎ পৃথিবী জলে এবং জল অগ্নিতে লয় হয়, এই প্রকার খণ্ড-প্রলয়ের পর যখন পুনরায় সৃষ্টি আরম্ভ হয়, তখন অগ্নি হইতে সৃষ্টি উৎপন্ন হয়। ছান্দোগ্যোপনিষদে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। আবার যে কল্পে মাত্র একটী মহাভূত অর্থাৎ পৃথিবী জলে লয়প্রাপ্ত হয়, এই প্রকার খণ্ডপ্রলয়ের পর জল হইতে সৃষ্টি আরম্ভ হয়। তাই ঐতরেয়োপনিষদে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। সুতরাং এক উপনিষদের সহিত অন্য উপনিষদের বিরোধ নাই।

বেদে হিরণ্যগর্ভ এবং পুরুষ এই দুইটীই পরমেশ্বরের নাম বলিয়া উল্লেখ আছে, তাহার ধাত্বর্থ এই—

পৄ পালন পূরণয়োঃ।

এই ধাতু হইতে পুরুষ শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে।

"যঃ স্বব্যাপ্ত্যা চরাচরং জগৎ পৃণাতি পূরয়তি স পুরুষঃ" ॥

সমগ্র জগতে পূর্ণ হইয়া আছেন বলিয়া পরমেশ্বরের নাম "পুরুষ" হইয়াছে।

"জ্যোতির্বৈ হিরণ্যং তেজোবৈ হিরণ্যমিত্যৈতরেয়ে, শতপথে চ ব্রাহ্মণে"।

"যো হিরণ্যানাং সূর্য্যাদীনাং তেজসাং গর্ভ উৎপত্তিনিমিত্ত-মধিকরণং স হিরণ্যগর্ভঃ" ॥

যাঁহা হইতে সূর্য্যাদি তেজঃসম্পন্ন লোক উৎপন্ন হইয়া যাঁহার আধার হইয়া রহিয়াছে অথবা যিনি সূর্য্যাদি তেজঃস্বরূপ পদার্থের গর্ভ, নাম, উৎপত্তি এবং নিবাসস্থল হয়েন, সেই পরমেশ্বরের নাম হিরণ্যগর্ভ হইয়া থাকে, ইহাতে যজুর্ব্বেদের মন্ত্র প্রমাণ আছে :—

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেকআসীৎ
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাম্ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।

যজুঃ অঃ ১৩। মং ৪॥

ইত্যাদি স্থলে "হিরণ্যগর্ভ" হইতে পরমেশ্বরেরই গ্রহণ হইয়া থাকে। এই সকল প্রমাণ দ্বারা বুঝা গেল, সৃষ্টিবিষয়ে বেদে বেদে বিরোধ নাই, এই

প্রকার ছয়টী দর্শনশাস্ত্রে কিছুমাত্র বিরোধ নাই। পূর্ব্বে একবার বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে, এক্ষণে পুনরায় অন্যভাবে বলা যাইতেছে যে, কোন বিষয় নির্ম্মাণ করিতে গেলে, কর্ম্মের চেষ্টা ব্যতীত কখন কোন কার্য্য সমাধা হয় না, সুতরাং কর্ম্ম, সৃষ্টিপ্রকরণের একটী অঙ্গ; উপাদান-কারণ ব্যতীত কোন কার্য্য-হয় না, সুতরাং উপাদান সৃষ্টির একটী অঙ্গ। বিদ্যা, জ্ঞান, বিচার, না থাকিলে কেহ কখন কোন কার্য্য করিতে পারে না; সুতরাং পুরুষার্থ, সৃষ্টির আর একটী অঙ্গ; আবার তত্ত্বসকলের যথাযোগ্য সমবায় না হইলে (যথা হস্ত যোজনার স্থলে পদ যোজনা করিলে) কখন কোন কার্য্য হয় না, সুতরাং তত্ত্ব-সমবায় সৃষ্টির আর এক অঙ্গ; সর্ব্বোপরি নির্ম্মাণ-কর্ত্তা না হইলে কেহ কখন কোন কার্য্য করিতে পারে না, সুতরাং নিমিত্তকারণ, সৃষ্টির একটি অঙ্গ; এজন্য মীমাংসায় কর্ম্মের ব্যাখ্যা,বৈশেষিকে সময়,ন্যায়দর্শনে উপাদান বাপরমাণু,যোগদর্শনে পুরুষ-কার, সাংখ্যে প্রকৃতি বা তত্ত্বসমবায়ের বিচার, আর বেদান্তে,নিমিত্ত-কারণ ব্রহ্মের বিচার বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে; অতএব ষড়্‌দর্শনে কোন বিরোধ নাই। যাঁহারা বেদের বাক্য "স্বতঃপ্রমাণ" বলিয়া গ্রাহ্য না করেন, তাঁহাদিগকে শাস্ত্রে নাস্তিক বলিয়া উপেক্ষা করা হইয়াছে। উপরোক্ত নবম প্রকার নাস্তিক ব্যতীত নবীন-বেদান্তী নামে আর এক প্রকার প্রচ্ছন্ন নাস্তিক আছেন; ইঁহাদের কুহক হইতে কাহারও পরিত্রাণ পাওয়া অতীব দুষ্কর। ইঁহাদের অধিকাংশ শঙ্করা-চার্য্যের দলভুক্ত বলিয়া পরিচয় দেন, ইঁহারা বেদ, উপনিষদ আদি অনেক সৎশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিয়া একপ্রকার নূতন ধরণের মায়াবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব এবং ব্রহ্ম উভয়ে এক", ইহারা বেদাদি সৎশাস্ত্রের অনুমোদিত পরমেশ্বর এবং জীবে ব্যাপ্য ব্যাপক, সেব্য সেবক, আধেয় আধার, স্বামী ভৃত্য, রাজা প্রজা, পিতা পুত্র প্রভৃতি যে সম্বন্ধ আছে, তাহা এই শ্রেণীর প্রচ্ছন্ন নাস্তিকেরা স্বীকার করেন না। তাহার বিপরীত তাঁহারা—

"প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম। ১। অহং ব্রহ্মাস্মি। ২। তত্ত্বমসি। ৩। অয়মাত্মা ব্রহ্ম ॥৪॥

এই সকল বচন উদ্ধৃত করিয়া বলেন, ইহা বেদ বাক্য এবং মহাবাক্য, ইহা দ্বারা তাঁহারা প্রমাণ করিতে চাহেন যে, জীব এবং ব্রহ্ম এক। এই সমস্ত

কথা সম্পূর্ণ ভুল, কেন না, ইহা সমস্তই প্রাদেশিক বাক্য। মূল বেদের কোনও স্থানে ইহার উল্লেখ নাই। পরন্তু বেদের ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ঋষিপ্রণীত ভাষ্যাংশে এই সমস্ত বাক্যের উল্লেখ দেখা যায়, সুতরাং নবীন বেদান্তীরা বা নবীন মায়াবাদীগণ বিশেষ করিয়া বুঝুন যে, শঙ্করাচার্য্যের জন্মগ্রহণ করিবার বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে শ্রীভগবান্ বেদ প্রকাশ করিয়াছেন এবং ঋষিগণ বেদার্থ প্রকাশক ব্রাহ্মণগ্রন্থ ও অনেক প্রকার উপনিষদ প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে যদি তোমরা বহুপ্রাচীন ঋষিবাক্য পরিবর্ত্তন করিয়া শঙ্করাচার্য্যের দোহাই দিয়া এই সমস্ত গ্রন্থের বেদ-বিরোধী নূতন অর্থ করিতে প্রবৃত্ত হও, তবে তোমাদের ন্যায় মোহান্ধ ব্যক্তি ব্যতীত উহা অন্য কেহ বিশ্বাস করিবে না। বেদ পরিষ্কার ভাষায় জগতে প্রকাশ করিয়াছেন যে, জীব এবং প্রকৃতি অজ; ব্রহ্মের সহিত জীবের তাৎস্থ্য অর্থাৎ তৎসাহচরিতোপাধি আছে অর্থাৎ জীব ব্রহ্মের সহচারী। সুতরাং জীব এবং ব্রহ্ম এক নহে। তান্ত্রিক এবং নবীন মায়াবাদিগণ "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই বচনের অর্থে বুঝেন যে, (অহং) আমি, ব্রহ্ম (অস্মি) আছি বা হইয়াছি। ইঁহাদিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, আপনারা এক্ষণে "ব্রহ্ম" হইয়াছেন, পূর্ব্বে কি ছিলেন এবং কি প্রকারে ব্রহ্ম হইয়াছেন? প্রত্যুত্তরে তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে যে, অতি পূর্ব্বে আমরা ব্রহ্ম ছিলাম, এক্ষণে সেই নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, সদামুক্ত,ব্রহ্ম,সত্ত্বঃ, রজঃ, তমো, এই ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির রজঃ এবং তমো গুণের অবিদ্যোপাধিক আবরণে অভিভূত হইয়া গুটীপোকার ন্যায় আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছি এবং সংসারের সর্ব্বপ্রকার পাপপুণ্য, সুখদুঃখ, স্বর্গনরক, ভোগ করিতেছি। ইহাতে বিচারক্ষম ব্যক্তি মাত্রেই বুঝুন, মায়াবাদিদিগের জড়স্বভাবা মায়ার জোর কত? সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বস্তু সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী "ব্রহ্মকে" পর্য্যন্ত, এই মায়ার এক অংশ যে অবিদ্যা, তাহার দ্বারা আবদ্ধ করিতে পারে। তাই বলি পাঠক! চিৎবিহীন জড়ের অস্তিত্ব কেহ কি কল্পনা করিতে পারেন? কেহ কি কখনও জড়কে শক্তিমান্ বলিয়া শুনিয়াছেন?—কখনই না। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে, শঙ্করাচার্য্য-প্রচারিত নবীন বেদান্তিগণের মায়াবাদ, বেদ, যুক্তি, এবং বিজ্ঞানবিরুদ্ধ। যাহা হউক, ইতিপূর্ব্বে এই পুস্তকের ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় এই বিষয় একবার সমালোচিত হইয়াছে। এক্ষণে এই শ্রেণীর নবীন বেদান্তিগণ বেদের

বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া দেশের কি প্রকার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন এবং করিতেছেন, পাঠকদিগের অবগতির জন্য নিম্নে তাহার একটী দৃষ্টান্ত দেখান যাইতেছে, যথা,—

উপমন্ত্রয়তে স হিঙ্কারো জ্ঞপয়তে স প্রস্তাবঃ স্ত্রিয়া সহ শেতে স উদ্গাথঃ প্রতি স্ত্রীং সহ শেতে স প্রতিহারঃ কালং গচ্ছতি তন্নিধনং পারং গচ্ছতি তন্নিধনমেতদ্বামদেব্যং মিথুনে প্রোতম্ ॥ ১ ॥

স য এবমেতদ্বামদেব্যং মিথুনে প্রোতং বেদ মিথুনী-ভবতি মিথুনান্মিথুনাৎ প্রজায়তে সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভি র্ভবতি মহান্ কীর্ত্ত্যা ন কাঞ্চন পরিহরেৎ তদ্ব্রতম্ ॥ ২ ॥.

ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ২য় মঃ । ১৩ শঃ খঃ ।

ইহা ছান্দোগ্যোপনিষদের বচন ; ইহার ঠিক বঙ্গানুবাদ এই প্রকার যথা,—

বাক্যদ্বারা সঙ্কেতকরণ হিঙ্কার। সন্তোষকরণ প্রস্তাব। স্ত্রীর সহিত শয়ন উদ্গীথ। স্ত্রীর অভিমুখে একত্র শয়ন প্রতিহার। কালযাপন নিধন। রমণের সমাপ্তিই নিধন। এই বামদেব্য নামক সাম মিথুনে সন্নিবিষ্ট আছে ॥ ১ ॥

যিনি এই প্রকারে এই বামদেব্য সামকে মিথুনে সন্নিবিষ্ট জানেন, তিনি মিথুনীভাব লাভ করিয়া থাকেন। তিনি প্রত্যেক মিথুন হইতে প্রজালাভ করিয়া থাকেন। তিনি পূর্ণায়ু লাভ করেন, উজ্জ্বল জীবন ধারণ করেন, প্রজা পশু ও কীর্ত্তিতে মহান্ হয়েন। কোন স্ত্রীকেই পরিত্যাগ করিবেন না, ইহাই ব্রত ॥ ২ ॥

এই বচনের মধ্যে দ্বিতীয় বচনের শেষ পদটী "ন কাঞ্চন পরিহরেৎ তদ্-ব্রতম্" ইহার ঠিক বঙ্গানুবাদ 'কোন স্ত্রীলোককে পরিত্যাগ করিবে না, ইহাই ব্রত অর্থাৎ ধর্ম্ম।' শঙ্করাচার্য্য এই পদটীর কি প্রকার ভাষ্য করিয়াছেন, তাহা একবার বিচার করিয়া বুঝুন, যথা,—

"ন কাঞ্চন কাঞ্চিদপি স্ত্রীয়ং স্বাত্মতল্প প্রাপ্তম্ ন পরিহরেৎ সমাগমার্থিনীং বামদেব্য সামোপাসনাঙ্গত্বেন বিধানাদেতদন্যত্র

প্রতিষেধ স্মৃতয়ঃ। বচনপ্রামাণ্যাচ্চ ধর্ম্মাবগতেঃ ন প্রতিষেধশাস্ত্রেণাস্য বিরোধঃ।”

ইহার ঠিক্ বঙ্গানুবাদ করিতে হইলে, এই প্রকার করিতে হয়, যথা,—সমাগমপ্রার্থী কোন স্ত্রীলোককে নিজতল্পে অর্থাৎ নিজের বাস্ করিবার স্থানে প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে ন পরিহরেৎ অর্থাৎ পরিত্যাগ করিবে না। কেন না, এই পরস্ত্রীগমন বামদেব্য সামোপাসনার অঙ্গহেতু, কোন প্রতিষেধ শাস্ত্রের বিধি লঙ্ঘন করিলে কোন প্রকার পাপ হয় না। ইহার ভাবার্থ শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন, বচন প্রমাণ অর্থাৎ উপনিষদের বচন প্রমাণ থাকিলে স্মৃতিশাস্ত্রের পরস্ত্রীগমনের প্রতিষেধ বা নিষেধে কোন প্রকার দোষ হইবে না; যেহেতু শ্রুতি-প্রমাণ স্মৃতি-প্রমাণ হইতে অধিকতর শ্রেষ্ঠ। বিচারক্ষম পাঠকগণ শ্রীল শঙ্করাচার্য্যের এই ভাষ্যের মহদভিপ্রায় বুঝুন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এই তিন যুগে নিয়োগ-প্রথানুসারে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করিবার বিধি ছিল; পুরাণাদি পাঠে জানা যায় যে, পঞ্চপাণ্ডব ক্ষেত্রজ পুত্র ছিলেন, কুরুবংশ রক্ষা করিবার জন্য মহামুনি বেদব্যাসদেব পর্য্যন্ত ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যদি পরস্ত্রীগমন একবারে নিষেধ হয়, তবে ক্ষেত্রজ পুত্র কি প্রকারে উৎপন্ন হইবে? তাই উপনিষদ বিধি দিতেছেন যে, যখন নিয়োগব্রতের বিধি অনুসারে, কোন স্ত্রীলোক, সমাগম ইচ্ছায় কোন গৃহী কিম্বা কোন ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী পুরুষকে বরণ করে, তখন সেই পুরুষ, সেই স্ত্রীলোককে অর্থাৎ সুন্দরী, কুৎসিতা, তরুণী, বৃদ্ধা ইত্যাদি রূপযৌবন অথবা ব্রাহ্মণশূদ্রাদি উচ্চ কিম্বা নীচবর্ণা বিচার করিয়া বা স্মৃতিশাস্ত্রের বিধি অনুসারে পরস্ত্রীগমন নিষেধ-বিচার ইত্যাদি পাপভয়ে কোন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবে না, ইহাই শ্রীল শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যের অভিপ্রায় এবং সর্ব্বশাস্ত্রের বিধানও এইরূপ। এই প্রসঙ্গে বিচারক্ষম পাঠকগণ ভাল করিয়া বুঝুন যে, কলিকালের বিশেষ শাস্ত্রকর্ত্তারা কলিকালের মনুষ্যগণের স্বভাব ভালরূপ বিচার করিয়া অন্য যুগের শাস্ত্রের অনেক সাধারণ বিধিসকল কলিযুগে আচরণ করিতে বিশেষভাবে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী অতি প্রধান নিষেধ, যথা,—দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ, নিয়োগ বা ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন, মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত, ভৃগুপত, অনুলোম বিবাহ, সমুদ্র-যাত্রা, দেবর দ্বারা সন্তানোৎ-

পাদন, দাস শূদ্রাদির পক্ব অন্ন ভোজন ইত্যাদি। ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, শাস্ত্রে পূর্ব্ব হইতে সাধারণের জন্য যে বিধি প্রচলিত থাকে, তাহাকে সাধারণ-বিধি বলে, আর পরবর্ত্তী সময়ের বিশেষ অবস্থা বিচার করিয়া পূর্ব্ব বিধি খণ্ডন করিয়া বিশেষ অবস্থানুসারে যে অভিনব বিধি প্রচলিত হয়, তাহাকে বিশেষ-বিধি বলা যায়। এক্ষণে পাঠকগণ! শাস্ত্রের এই অখণ্ডনীয় যুক্তি মনে রাখিয়া শ্রীল শঙ্করাচার্য্যের প্রধান শিষ্য, আনন্দগিরি, ছান্দোগ্যোপনিষদের উক্ত বচনের শঙ্করভাষ্যের কি প্রকার বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া দেশের কি ভয়ানক সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, তাহা একবার বুঝিয়া দেখুন, যথা,—

"ন কাঞ্চন পরিহরেৎ তদ্‌ব্রতম্"

ইহার শঙ্কর-ভাষ্য পূর্ব্বে বর্ণনা করা হইয়াছে, এক্ষণে এই বচনের আনন্দগিরির টীকার অর্থ বুঝুন যথা,—

"কাঞ্চিদপীতি পরাঙ্গনাং নোপগচ্ছেদিতিস্মৃতিবিরোধমাশঙ্ক্যাহ ;—বামদেব্যেতিবিধি নিষেধয়োঃ সামান্য বিষয়ত্বেন ব্যবস্থা প্রসিদ্ধেতি ভাবঃ। কিঞ্চ শাস্ত্রপ্রমাণ্যাদত্র ধর্ম্মোবগম্যতে। ন কাঞ্চন পরিহরেদিতি চ শাস্ত্রাবগমত্বাদবাচ্যমপি কর্ম্ম ধর্ম্মো ভবিতুমর্হতি তথাচ শ্রৌতার্থ দুর্ব্বলায়াস্মৃতের্ন প্রতিস্পর্দ্ধিতেত্যাহ বচনেতি। যথোক্তোপাসনাবতো ব্রহ্মচর্য্য নিয়মাভাবব্রতত্বেন বিবক্ষিত তস্ম প্রতিষেধশাস্ত্রবিরোধাশঙ্কেতি ভাবঃ।

শঙ্কর=ভাষ্যের আনন্দগিরি কৃত টীকা।

ইহার বঙ্গানুবাদ এই (আনন্দগিরি) কাঞ্চন অর্থে "পরাঙ্গনা" বলিয়া বুঝাইতেছেন, এই পরাঙ্গনা বা পরস্ত্রীগমনে স্মৃতিশাস্ত্রের যে বিরোধ বা নিষেধ আছে অর্থাৎ জ্ঞানকৃত পরস্ত্রীগমনে বিশেষ পাপ আছে এবং তাহার জন্য বিশেষ কঠোর প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে, তাহার ভয়ে, পরস্ত্রীগমনে বিরত হইও না অর্থাৎ সকলেই পরস্ত্রীগমন করিবে, কোন স্ত্রীলোককে পরিত্যাগ করিবে না অর্থাৎ মুন্থাদির স্মৃতিশাস্ত্রে বর্ণনা আছে, চণ্ডালাদি অন্ত্যজ নারীতে

যে ব্যক্তি গমন করে,এবং সেই ব্যক্তির বাটীতে যে গমন করে বা আহার করে, সে ব্যক্তিও পতিত হয়। (ইহার বিরুদ্ধ, আনন্দগিরি বেদবচন প্রমাণ দিয়া উপদেশ দিতেছেন যে,) নারী উচ্চ বর্ণেরই হউক আর অন্ত্যজ বর্ণেরই হউক, কাহাকেও উপেক্ষা করিবে না। কেন না, বামদেব্য শ্রুতিশাস্ত্রের ইহা বিশেষ বিধি, আর স্মৃতিশাস্ত্রের যে নিষেধ, তাহা সামান্য-বিধি, সুতরাং সামান্য–বিধি এবং বিশেষ-বিধি লইয়া বিচার করিতে গেলে, বিশেষ-বিধি অধিক প্রামাণ্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। বৌদ্ধ instinct বা সংস্কারযুক্ত আনন্দগিরির বিচারে সর্ব্ব সাধারণের 'পরদার' করায়, সমাজের বিশেষ উপকার, এই জন্য তাঁহার টীকায় পুনরায় বিশেষ করিয়া বলিতেছেন, "ন কাঞ্চন পরিহরেদিতি" অর্থাৎ কোন বর্ণের স্ত্রীলোক পরিত্যাগ করিও না, কেন না, (বৈদিক বা শ্রুতি) শাস্ত্রে বিধান আছে বলিয়া (অন্য শাস্ত্রের বা স্মৃতিশাস্ত্রে) নিষেধ (অবাচ্য) ধর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। আনন্দগিরি এই সম্বন্ধে আরও যুক্তি দেখাইতেছেন, স্মৃতিশাস্ত্র, শ্রুতিশাস্ত্রের তুলনায় দুর্ব্বল, এজন্য শ্রুতিশাস্ত্র যখন পরস্ত্রীগমনের বিধি দিতেছেন, তখন দুর্ব্বল স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবস্থা গ্রাহ্য হইতে পারে না। সর্ব্বাশ্রমীর পক্ষে পরস্ত্রীগমন যে শাস্ত্রসম্মত, তাহা বিশেষ করিয়া বুঝাইবার জন্য আনন্দগিরি পুনরায় বলিতেছেন,—লোকে যদি এই প্রকার আপত্তি উত্থাপন করেন যে, 'এই ভাবে পরস্ত্রীগমনে অধর্ম্মের কার্য্য না হইয়া যেন ধর্ম্মের কার্য্যই হইল, কিন্তু সাধকদিগের ব্রহ্মচর্য্য, অবশ্যই এই কার্য্যে ভঙ্গ হইবে।'

ইহার উত্তরে আনন্দগিরি বলিতেছেন যে, তাহা হইতেই পারে না, অর্থাৎ পরস্ত্রীগমন যে ভাবে বলা হইল, সেই ভাবে পরস্ত্রীগমন করিলে ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হইবে না অর্থাৎ দণ্ডী, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী-দিগের নিকট কোন স্ত্রীলোক আসিলে যখন ইচ্ছা তখন, উপভোগ করিতে পারিবে, ইহাতে তাহাদের কোন প্রকার পাপ বা ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হইবে না, এই জন্যই ইহাকে 'ব্রত' বলা হইয়াছে এবং এই জন্য প্রতিষেধ-শাস্ত্রের নিষেধাশঙ্কা করিবে না। এক্ষণে উক্ত বেদ বচনের এই প্রকার বিকৃত অর্থ আনন্দগিরি কেন করিলেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে মনে হইবে যে, ইংরাজিতে যাহাকে instinct অর্থাৎ প্রকৃতিগত সংস্কার বলে, তাহা কেহ কখন সহজে পরিত্যাগ করিতে পারে না; আনন্দগিরি যতই পণ্ডিত হউন

না কেন, তিনি তাঁহার বৌদ্ধ (instinct) সংস্কার সহজে ত্যাগ করিতে পারিবেন কেন? পূর্ব্বে অতি বিস্তীর্ণভাবে দেখান হইয়াছে যে, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী-প্রদেশে স্ত্রীলোকের সতীত্ব ধর্ম্মের কোন গৌরব নাই, তাই আনন্দগিরি বৌদ্ধ-সংস্কার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া এই প্রকার সৎ-শাস্ত্রের কু-ব্যাখ্যা করিয়া দেশের মহা অনিষ্ট করিয়াছেন। আজকাল ছাই মাথা, উলঙ্গ বা নেংটী পরা বা গেরুয়া কমণ্ডলুধারী যে সমস্ত সন্ন্যাসী, মোহান্ত বা চতুর্থাশ্রমিগণ শঙ্করাচার্য্যের মঠের দোহাই দিয়া, কিম্বা তন্ত্রের দোহাই দিয়া, কলিকাতা, গয়া, কাশী প্রভৃতি সমগ্র ভারতবর্ষে বিচরণ করিতেছে, তাহাদের আচারব্যবহার বিশেষ ভাবে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে বুঝা যাইবে যে, অতি অল্প সংখ্যক ভগবদনুরাগী ব্যতীত প্রায় সমস্তই বেদাচার-বিরোধী নিতান্ত ভণ্ড; ইহারা নেশাখোর, ঘোর ব্যভিচার দোষে দোষী, ইহাদের কুহকে পড়িয়া লক্ষ লক্ষ কুল-ললনা সতীত্ব ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতেছেন, ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই নিতান্ত মূর্খ, বর্ণজ্ঞানশূন্য এবং এই শ্রেণীর মধ্যে যাঁহারা পাণ্ডিত্যাভিমানী তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ছান্দোগ্যোপনিষদের উপরোক্ত বচনের আনন্দগিরি-কৃত কুব্যাখ্যা দেখিয়া, তাহাদের ব্যভিচারের পোষকতায় বেদ-প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। প্রায় ১৫ বৎসর অতিবাহিত হইতে চলিল, কলিকাতা পুলিশ কোর্টে একটী সন্ন্যাসীর পরস্ত্রী ভুলান ও পরস্ত্রীগমন সম্বন্ধে একটি মোকদ্দমা হয়, এই মোকদ্দমায় ঐ সন্ন্যাসীটী জবাব দেয় যে, স্ত্রীলোকটী (Salvation Army) স্যালভেসন আরমি-সম্প্রদায়ভুক্ত এ দেশস্থ খৃষ্টানের মেয়ে। এই স্ত্রীলোকটী স্বেচ্ছায় তাহার আসনে গমন করে, আসনে আগতা পরস্ত্রীগমনে তাহাদের ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হয় না, বরং ইহাই তাহাদের ধর্ম্ম বা ব্রত। এই কুনীতির দোহাই দিয়া ছোট বড় মঠের অধিকাংশ মোহান্ত পরদার করিয়া থাকেন। তারকেশ্বরের মোহান্তের নবীন-এলোকেশী সংক্রান্ত মোকদ্দমা, এই আনন্দগিরির টীকার ফল। আজকাল সীতাকুণ্ডের মোহান্ত এই টীকার জোরে তাঁহার মোকদ্দমায় জবাব দিয়াছেন যে, তিনি বিবাহ করেন নাই, তিনি শক্তি সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহার ভাবার্থ এই যে, ইহাদের মতে পুরুষ যে প্রকার সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া পরদার গ্রহণ করাতে কোন দোষ হয় না, সেই প্রকার স্ত্রীলোকে সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ ভৈরবী নাম ধারণ করিয়া পরপুরুষ-

গামিনী হইলে কোন দোষ হয় না। মোহান্তদিগের মঠে বা সন্ন্যাসীদিগের আসনে এই ভৈরবীগণ অনেক প্রকার লীলা করিয়া থাকে, এই ভৈরবীগণ অনেক স্থানে শক্তি নামে অভিহিতা হয়। কুম্ভমেলায় অনেক সন্ন্যাসী মোহান্ত এবং ভৈরবীদিগের একত্র সমাগম হইয়া থাকে; কুম্ভমেলায় ইহারা কি প্রকার বীভৎস লীলা করে, তাহা কৌতূহলাক্রান্ত পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত বৃন্দারণ্যবাসী মাধ্বগৌড়েশ্বরাচার্য্য শ্রীল মধুসূদন গোস্বামী-প্রণীত "জ্ঞানের বিকৃতি" নামক পুস্তক হইতে একটী আখ্যায়িকা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল, যথা,—"পবিত্র ত্রিবেণী-তটে কুম্ভ পর্ব্বোপলক্ষে সামান্য মায়াবাদীগণের একটি জমাতে (মেলাতে) পুরুষগণের অপেক্ষা স্ত্রীগণের সংখ্যা অধিক দেখিয়া, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'ভগবন্! এই সকল গৈরিকবসনাবৃতা যুবতী ও প্রৌঢ়া কে?' মোহান্ত মহোদয় উত্তর করিলেন, 'এরা ব্রহ্মবাদিনী অবধূতানি'। পুনর্ব্বার আমি বলিলাম,'এই সকল রমণী যুবতী, যুবকদের সঙ্গে সঙ্গে দিবানিশি ইঁহাদের অবস্থান কি আপনি যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করেন?' ইহার উত্তর যাহা শুনিলাম তাহা অতি চমৎকার! সভ্যসমাজে তাহা প্রকাশ করা বড়ই কঠিন, কিন্তু পাঠক-গণের কৌতূহল প্রশমনার্থে ইঙ্গিতে লিখিতেছি। ইহাতে যদি অশ্লীলদোষ হয়, তাহা ক্ষমার্হ। মোহান্ত মহারাজ আমার প্রশ্নের উত্তরে উপেক্ষার হাসি হাসিলেন। তাঁহার ভাব এই যে, ব্যভিচার যেন কোন দোষই নয়। লোকে যে ব্যভিচারকে দোষ বলিয়া মনে করে, তাহা অজ্ঞান। জ্ঞানময় সিদ্ধ মহাপুরুষ অজ্ঞানের কথা শুনিয়া হাসিবেন না কেন? তিনি একজন লোককে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'উপনিষদ লে আনা'। পুস্তকখানি আনাইয়া নিম্নলিখিত প্রকরণটী বাহির করিয়া আমার সম্মুখে রাখিলেন।"

কৌতূহলাক্রান্ত পাঠক বুঝুন যে, ইহা উপনিষদের অন্য বচন নহে, ইহা পূর্ব্বোক্ত ছান্দোগ্যোপনিষদের "উপমন্ত্রয়তে স হিঙ্কারো" নামক আলোচ্য বচনের আনন্দগিরি কৃত-টীকা। *

এক্ষণে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝুন যে, তান্ত্রিক ও মায়াবাদিগণ একত্র সম্মিলিত হইয়া মহান্ শক্তিশালী হওতঃ, কেবল উহাদের আপন সম্প্রদায়কে বেদাচার-বিরোধী করিয়াছে.এমন নহে,সূক্ষ্ম বিচারে বুঝিতে গেলে পরিষ্কার বুঝা

* যাঁহারা মায়াবাদিদিগের চরিত্র ভাল করিয়া জানিতে চাহেন, তাঁহারা উক্ত পুস্তক পাঠ করুন।

যাইবে, ভারতের প্রত্যেক উপাসক-সম্প্রদায়ের মধ্যে তন্ত্র এবং মায়াবাদ কমবেশী পরিমাণে বিমিশ্রিত হইয়া সকল সম্প্রদায়কে কলুষিত করিয়া, কমবেশী বেদাচারের বিরোধী করিয়াছে। ভিন্ন প্রকার বৈষ্ণবসম্প্রদায়ও ইহাদিগের কুহকজাল হইতে পরিত্রাণ পান নাই। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হইতে বঙ্গদেশে মাধ্বাচার্য্য নামক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব ছিল, এক্ষণ পর্য্যন্ত কায়স্থ ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের মন্ত্রগুরুগণ এই সম্প্রদায়ভুক্ত। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুও মাধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীল ঈশ্বরপুরীর নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণ করেন। গোলক-বৃন্দাবনবাসী ব্রজবাসীগণের অধিকাংশ বল্লভাচার্য্য নামক বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত, মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে কাশী, বৃন্দাবন, রাধাকুণ্ড, গোকুলাদি স্থানে এই বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এই সম্প্রদায় সম্পূর্ণ বেদাচার-বিরোধী। নিরপেক্ষ বিচার দ্বারা বুঝা যায় যে, মহাপ্রভুর প্রচারিত সম্পূর্ণ বেদাচারসম্মত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম, মায়াবাদী সন্ন্যাসীগণের এবং আউল, বাউল, সাঁই, দরবেশ, সহজীয়া প্রভৃতি বৈষ্ণব বামাচারী তান্ত্রিক, এবং বেদাদি সৎ-শাস্ত্র-বিরোধী বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের সংশ্রবে, আসিয়া আজকাল মলিনীকৃত হইয়া পড়িয়াছে। বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায় অন্যান্য সম্প্রদায় হইতে অত্যন্ত প্রবল পরাক্রমশালী, এজন্য কৌতূহলাক্রান্ত পাঠকদিগের অবগতির জন্য প্রথমেই এই বল্লভাচারীদিগের মত অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করা যাইতেছে।

শ্রীবল্লভাচার্য্যের জীবনী সুসভ্য সমাজে অতি নিন্দনীয়, এজন্য ব্যক্তি বিশেষের উপর দোষারোপ করিয়া বল্লভাচার্য্যসম্প্রদায়ের মনে কষ্ট দেওয়া এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু এই সম্প্রদায়ের মৌলিক নীতির সমালোচনা করিয়া তাঁহাদের দোষের সংশোধন করিতে চেষ্টা করা নিতান্ত প্রয়োজন। এই সম্প্রদায়ের মূলমন্ত্র, যথা,—সত্যার্থপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত :—

শ্রীকৃষ্ণঃ শরণং মম।

ক্লীং কৃষ্ণায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ॥

(গোপাল সহস্র নাম।)

বল্লভী সম্প্রদায়ের এই দুইটী সাধারণ মন্ত্র। পরন্ত পরব্রহ্মসম্বন্ধ এবং সমর্পণ করিবার জন্য নিম্নলিখিত মন্ত্র আছে যথা,—

শ্রীকৃষ্ণঃ শরণং মম সহস্র পরিবৎসরমিতকালজাতকৃষ্ণ-বিয়োগজনিত তাপক্লেশানন্ততিরোভাবহহং ভগবতে কৃষ্ণায় দেহেন্দ্রিয় প্রাণান্তঃকরণতদ্ধর্ম্মাংশ্চ দারাগারপুত্রাপ্তবিত্তেহ-পরান্যাত্মনা সহ সমর্পয়ামি দাসোঽহং কৃষ্ণ তবাস্মি ॥

বল্লভী সম্প্রদায়ের এই মূল মন্ত্রের অভিপ্রায় এই যে প্রাণ, অন্তঃকরণ, বিবাহিত স্ত্রী, পুত্র, প্রাপ্তধন ইত্যাদি সমস্তই শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিতে হইবে, তাহা হইলে মুক্তি হইবে। যাঁহারা সংস্কৃত ভাষাজ্ঞ পণ্ডিত, তাঁহারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে, এই প্রকার নানারূপ দোষপূর্ণ শ্লোক কোন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত কখনই রচনা করিতে পারেন না। যাহা হউক, এই সমস্ত বিচার পরিত্যাগ করিয়া দেখা যায় যে, বল্লভাচারিগণ এক প্রকার বামাচারী তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের ন্যায় কপটাচারী।

"অন্তঃশাক্তাঃ বহিঃশৈবাঃ সভামধ্যে চ বৈষ্ণবাঃ।
নানারূপধরাঃ কৌলা বিচরন্তি মহীতলে।"

ইহা তান্ত্রিকদিগের আচারব্যবহার করিবার শ্লোক। ইহার ভাবার্থ এই যে, ভিতরে শাক্ত অর্থাৎ বামমার্গী, বাহিরে শৈব, কেহ বা রুদ্রাক্ষ ও ভস্মধারণ-কারী এবং সভায় বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিবে, এই প্রকার যে স্থানে যেরূপ করিলে ভাল হয়, তদনুসারে নানা প্রকার রূপধারণ করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করে। বল্লভাচারীগণও এই প্রকার বিষয়-কপট। তাহাদের গোঁসাইগণ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া দেখায়, 'তোমরা শ্রীকৃষ্ণকে স্ত্রীকন্যাধনাদি অর্পণ কর', কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সেই গোঁসাইরাই উহা গ্রহণ করে, অর্থাৎ তাহাদের শিষ্যদিগের স্ত্রীকে প্রথমে শ্রীকৃষ্ণরূপী ঐ গোঁসাইগণকে সমর্পণ করিবে, গোঁসাইগণ তাহাদিগকে প্রথম ভোগ করিবে, পরে শিষ্যগণ স্বীয় স্ত্রীসম্ভোগে অধিকারী হয়। এই প্রকার অনুরাগী শিষ্য, নিজের স্ত্রী, কন্যা, পুত্রবধূ প্রভৃতিকে নিজ নিজ গোঁসাইদিগকে 'নিবেদন' করেন, এক্ষণকার এই বিংশ শতাব্দীর সুসভ্য লোকেরা, এই সকল বীভৎস ব্যাপার শুনিয়াও কেহ বিশ্বাস করিতে চাহেন না। এই কলিকাতা সহরে বড়বাজারের অনেক স্থানে বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের অনেক লোক আছে। ইহাদের ঠাকুরবাড়ী আছে,

তথায় ইহাদের গোঁসাইসকলের সমাগম হয় ; অনুসন্ধান করিলে ইহার সত্যতা সকলেই জ্ঞাত হইতে পারেন। গোঁসাইগণ কি প্রকারে অজ্ঞান শিষ্যদিগকে ছলনা করে, তাহা বিচারক্ষম পাঠকদিগের অবগতির জন্য, তাহাদের ধর্ম্মপুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি যথা,—

শ্রাবণস্যামলে পক্ষে একাদশ্যাং মহানিশি।
সাক্ষাদ্ভগবতা প্রোক্তং তদক্ষরশ উচ্যতে॥
ব্রহ্মসম্বন্ধকরণাৎ সর্ব্বেষাং দেহজীবয়োঃ।
সর্ব্বদোষনিবৃত্তি র্হি দোষাঃ পঞ্চবিধাঃ স্মৃতাঃ॥
সহজা দেশকালোত্থা লোকবেদনিরূপিতাঃ।
সংযোগজাঃ স্পর্শজাশ্চ ন মন্তব্যাঃ কদাচন॥
অন্যথা সর্ব্বদোষাণাং ন নিবৃত্তিঃ কথঞ্চন।
অসমর্পিতবস্তূনাং তস্মাদ্বর্জ্জনমাচরেৎ॥
নিবেদিভিঃ সমর্প্যৈব সর্ব্বং কুর্য্যাদিতি স্থিতিঃ।
ন মতং দেবদেবস্য স্বামিভুক্তিসমর্পণম্॥
তস্মাদাদৌ সর্ব্বকার্য্যে সর্ব্ববস্তুসমর্পণম্।
দত্তাপহারবচনং তথা চ সকলং হরেঃ॥
ন গ্রাহ্যমিতি বাক্যং হি ভিন্নমার্গপরং মতম্।
সেবকানাং যথা লোকে ব্যবহারঃ প্রসিধ্যতি॥
তথা কার্য্যং সমর্প্যৈব সর্ব্বেষাং ব্রহ্মতা ততঃ।
গঙ্গাত্বে গুণদোষাণাং গুণদোষাদিবর্ণনম্॥

বল্লভিসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তরহস্যাদি গ্রন্থে এই সকল শ্লোক লিখিত আছে ; ইহার ভাবার্থ এই :—শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের অর্দ্ধনিশির সময় সাক্ষা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ (জীবের মঙ্গলের জন্য) এই প্রকার বলিয়াছেন,—সর্ব্বজীবের পঞ্চপ্রকার দোষ বা পাপ হইবেই অর্থাৎ জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ পাঁচ প্রকার দোষ হইয়া থাকে। এই দোষসকল নিবৃত্তির জন্য দেহী মাত্রেরই ব্রহ্ম সম্বন্ধ

করিতেই হইবে অর্থাৎ ব্রহ্মসম্বন্ধ করিলেই এই পঞ্চবিধ দোষ বা পাপ হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। উক্ত দোষ সকল এই—প্রথম, সহজ দোষ, যাহা স্বভাবিক অর্থাৎ যাহা কামক্রোধাদি হইতে উৎপন্ন। দ্বিতীয়—কোন দেশে এবং কালে যে কোন পাপ অনুষ্ঠান হয়। তৃতীয়—লোকে যাহাকে ভক্ষ্যা-ভক্ষ্য কহে এবং বেদোক্ত অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত মিথ্যাভাষণাদি। চতুর্থ—সংযোগজ অর্থাৎ যাহা অসৎ সঙ্গ হইতে অর্থাৎ চৌর্য্য, লাম্পট্য, মাতা ভগ্নী কন্যা এবং পুত্রবধূ ও গুরুপত্নী প্রভৃতির সহিত সংযোগজনিত পাপ। পঞ্চম—স্পর্শজ অর্থাৎ অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করিলে যে পাপ হয়। ইহার অভিপ্রায় এই যে, বল্লভাচারী গোঁসাইদের শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মসংস্পর্শ দ্বারা অর্থাৎ একবার যাহাদের ব্রহ্মস্পর্শ হইয়াছে, তাহাদের এই সমস্ত পাপ আর স্পর্শ করে না, অর্থাৎ সকলেই স্বেচ্ছাচারী হইয়া এই পঞ্চবিধ পাপ করিতে পারিবে। কিন্তু যাহাদের ব্রহ্মস্পর্শ হয় নাই, তাহাদের এই সমস্ত পাপ হইবেই হইবে। অতএব অসমর্পিত বস্তু সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিবে। ইহার ভাবার্থ এই—বল্লভাচারী-দিগের গুরুই ব্রহ্ম। এই গুরুকে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ, ধন, ঐশ্বর্য্য সমস্তই সমর্পণ করিবে, পরে তাহাদিগকে ভোগ করিবে অর্থাৎ বিবাহিতা স্ত্রীকে যতদিন পর্য্যন্ত বল্লভাচারীদের গুরু উপভোগ না করিবে, ততদিন স্বামী তাহাকে ভোগ করিলে পাপ হইবে। কিন্তু গোঁসাইকে নিবেদিত স্ত্রীর কখনও আর ব্যভিচার দোষ হইতে পারিবে না। পুত্র নিবেদিত হইলে তাহাকেও আর কখনও ব্যভিচারের দোষে কলঙ্কিত হইতে হইবে না। লোকাচারে এবং ব্যবহারে অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রের বিধি অনুসারে ভগবান্‌কে যাহা একবার দান করা হয়, তাহা কেহ আর গ্রহণ করে না অর্থাৎ কাশীতে বিশ্বেশ্বরের, গয়ায় বিষ্ণুপদের, শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দেবের এবং প্রয়াগে অক্ষয়-বটের নিকট ব্রহ্মবুদ্ধিতে ফলাদি যে বস্তু দান করা যায়, তাহা দাতার পক্ষে পুনরায় গ্রহণ করা বৈদিক শাস্ত্রবিরুদ্ধ; করিলে দাত্তাপহারক পাপে দোষী হয়, তাই বল্লভাচারী গোঁসাইরা বুঝাইতেছেন যে, এই মত শাস্ত্র-প্রমাণ অগ্রাহ্য। পাছে এই সমস্ত যুক্তি-সঙ্গত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে বল্লভাচারী-সম্প্রদায়ের লোকের মন পরিবর্ত্তন হয়, এই জন্য এই সম্প্রদায়ের লোকের পক্ষে অন্য শাস্ত্র পাঠ করা নিষেধ হইয়াছে। তাহারা তাহাদের শাস্ত্রানুসারে লোক শিক্ষা দেয় যে, অন্যান্য নদীর

জল গঙ্গার জলে মিশিলে যেরূপ গঙ্গাজলের পতিতপাবনী গুণনষ্ট হইয়া সাধারণ জলের গুণ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ আমাদের বল্লভাচারীদিগের শাস্ত্রের গুণসকল অপর শাস্ত্রের দোষের সহিত মিশিয়া দোষসম্পন্ন হইয়া থাকে।

বল্লভাচারীদিগের এই প্রকার শাস্ত্রযুক্তি অবলম্বন করিয়া, ব্যবহারে উহারা শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি লীলার অনুকরণ করিতে গিয়া, পরস্ত্রীমণ্ডলীর সহিত যে প্রকার বেদ এবং সভ্যসমাজবিরুদ্ধ বীভৎস আচার করিয়া থাকে, তাহা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা ব্যতীত অন্য কেহ বিশ্বাস করিতে পারেন না। উহাদিগের ন্যায় কিশোরী-সাধক, সহজীয়া এবং বাউলাদি বেদাচারবিরোধী অনেক তান্ত্রিক-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় আছে, তাহারা বাহ্যব্যবহারে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া এবং শ্রীশ্রীমহাপ্রভুকে তাহাদের শিক্ষাগুরু বলিয়া স্বীকার করে, কিন্তু অন্তরে বা সাধন ভজনের সময় বৃন্দারণ্যবাসী আদর্শ বৈষ্ণব-গোস্বামীদিগের আচরিত এবং প্রচারিত ভজনসাধন এবং তাহাদের প্রচারিত গ্রন্থসকলের প্রমাণ স্বতঃপ্রমাণ বলিয়া স্বীকার করে না। অধিকন্তু ইহারা মহাপ্রভু এবং আদর্শ গোস্বামীদিগের নির্ম্মল চরিত্র কলুষিত করিয়া এবং তাঁহাদের প্রচারিত সমস্ত গ্রন্থের সার স্বরূপ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের ন্যায় পবিত্র গ্রন্থের প্রকৃত অর্থ পরিবর্ত্তন করিয়া, তাহাদের মতের পোষকভাবে অর্থ করিতে চেষ্টা করে। আজকাল সুসভ্য সমাজের মলস্বরূপ এই সম্প্রদায়, প্রকৃত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে সাধারণের চক্ষে মলিনীকৃত করিয়া রাখিয়াছে। মদ, গাঁজা, ভাঙ্ প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবন, কোন প্রকার জীবের মাংস এবং মৎস্য ভোজন, কিম্বা কোন প্রকার জীবকে কোন দেবতার সম্মুখে বলিদান করা, বা ধর্ম্মের দোহাই দিয়া সেবাদাসী বা বৈষ্ণবী আদি কোন প্রকার পরদার স্বীকার করা, মহাপ্রভুর প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রের কোনও স্থলে উল্লেখ নাই এবং ব্যবহারে কোন আদর্শ বৈষ্ণব ইহা স্বীকার করেন নাই, অথচ এই দুরাচারী সম্প্রদায় এই পবিত্র গোস্বামীদিগের চরিত্রে কলঙ্ক দিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না। যাহা হউক, আধুনিক শিক্ষিত সমাজ এই প্রকার বামবার্গী তান্ত্রিকদিগের স্বভাবযুক্ত এই শ্রেণীর বৈষ্ণবদিগের চরিত্র দেখিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সম্পূর্ণ বেদাচারী বৈষ্ণবধর্ম্মের দোষারোপ করিবেন না।

এই প্রসঙ্গে মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব-প্রচারিত সর্ব্ববৈধানিক

এবং শ্রীল কেশবচন্দ্র সেন-প্রচারিত নববৈধানিক ধর্ম্ম কোন্ শ্রেণীর-উপাসক সম্প্রদায়ভুক্ত, তাহার মীমাংসা করিতে যাওয়া এক অতি দুঃসাহসিক ব্যাপার। কেননা, এই দুই সম্প্রদায়ে আজকাল অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি দীক্ষিত হইয়াছেন। কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের দোষের উল্লেখ করিয়া তীব্র প্রতিবাদ না করিলে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের সংস্কার হয় না। এই কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে গিয়া এই সামান্য সমালোচনী পুস্তকের অবতারণা করা হইয়াছে। এই নীতির অনুবর্ত্তী হইয়া এই দুই সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-তত্ত্বের সমালোচনা করিতে গেলে দেখা যাইবে যে, এই উভয় সম্প্রদায়ের প্রচারিত মত অর্থাৎ কেশব বাবু এবং শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের মত তাঁহাদের জন্মিবার বহুপূর্ব্ব কাল হইতে বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে। ইহার গূঢ় রহস্য বুঝিতে গেলে এই ভাবে বুঝিতে হয় যে, শ্রীল কেশব বাবু 'নব-বিধান' বলিয়া যে ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন, তাহাকে তিনি Eclectic religion বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। Eclectic ইক্লেকটিকের অর্থ সর্ব্ববৈধানিক। সর্ব্ব-বৈধানিক ধর্ম্ম বলিলে, সর্ব্ব-সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মতত্ত্বের বিমিশ্রণ বলিয়া বুঝিতে হয়, কিন্তু কেশব বাবু তাঁহার ধর্ম্মকে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মের "সার" বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি তাঁহার ধর্ম্মের নাম সর্ব্ববৈধানিক না দিয়া সর্ব্ববিধানের সার স্বরূপ দেশকালোপযোগী "নব-বিধান" রাখিয়াছিলেন। ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, কালের অপ্রতিহত গতিতে জাগতিক সমস্ত পদার্থ যে প্রকার নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইয়া আবির্ভাব এবং তিরোভাব রূপে আমাদের জ্ঞানের গোচর হয়, তদ্রূপ ধর্ম্ম এবং ধর্ম্ম-প্রচারকগণেরও কালে কালে আবির্ভাব এবং তিরোভাব হইতেছে। সুতরাং যে সমস্ত পদার্থের আবির্ভাব হইতেছে, তাহাকে নূতন পঞ্জিকার ন্যায় লোকে "নব-বিধান" বলিয়া অভিহিত করে, আর যাহার তিরোভাব হয়, তাহাকে পুরাতন পঞ্জিকার ন্যায় অকর্ম্মণ্য বলিয়া পরিগণিত করে। এই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া কেশব বাবু তাঁহার নববৈধানিক ধর্ম্মের প্রচার করেন। এই কথাটা পাশ্চাত্য ভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, Necessity of Time—সময়ের আবশ্যকতা অনুসারে সময়োপযোগী ধর্ম্মের Evolution অর্থাৎ আবির্ভাব হয়; এই নব আবির্ভূত ধর্ম্মকে "নব-বিধান" বলে। ইহার অভিপ্রায় এই যে, আজ কালকার খৃষ্টান, ব্রাহ্ম, মুসলমান, বৌদ্ধ এবং হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত শাক্ত, শৈব গাণপত্য, বৈষ্ণব

ইত্যাদি অনেক সম্প্রদায় (এক অপর হইতে) শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া জগতের নানা প্রকার অশান্তি করিতেছেন, এই অশান্তি নিবারণের নিমিত্ত আজকাল একটী সর্ব্ববৈধানিক ধর্ম্মের আবশ্যকতা হইয়াছিল, তাই Necessity of Time অর্থাৎ সময়ের আবশ্যকতা অনুসারে নববিধানের (Evolution) আবির্ভাব হইয়াছে, ইহাই কেশব বাবুর মত। ইহার মধ্যে আর একটী দার্শনিক বিচার আছে। সময়ের অনুকুল গতিতে যে পদার্থের Evolution বা আবির্ভাব হয়, তাহার সৃষ্টি করা কোন ব্যক্তিবিশেষের কার্য্য নহে, কালই ইহার কর্ম্মকর্ত্তা; ইহাই Evolution বা আবির্ভাব-বাদের মূলতন্ত্র। এই যুক্তি অনুসারে কেশব বাবু নিজকে "নব-বিধানের" সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিতেন না; অথচ তিনি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অনেক প্রকারে এই কথাই প্রকাশ করিতেন। তাহার সারমর্ম্ম বৈদিক ভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, বেদ-প্রকাশক ঋষিগণ সমাধিযোগে যে প্রকার ভগবৎ আদেশ স্বরূপ বেদবিধিসকল জীবের মঙ্গলের জন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, ঠিক সেই প্রকার কেশব বাবুও বেদ-প্রকাশক ঋষিদিগের ন্যায় সমাধিযোগে ঈশ্বর দর্শন করিতেন এবং ব্যবহারিক জগতের সর্ব্বকার্য্য এই ঈশ্বরাদেশ অনুসারে করিতেন, এবং তাঁহার শিষ্যদিগের নিকট এই সমস্ত ঈশ্বর আদেশ প্রকাশ করিতেন, ইহাই নববিধানের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য। নববিধানের এই "আদেশ-বাদ" সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্যদিগের মধ্যে ক্রমে ক্রমে প্রবেশলাভ করিতেছে, ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয়! এক্ষণে বিচার্য্য যে, নববিধানের এই প্রকার আদেশবাদ কেশব বাবু কোথা হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং ইহার শিক্ষাদাতা গুরুই বা কে? ইহার প্রত্যুত্তরে বলিতে হইবে যে, মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের নিকট হইতে কেশব বাবু তাঁহার এই আদেশবাদ শিক্ষা করেন; পরমহংস দেবই কেশব বাবুর গুরু ছিলেন। আবার পরমহংস দেবের গুরু-প্রণালী অনুসন্ধান করিতে গেলে এক ঘোর অপ্রিয় তত্ত্বের উৎঘাটন করিতে হয়। এজন্য সে সমস্ত বিষয়ের অবতারণা করা হইল না, কৌতুহলাক্রান্ত পাঠকগণ এইমাত্র বুঝুন যে, আউল, বাউল, সাঁই, দরবেশ, কর্ত্তাভজা, কিশোরী-সাধক, সহজীয়া আদি তান্ত্রিক, শাক্ত, বৈষ্ণব, সম্প্রদায় এই প্রকার "আদেশবাদী"। ইঁহাদের মধ্যে সহজীয়া-সম্প্রদায় অজ্ঞাত

সম্প্রদায় হইতে তেজবিহীন। ইঁহারা বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জয়দেব প্রভৃতি মহা-প্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী বৈষ্ণবদিগকে ইঁহাদের শ্রেণীভুক্ত বলিয়া প্রচার করেন। ইহার মধ্যে আর এক বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ইঁহারা মহাপ্রভু, নিত্যানন্দপ্রভু, অদ্বৈতপ্রভু এবং বৃন্দারণ্যবাসী আদর্শ ছয় গোস্বামীদিগকে পর্য্যন্ত যুক্তিতর্কের দ্বারা এই সহজীয়া-শ্রেণীভুক্ত বলিয়া সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। সম্মোহন, কুলার্ণব, রাধাতন্ত্র প্রভৃতি তন্ত্রানুসারে ইঁহারা আপন আপন সাধনতত্ত্ব এবং মত সংস্থান করিয়া থাকেন। ইঁহাদের ক্রিয়াকলাপ অতি গোপনীয়, এমন কি, একই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখার সাধকগণ অপরের নিকট আপন আপন সাধন-তত্ত্ব গোপন করিয়া থাকেন। এজন্য ইঁহাদিগের মত সম্পূর্ণভাবে জ্ঞাত হওয়া এক রকম অসাধ্য ব্যাপার।

অন্তঃশাক্তাঃ বহিঃ শৈবাঃ সভামধ্যে চ বৈষ্ণবাঃ।
নানারূপধরাঃ কৌলা বিচরন্তি মহীতলে॥

এই বচনের সার্থকতা, এই সম্প্রদায় যে প্রকারে করিয়া থাকেন, অন্য তান্ত্রিকেরা ততদূর করিতে সমর্থ হন না। ইঁহারা প্রথমতঃ কালী তারাদি কোন শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত হন; পরে সাধনার উৎকর্ষানুসারে চণ্ডীদাসের ন্যায় কৃষ্ণ-মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। ইহার মধ্যে বড় সুখের বিষয় এই যে, ইঁহাদের অধিকাংশই দক্ষিণাচারী, অর্থাৎ সাধারণ তান্ত্রিকদিগের ন্যায় স্থূল পঞ্চ-ম-কারের উপাসক নহেন। আবার অনেকে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি, পঞ্চ-রসিকদিগের ন্যায় স্ত্রীলোককে শক্তিরূপে অবলম্বন করিয়া, আপন আপন সাধনায় অগ্রসর হইয়া থাকেন। এই প্রকার সহজীয়া-সম্প্রদায়ের সাধন-তত্ত্ব অতি জটিল,সাধারণের গম্য নহে। ইঁহারা কালীকে বা ত্রিপুরা দেবীকে আদ্যাশক্তি বলিয়া দৃঢ়বিশ্বাস করেন, এবং তাঁহারা বলেন, পৃথিবীতে যেকালে এবং যেস্থানে ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য যত অবতার হইয়াছে, তাহাদের সমস্তই এই আদ্যাশক্তির রূপান্তর মাত্র, অর্থাৎ ধর্ম্মসংস্থাপক অবতার বা মহাপুরুষগণ, কালিকাদেবী বা ত্রিপুরাদেবীর রূপান্তর মাত্র। এই যুক্তি অনুসারে সহজীয়া-সম্প্রদায় নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া, দেশকালপাত্রানুসারে নানাবেশ ধারণ করিয়া সকল সাম্প্র-দায়িক ধর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটী একটী অঙ্গসাধন করিয়া অপর অঙ্গের সাধনায় প্রবৃত্ত হয়। এক্ষণে অসম্পূর্ণ ভাবে সহজীয়া-সম্প্রদায়ের যে যে বিষয়

বর্ণনা করা হইল, তাহা স্মরণ রাখিয়া পরমহংসদেবের আচার ব্যবহার এবং জীবনী অধ্যয়ন করিলে বুঝা যায় যে, পরমহংসদেব কালী বা শক্তি-উপাসক ছিলেন। এই শক্তি-সাধনায় যখন তিনি সিদ্ধ হইয়াছিলেন, তখন তিনি এই পরমহংস উপাধি গ্রহণ করেন।

এক্ষণে বিচার করিতে হইবে, "সিদ্ধ হইয়াছিলেন" বলিলে কি বুঝা যায়? পরমহংসদেবের শিষ্যদিগের মধ্যে, শাস্ত্রযুক্তি প্রদর্শন করিয়া তাঁহার মত সমর্থন করিতে পারেন, এপ্রকার লোকের সংখ্যা অতি বিরল। সুতরাং পরমহংসদেবের শিষ্যগণের নিকট কোন শাস্ত্রীয় তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া অতি দুষ্কর। যাহা হউক, ভক্তি শাস্ত্রানুসারে বিচার করিতে গেলে দেখা যায় যে, ভক্তিসাধকের সাধনার উৎকর্ষানুসারে অর্থাৎ প্রবর্ত্তক, সাধক এবং সিদ্ধাবস্থানুসারে তাঁহারা যথাক্রমে বাহ্যদশা, অর্দ্ধবাহ্যদশা এবং অন্তর্দ্দশা এই তিনটী দশা প্রাপ্ত হন। সাধারণ বিষয়ী লোকের বিদ্যা, বুদ্ধি এবং পাণ্ডিত্য থাকিলেও ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া সাধক কোন্ অবস্থায় পৌঁছিয়াছে, তাহা বুঝিতে অক্ষম হন। এজন্য বিষয়ী লোক-সকল সাধুসঙ্গ করিতে গিয়া কপটাচারিদিগের নিকট হইতে অধিকাংশ সময় প্রতারিত হইয়া থাকেন, অথবা প্রকৃত সাধুকেও অবহেলা করিয়া থাকেন। যাহা হউক, যাঁহারা পরমহংসদেবকে দেখিয়াছেন বা যাঁহারা তাঁহার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই অবগত আছেন যে, তিনি অনেক সময় অর্দ্ধ-বাহ্যাবস্থায় থাকিতেন, এবং সময়ে সময়ে তিনি অন্তর্দ্দশায়ও অবস্থান করিতেন। ইহার দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, তিনি যে একজন "সাধক" পুরুষ ছিলেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। শাস্ত্রানুসারে পরমহংসদেব সিদ্ধপুরুষ ছিলেন কিনা, তাহা বিচার সাপেক্ষ। বিচারক্ষম পাঠকগণ সাধক-ভক্তের এবং সিদ্ধ-ভক্তের লক্ষণ শাস্ত্রানুসারে বিচার করিলে অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে, সাধক-ভক্তগণের মধ্যে যাঁহারা যত অধিককাল অর্দ্ধবাহ্য দশায় এবং অন্তর্দ্দশায় অবস্থান করিতে সক্ষম হইবেন, ততই তাঁহাদের অবিকশিত অন্ত-র্নিহিত শক্তিসকল বিকশিত হইয়া অনেক প্রকার অলৌকিক শক্তি জন্মাইয়া থাকে। আজকালকার বাবু-পণ্ডিতেরা যাঁহার এই প্রকার অলৌকিক শক্তির বিকাশ দেখেন, দেশকাল বিবেচনা না করিয়া তাঁহাকেই অবতার জ্ঞান করিয়া তাঁহার পদানত হইয়া থাকেন। এই প্রসঙ্গে একটি শাস্ত্রীয় যুক্তি বুঝিতে হইবে যে, বেদ, উপনিষৎ আদি সৎশাস্ত্রে পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনা আছে—

"জীবের ইন্দ্রিয়গণকে উদ্‌গীথ অথবা কোন আদর্শ প্রতীকের যোগে সাধনা করিলে, যে জীবের যে ইন্দ্রিয়ের যতদূর শক্তি গূঢ়ভাবে থাকে, তাহার বিকাশ হইয়া "আদর্শের অনুরূপ শক্তিসম্পন্ন হইয়া" লোক সাধারণের নিকট ঈশ্বর স্বরূপ বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু মুখ্য প্রাণের বা ভগবৎ-সাধনা ইহাপেক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহার ভাবার্থ এই যে, তান্ত্রিক বা প্রাকৃতিক, কোন জীব অথবা দেবতাকে প্রতীক বা আদর্শ করিয়া, তাঁহার সাধনায় নিযুক্ত হইলে সাধকের গূঢ়শক্তি বিকশিত হইয়া জীবের প্রেতাত্মা, দেবের দেবাত্মার অনুরূপ আবেশপ্রাপ্ত হইতে পারেন, অথবা সাধকের এই প্রকার সাধনার পরিপাক দশায় স্থায়ীরতি জন্মিবার ক্রমানুসারে আদর্শের অনুরূপ শক্তিশালী হইতে পারেন; কিন্তু মুখ্যপ্রাণ বা ভগবৎ-সাধনা ইহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, অর্থাৎ তথায় শ্রীভগবানের নামের প্রতীক বা উপলক্ষ্য স্থির করিয়া ভগবৎ নামের সাধনায় নিযুক্ত হইতে হয়। যে ভক্ত এই প্রকার নামের প্রতীক অবলম্বন করিয়া প্রবর্ত্তক অবস্থা হইতে সাধক অবস্থায় উন্নীত হন, তাঁহার তখন এই প্রকার অপ্রাকৃত সাধনার অনুসঙ্গে সাধকের অবিকশিত বৃত্তিসকল বিকশিত হইতে থাকে। প্রকৃত ভগবৎ-সাধক নিজে তাহা অনুভব করিতে পারেন না, কিন্তু উপযুক্ত ব্যক্তিসকল ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। রাধাকৃষ্ণ দেবের সাধন-তত্ত্বের বিচার করিতে যাওয়া নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য; কেননা, কোনও সাধকের সাধন-তত্ত্ব অন্য কেহ বুঝে না, তবে বাহ্য আচারব্যবহারে যাহা জানা যায়, তাহা লইয়া সকলেই বিচার করিয়া থাকেন। এই ব্যবহার অনুসারে পরমহংসদেবের সাধন-তত্ত্ব বিচার করিতে গেলে দেখা যায়, তিনি প্রথমে শক্তি-উপাসক ছিলেন। এই প্রকার উপাসনায় উৎকর্ষ লাভ করিয়া, spiritualist দিগের মত, তিনি কখন মহম্মদের, কখন যিশুখৃষ্টের, কখন অন্যান্য দেবদেবী এবং অবতারগণের আংশিক আবেশ প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু কখন কোন ব্যক্তির, অবতারের বা দেবদেবীর পূর্ণ-আবেশ প্রাপ্ত হইতেন না, কারণ এই প্রকার অপূর্ণ আবেশপ্রাপ্ত হওয়া মাত্র জীবের সসীম ধর্ম্ম, আর পূর্ণ আবেশ হওয়া ভগবদ্ধর্ম্ম। কেশব বাবু যদি শাস্ত্রযুক্তি মানিতেন, 'আত্মপ্রত্যয়কে' যদি ভুল বলিয়া বুঝিতেন, তাহা হইলে তিনি আর আবেশবাদী হইতেন না। আমরা ১৮৮১ সালে তাঁহার

সহিত আলাপে জানিয়াছিলাম যে, তাঁহার আদেশবাদ শাস্ত্রবিরুদ্ধ। ভক্ত-প্রবর চণ্ডীদাস কোন বিষয়ে সন্দিহান হইলে, তাঁহার মৌলিক আরাধ্যা "বাসুলীদেবীর" নিকট ধ্যানস্থ হইয়া থাকিতেন, এবং তাঁহার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া, সন্দেহভঞ্জন করিতেন। পরমহংসদেবও তাঁহার মৌলিক আরাধ্যা শক্তি-দেবীর আদেশ গ্রহণ করিতেন। কেশব বাবু আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, "চিত্ত-সংযম করিয়া শ্রীভগবানের ধ্যান করিতে করিতে trance অর্থাৎ সমাধিপ্রাপ্ত হইলে ঈশ্বর-দর্শন হয় এবং তিনি তখন আদেশ প্রদান করেন।" এই ঈশ্বর-দর্শন-প্রকরণ লইয়া তাঁহার সহিত অনেক তর্কবিতর্ক হয়। পরে তিনি স্বীকার করেন যে, ঈশ্বর-দর্শন অর্থে তিনি ঈশ্বরের উপলব্ধি বলিয়া বুঝেন। পরে তাঁহার সহিত ঈশ্বর-দর্শন লইয়া পুনরায় তর্ক আরম্ভ হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, "ঈশ্বর-উপলব্ধিকে আপনি ঈশ্বর-দর্শন বলেন কেন?" তাহার প্রত্যুত্তরে কেশব বাবু বলিয়াছিলেন যে, "শাস্ত্র-প্রকাশক মুনি-ঋষিগণ ঈশ্বর-উপলব্ধিকে "ঈশ্বর-দর্শন" বলিয়া গিয়াছেন।" পরে যোগশাস্ত্রের প্রমাণ দিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়া হয় যে, তাঁহারা যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া ঈশ্বর-দর্শন করিতেন বলিয়া মনে করিতেছেন, তাহা শাস্ত্রানুমোদিত প্রণালী নহে, এবং এই প্রকার শাস্ত্রবিরুদ্ধ সমাধি বা trance অবস্থায় ঈশ্বর বলিয়া যে কাল্পনিক সত্তার অনুভূতি বা দর্শন হয়, তাহা বাস্তবিক ভগবত্তত্ত্ব নহে। কেশব বাবু সংস্কৃত জানিতেন না, এবং শাস্ত্রের ও শাস্ত্র-প্রণেতা ঋষিদিগের প্রতি তাঁহার দৃঢ় ভক্তিও ছিল না, একারণে তিনি এই গুরুতর বিষয় ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেন না। এজন্য মহাত্মা ডাক্তার নবীনচন্দ্র পাল মহাশয় কৃত Yog Philosophy (যোগদর্শন) নামক একখানি ইংরাজি যোগশাস্ত্র তাঁহাকে দেওয়া হয়। যোগ-সাধনায়, যম নিয়মাদি করিয়া আটটী অঙ্গ; যোগের এই আটটী অঙ্গ স্কুলের আটটী ক্লাশ বা শ্রেণীর স্বরূপ; এক শ্রেণীর পাঠ কিছু কাল ধরিয়া সাধনা করিয়া সিদ্ধ হইলে যে প্রকার উপরের শ্রেণীতে উন্নীত হয়, এই প্রকার বহুকালের সাধনার ফলে ছাত্র ক্রমশঃ প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হয়; ঠিক তদ্রূপ অষ্টাঙ্গযোগে এক অঙ্গ বহুকাল ধরিয়া সাধন করিয়া সিদ্ধ হইলে দ্বিতীয় অঙ্গের সাধনায় নিযুক্ত হইতে হয়; এই প্রকার অষ্টাঙ্গ-যোগের সর্ব্বোচ্চ অঙ্গ 'সমাধি'। এই সমাধি অবস্থায় পৌঁছিতে বহুকালের আবশ্যক; এমন কি,

জীবের জন্মজন্মান্তর কাল পর্য্যন্তও আবশ্যক হয়। তাহার পর সাধক সমাধি অবস্থায় পৌঁছিলেই যে ঈশ্বর-দর্শন হয়, এমত নহে।

সমাধি আবার দুই প্রকার,—সবিকল্প এবং নির্ব্বিকল্প সমাধি। এই নির্ব্বিকল্প সমাধি-যোগে "স্বয়ংপ্রভা" জ্ঞান হয়। ইহার ভাবার্থ এই যে, আমাদের যে বাহ্য ব্যবহারিক জ্ঞান, তাহা অস্মদ্ এবং যুষ্মদ্ জ্ঞানের সহিত সাপেক্ষ সম্বন্ধযুক্ত (পূর্ব্বে এই বিষয় বিশেষ করিয়া বুঝান হইয়াছে), নির্ব্বিকল্প সমাধি যোগে এই প্রকার খণ্ডজ্ঞান বা সাপেক্ষ জ্ঞান বিদূরিত হইয়া নিরপেক্ষ বা স্বয়ংপ্রভা জ্ঞানের উদয় হয়। সাধক যদি ভক্তিমার্গী হন, তবে এই অবস্থায় তাঁহার সচ্চিদানন্দবিগ্রহ রূপ ভগবদ্দর্শন হয়। সাধক যদি যোগী হন, তবে তাঁহার আত্মার দর্শন হয়; আর সাধক যদি জ্ঞানমার্গী হন, তবে তাঁহার জ্যোতিঃ স্বরূপ ব্রহ্মদর্শন হয়। পরে কথা প্রসঙ্গে আমরা কেশব বাবুকে বুঝাইয়া দিই যে, যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে ভগবদ্দর্শন করেন, তাঁহাদিগকে সিদ্ধপুরুষ বলে। সিদ্ধপুরুষগণ আর বাহ্যজগতের কর্ম্মকাণ্ডে লিপ্ত হন না, তাঁহাদের শরীর সিদ্ধ হয়; রোগ, শোক, দুঃখ, ভয় কিছুই থাকে না।

এক্ষণে যাঁহাদের বিচার শক্তি আছে, তাঁহারা বুঝুন যে, নববিধানের ধর্ম্ম বেদ এবং যুক্তিবিরুদ্ধ। পরমহংসদেবের শিষ্যদিগের মধ্যে সকল সম্প্রদায়ের লোক আছেন; তাহার মধ্যে একদল তান্ত্রিক, ইঁহারা শক্তি উপাসক; আর এক দল কৃষ্ণ-উপাসক, ইঁহারা বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দেন। ইঁহারা কোন্ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব বা শাক্ত, তাহা তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে কেহ বুঝিতে পারেন কিনা, তাহা আমরা জানি না। পরমহংসদেবের শরীরের সেবাইতদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ স্বামী যাঁহাকে অনেকে 'পাহাড়ীয়া বাবা' বলিয়া অভিহিত করেন, তিনি একজন চতুর্থাশ্রমী তান্ত্রিক শাক্ত, তিনি আমাদের নিকট স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে, পরমহংসদেব জীবন্ত-কালীর উপাসনা করিতেন। কেশব বাবু পৌত্তলিক ছিলেন না, এজন্য একদিন পরমহংসদেব, কেশব বাবুর হস্ত ধরিয়া কালিকা প্রতিমার নাসারন্ধ্রের নিকট রাখিয়া, কালিকা-দেবী নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতেছেন, ইহা দেখাইয়া তাঁহার বিস্ময় জন্মাইয়াছিলেন। পরমহংসদেবের প্রধান সেবক এই পাহাড়ীয়া বাবা, আরও সাক্ষ্য দেন যে, পরমহংসদেব যখন গোপিভাবের সাধনা করেন, তখন তিনি এপ্রকার

তন্ময় হইয়াছিলেন যে, স্ত্রীলোকসুলভ মাসিক ঋতুকালে রক্তস্রাব হইত, ইহা তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কেবল ইহাও নয়, এই বাবাজী আরও সাক্ষ্য দেন যে, পরমহংসদেব যখন হনুমান-মন্ত্রের সাধনা করেন, তখন পরমহংসদেব বৃক্ষোপরেই দিবারাত্র বাস করিতেন, এবং এই সময় তাঁহার লেজ হইয়াছিল, ইহাও বাবাজী এবং অনেক শিষ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আবার পরমহংসদেবের সুবিখ্যাত শিষ্য শ্রীল বিবেকানন্দস্বামী বজ্র-নিনাদে ঘোষণা করিতেন যে, "পৃথিবীতে যত অবতার আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারা কেহই বলিতে পারেন না যে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন; কিন্তু পরমহংস-অবতারে, পরমহংসদেব, শ্রীমুখে অনেকবার প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিনি আবশ্যক মতে ঈশ্বর-দর্শন করিতেন এবং তাঁহার আদেশপ্রাপ্ত হইতেন।" পরমহংসদেবের শিষ্যগণের যদি শাস্ত্রজ্ঞান অথবা ভগবৎ-বস্তুর জ্ঞান থাকিত, তবে তাঁহারা ঐই প্রকার বেদাদি সৎশাস্ত্র-বিরোধী বাক্যের অবতারণা করিতেন না। কেননা, বেদ পরিষ্কার ভাবে জগৎকে বুঝাইয়াছেন যে,—

দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ।

মুণ্ডকোপনিষদ্।২মুঃ ১খঃ॥

দিব্য, মূর্ত্তিরহিত, সর্ব্বপূর্ণ, বাহ্যাভ্যন্তরে নিরন্তর ব্যাপক, অজ অর্থাৎ জন্ম মরণ ও শরীর-ধারণাদি রহিত, শ্বাস প্রশ্বাস এবং শরীর ও মনের সম্বন্ধ রহিত, শুদ্ধ এবং শ্রেষ্ঠ অক্ষর অর্থাৎ নাশরহিত পুরুষ হিরণ্যগর্ভ হইতে শ্রেষ্ঠ। ইহাতে বুঝিতে হইবে, ভগবত্তত্ত্ব অবাতপ্রাণিত, অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্বের শ্বাস প্রশ্বাস নাই, তিনি মায়াগন্ধহীন চিন্ময়-বস্তু। পরমহংসদেবের "কালী" যদি চিন্ময়-বস্তু হন, অর্থাৎ তিনি যদি চিদানন্দময়ী হন, তবে তাঁহার জীবধর্ম্ম-সুলভ নিশ্বাস প্রশ্বাস থাকিবে কেন?

এক্ষণে গোপীভাবের কথা—

রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণ এবং রাসেশ্বরী শ্রীরাধা এবং তাঁহার কায়ব্যূহস্বরূপ গোপীগণ ইঁহারা সকলেই শ্রীমদ্ভাগবৎ গ্রন্থ অনুসারে চিন্ময় বস্তু।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থেও, শ্রীকৃষ্ণ, গো, গোপগোপী, রাখাল এবং বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন, যমুনাদি স্থানকে চিন্ময়-বস্তু বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, যথা—

"কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণ-বিগ্রহ, স্থান, পরিবার।
প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, সব চিদাকার॥

ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, শ্রীকৃষ্ণ যে প্রকার চিদ্বস্তু, গোপীগণও তদ্রূপ চিদ্বস্তু। চিদ্বস্তুর কি কখন প্রাকৃতিক স্ত্রীলোকের ন্যায় ঋতু হয় কিংবা গর্ভ হয় অথবা জরায়ুজ সন্তান হয়?

এক্ষণে ঈশ্বর-দর্শনের কথা—

পূর্ব্বে এ বিষয় বিশদভাবে দেখান হইয়াছে, পুনরায় বলা যাইতেছে যে, সাধন ভজন দ্বারা যাঁহাদের, মন, প্রাণ, শরীর, বিশুদ্ধ হইয়া, সিদ্ধাবস্থাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের ঈশ্বর-দর্শন হয় অথবা যাঁহারা যোগসাধনা করেন, তাঁহারা যোগের অষ্ট অঙ্গ বহুকালব্যাপী সাধনার ফলে শরীর ও মন বিশুদ্ধ হইয়া, সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে তাঁহাদের ঈশ্বর দর্শন হয়। যাঁহাদের ঈশ্বর-দর্শন হয়, তাঁহাদের দেহে কোন প্রকার রোগ থাকে না, ঈশ্বর-দর্শনজনিত পুরুষার্থ সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ হয় বলিয়া কোন প্রকার কার্য্যের চেষ্টা থাকে না এবং সর্ব্বদাই অন্তর্দশা প্রাপ্ত হইয়া ভগবৎ-আনন্দ-রস-পানে নিরত থাকেন; ইহার প্রমাণ যথা,—

পবিত্রং তে বিততং ব্রহ্মণস্পতে প্রভুর্গাত্রাণি পর্য্যেষি বিশ্বতঃ। অতপ্তনূন তদামো অশ্নুতে শৃতাস ইদ্বহন্তীস্তৎসমাশত॥ ১॥ তপোষ্পবিত্রং বিততং দিবস্পদে॥ ২॥

ঋঃ। মঃ ৯। সূঃ ৮৩। মন্ত্র ১।২॥

ইহা ঋগ্বেদের বচন, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, হে ব্রহ্মাণ্ড এবং বেদের পালক প্রভু সর্ব্বসামর্থ্যযুক্ত ও সর্ব্বশক্তিমান্! তুমি আপনার ব্যাপ্তিদ্বারা সংসারের সকল অবয়ব ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছ। ব্রহ্মচর্য্য, সত্যভাষণ, শম, দম, যোগাভ্যাস, জিতেন্দ্রিয়, ও সৎসঙ্গাদি তপশ্চর্য্যা দ্বারা যে ব্যক্তি শুদ্ধ হইয়াছে, সেই ব্যক্তি তাদৃশ অনুষ্ঠান করতঃ উত্তম প্রকারে তোমার উক্ত শুদ্ধ স্বরূপকে প্রাপ্ত হয়। প্রকাশস্বরূপ পরমেশ্বরের সৃষ্টিতে বিস্তৃত পবিত্রতাচরণরূপ তপস্যা যে করে, সেই-ই

পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হয়। অন্তঃকরণযুক্ত অপরিপক্ব আত্মা বা জীব তোমার সেই ব্যাপক এবং পবিত্র স্বরূপকে প্রাপ্ত হয় না। এই বেদ-বচনের দ্বারা বুঝিতে হইবে, অন্তঃকরণ অর্থাৎ মনযুক্ত জীবকে অপরিপক্ব আত্মা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কেননা, মনসংযুক্ত জীবের ভগবদ্দর্শন হয় না; কারণ যে ব্যক্তির যতদিন মনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন তাহার বাহ্যপ্রতীতি থাকিবেই থাকিবে, এবং মন বাহ্য বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে আবদ্ধ হওতঃ ভগবদ্বিমুখী হইয়া পড়িবে, এবং রোগশোকাদি নানাপ্রকার অশান্তি ভোগ করিতে থাকিবে। এই বেদবাক্য মনে রাখিয়া বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, পরমহংসদেবের এবং কেশববাবুর আহার নিদ্রাদি দেহধর্ম্ম, রোগ-শোকাদি মনের কষ্ট, ধর্ম্ম-প্রচার, উপদেশ প্রদান, নিজকে অবতার-জ্ঞানে পূজা গ্রহণ করা ইত্যাদি সর্ব্ব-প্রকার, অন্তঃকরণযুক্ত অপরিপক্ব আত্মার বা জীবের কার্য্য তাঁহাদিগের ছিল, সুতরাং এই শাস্ত্রযুক্তি অনুসারে বলিতে হইবে যে, সাধন-সময় Trance বা সমাধি-অবস্থায় পরমহংসদেব কিম্বা কেশববাবু যে সমস্ত কাল্পনিক পদার্থ দেখি-তেন, তাহাকেই ভ্রমক্রমে ঈশ্বর-বস্তু বলিয়া জ্ঞান করিতেন, তাই তত্ত্বজ্ঞানাভিজ্ঞ লোকদিগকে বেদ এই প্রকারে বুঝাইয়াছেন, যথা—

নীহারধূমার্কানিলানলানাং খদ্যোতবিদ্যুৎ-স্ফটিক-শশিনাম্‌।
এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে॥ ১১॥

পৃথ্ব্যপ্‌তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে। ন তস্য রোগো ন জরা ন দুঃখং প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্‌॥১২॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। ২য় অধ্যায়॥

ইহার ভাবার্থ এই যে, যোগক্রিয়াকালে, নীহার, ধূম, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি, খদ্যোৎ, বিদ্যুৎ, স্ফটিক ও চন্দ্র এই সমুদয়ের রূপ, ব্রহ্মপ্রকাশের নিমিত্ত প্রথমে আবির্ভূত হয়॥১১॥

মৃত্তিকা, জল, অগ্নি ও আকাশ সমুত্থিত হইলে, পঞ্চাত্মক যোগগুণ প্রকাশ-মান হইলে, যোগাগ্নিময় শরীরপ্রাপ্ত সাধকের রোগ, জরা ও দুঃখ থাকেনা॥১২॥

এই উপনিষৎ-বচন অনুসারেও পরিষ্কার বুঝাইতেছে যে, সিদ্ধাবস্থার পূর্ব্বেই সাধকের রোগ, জরা এবং দুঃখ থাকে না। কিন্তু পরমহংসদেবের শাস্ত্রানুসারে

কঠিন প্রায়শ্চিত্তযোগ্য রোগে (cancer) মৃত্যু হইয়াছিল, বহুঅর্থব্যয়ে প্রতিষ্ঠাবান্ চিকিৎসকগণ চিকিৎসা করিয়াও, তাঁহাকে দুর্ব্বিষহ রোগক্লেশ হইতে মুক্ত করিতে পারেন নাই। কেশব বাবুও অশেষ রোগের ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন, সুতরাং এই প্রকার প্রাকৃতিক জীবধর্ম্মযুক্ত বা মনসংযুক্ত অপরিপক্ক জীবকে অবতার বলিয়া বর্ণনা করা শাস্ত্রসঙ্গত নহে।

এই প্রসঙ্গে পরম ভাগবত প্রভুপাদ

শ্রীল বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

মহাশয়ের ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধে সমালোচনা করা নিতান্ত প্রয়োজন। তাঁহার জীবনী এক্ষণে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তক পাঠ করিলে ভক্তি-শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে, তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর বংশসম্ভূত হইয়াও, প্রকৃত ভক্তসুলভ একমাত্র লোভপরবশ হইয়া নানাবিধ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের জ্ঞানের বিচার, কর্ম্মের অনুষ্ঠান, যোগের সাধনা করিয়া, কিছুতেই তাঁহার সান্নিপাতিক রোগীর পিপাসার ন্যায়, অতৃপ্ত ধর্ম্ম-পিপাসা নিবৃত্ত হইল না; পরে যখন তাঁহার এই আর্ত্তি, চরম সীমায় উঠিল, তখন দীনদয়াল নিত্যানন্দপ্রভু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তিনি স্বামিজীর দেহে আবেশ রূপে আবির্ভূত হইয়া, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সারের সার যে সূক্ষ্মতত্ত্ব, তাহা এক কথায় বুঝাইয়া দিলেন যে, তুমি

"ওঁ হরি"

এই নাম জপ কর, এই নামই ব্রহ্ম। যুগধর্ম্মোপযোগী এই সাধন-মন্ত্রের অর্থ অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহার ভক্তগণের অগোচর ছিল। পরে গোস্বামীজীর তিরোভাবের পরে তাঁহার শিষ্যগণ ইহার অর্থ বুঝিবার জন্য বিশেষ ইচ্ছুক হয়েন এবং পুরীক্ষেত্রস্থ গোস্বামীজীর সমাধি-মন্দিরে তাঁহার পুত্র যোগজীবন গোস্বামী 'হত্যা' দেন, তাহাতে তিনি আবেশপ্রাপ্ত হইলেন যে, মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে ইহার অর্থ আছে। এই প্রকার আবেশ বা আদেশবাদ, যুক্তি এবং শাস্ত্র-বিরুদ্ধ; সুতরাং ইহা লইয়া কোন বিচার চলে না, ইহাতে দুঃখ করিয়া কি করিব? সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে মহাপুরুষদিগের পবিত্র জীবনী অজ্ঞান শিষ্যগণ বিকৃতভাবে প্রকাশ করিয়া কলুষিত করিয়া থাকে। যাহা হউক, "ওঁ হরি,"

ইহাই জপমন্ত্র। "ওঁ নাম ব্রহ্ম" ইহা ভগবৎ পূজার প্রতীক। বৈদিক শাস্ত্রানুসারে এই উভয় তন্ত্রের অর্থ করিতে গেলে বুঝিতে হইবে যে, ইহা বেদবাক্য। বেদ অপৌরুষেয়, সুতরাং স্বতঃপ্রমাণ। অপৌরুষেয় অর্থাৎ ভগবদ্বাক্যের অর্থ ক্ষুদ্রজীব কখন করিতে পারে না। কাজেই বেদের অর্থ বেদে বা বৈদিক শাস্ত্রে প্রকাশ করিবে। এই যুক্তি অনুসারে বুঝিতে হইবে যে, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র বেদ নহে, অথবা বৈদিক শাস্ত্র নহে, বরং মহানির্ব্বাণ তন্ত্র বেদ-বিরোধী; কেননা, মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের দ্বিতীয়োল্লাসে পরিষ্কার ভাষায় লেখা আছে যে,— ১। বেদ অপেক্ষা তন্ত্র শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। ২। কলিকালে বৈদিক-মন্ত্র-সকল নির্ব্বীর্য্য হইবে। এ তন্ত্রে আরও বলে যে, ৩। কলিকালে, বীরভাবের সাধনাই শ্রেষ্ঠ। বীরভাবের অর্থ এই যে,স্থূল পঞ্চম-কার—মৎস্য,মাংস, পরস্ত্রী, মদ্য এবং মুদ্রা (মদের চাট্) এই পঞ্চ-ম-কার কুলাচারের প্রথানুসারে সাধন করিলে কলিকালে শীঘ্র মোক্ষ হয়। ইহাদ্বারা বুঝিতে হইবে যে, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র কখনও কোন প্রকার প্রামাণ্য গ্রন্থ নহে। যাহা হউক, বেদ ও উপনিষদ্ অনুসারে গোস্বামীজীর প্রাপ্ত মন্ত্রের অর্থ করিতে চেষ্টা করিলে নিম্নলিখিত প্রকারে এক রকম অর্থ হইতে পারে।

"ওঁ হরি। নাম ব্রহ্ম।"

গোস্বামীজী দুইটী মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে প্রথমটী (ওঁ হরি) জপমন্ত্র, অর্থাৎ "ওঁ" এই সর্ব্ব-সিদ্ধিকর বীজ যোগ করিয়া, হরি, এই নাম জপ করিতে হইবে। দ্বিতীয় মন্ত্র নামব্রহ্ম অর্থাৎ ওঁ এই ভগবৎ নামই "ব্রহ্ম" বা শ্রীভগবানের তুরীয় অবস্থা। সাম্প্রদায়িক ভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয়, এই "ব্রহ্ম" বাঙ্মনাতীত তুরীয় কৃষ্ণ। বৈদিক ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, এই "ওঁকার"ই শ্রীভগবান্ বা তাঁহার "প্রতীক"।

ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্যশঃ ॥ যজুঃ ॥

যিনি সমস্ত জগতে ব্যাপক, সেই পরমাত্মার প্রতিমা পরিমাণ-সাদৃশ অথবা তাঁহার প্রতিমা বা মূর্ত্তি নাই—যজুর্ব্বেদের উপদেশানুসারে ইহাই বুঝিতে হইবে। নিত্যানন্দ প্রভু গোঁসাইজীকে আশ্রয় করিয়া দয়াপরবশ হইয়া বৈষ্ণব-মণ্ডলীকে

বুঝাইতেছেন যে, শ্রীভগবানের ওঁ নামের প্রতীক সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই প্রকার উপদেশের প্রধান কারণ বুঝিতে গেলে দেখা যায়, আজকাল গুরুগিরি ব্যবসায়ীগণ প্রাকৃতিক প্রতীক বা প্রতিমা পূজা করিবার অনুমতি দিয়া তাঁহাদের শিষ্যগণকে প্রাকৃতিক বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া ঘোর নরকে পতিত করিতেছেন। ইহার ভাবার্থ এই যে, বেদ পরিষ্কার ভাষায় জগৎকে বুঝাইয়াছেন,—

অন্ধংতমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয়ঃ ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ॥ যজুঃ

ইহার বিস্তৃত অর্থ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সংক্ষেপ অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি প্রকৃতিকে বা প্রকৃতি-সৃষ্টবস্তুকে ভগবান্ জ্ঞান করিয়া তাহার উপাসনা করে, তাহাকে ঘোর নরকে পতিত হইতে হইবে। বেদের এই মর্ম্ম গ্রহণ করতঃ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীশ্রীগোবিন্দ-বিগ্রহ উপলক্ষ্য করিয়া সাধারণ বিগ্রহোপাসকদিগকে এই প্রকারে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে, যথা ;—

"সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-সুত ইথে নাহি আন।
যেবা অজ্ঞে করে তাঁরে প্রতিমাদি জ্ঞান॥
সেই অপরাধে তার নাহিক নিস্তার।
ঘোর নরকেতে পড়ে কি বলিব আর॥"

এই বেদ এবং বৈষ্ণবশাস্ত্রের সৎপরামর্শ মনে রাখিয়া চিন্তাশীল ব্যক্তি দেশের প্রতি একবার দৃষ্টি করুন, তাহাতে দেখিতে পাইবেন, দেশে যেস্থানে বিগ্রহের সেবা প্রচলিত আছে, তাহার প্রায় সর্ব্বত্রই অনুপযুক্ত ব্যক্তির উপর এই অতি দুঃসাধ্য কার্য্যের সাধনভার অর্পণ করাতে দেশস্থ প্রায় সমস্ত বিগ্রহ-উপাসক প্রাকৃতিক বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ভগবদ্বিমুখী হইতেছে, দুঃখের বিষয় বলিতে কি, গুরুপুরোহিতদিগের মূর্খতার দোষে দেশের এমনই দুর্দ্দিন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে যে, যাঁহাদের বাটীতে প্রত্যহ বিগ্রহের সেবা হইয়া থাকে, ভগবৎ-বিষয় চিন্তা বা ধ্যান করিবার সময় আপন আপন বাটীস্থ প্রাকৃতিক-বিগ্রহ-মূর্ত্তি তাঁহাদের হৃদয়-পটে সমুদিত হয়। ইঁহারা সৎগুরুর অভাবে বুঝিতে পারেন না যে, "শ্রীভগবান্ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ স্বরূপ" অর্থাৎ তিনি চিন্ময়-বস্তু, কাহার প্রতি কি প্রকার কৃপা করিয়া কি মূর্ত্তিতে দর্শন

দিবেন, তাহা জীবের সসীম বুদ্ধি অথবা কল্পনার গম্য নহে। এই সমস্ত যুক্তি পরিত্যাগ করিয়া যদি আমরা তাঁহাকে প্রাকৃতিক প্রতিমা বলিয়া কল্পনা করি, তবে বেদ এবং বৈষ্ণবশাস্ত্রানুসারে নরকে পতিত হইতেই হইবে। ইহাতে বুঝিতে হইবে, পরম দয়াল নিত্যানন্দ প্রভু, গোস্বামী মহাশয়ের পবিত্র শরীর আশ্রয় করিয়া, জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, তোমরা প্রাকৃতিক প্রতীক্ বা প্রতিমা পরিত্যাগ করিয়া, ভগবৎ-নামের প্রতীকের প্রতিষ্ঠা কর, তাহা হইলে আর প্রাকৃতিক বন্ধনে পড়িয়া ভগবৎ-বিমুখী হইয়া নরকে যাইতে হইবে না। নিত্যানন্দ প্রভু প্রকাশ্য লীলার সময় কাল্‌নায় এই নাম-ব্রহ্ম বা ভগবৎ নামের প্রতীক্ স্থাপনা করিয়া জগৎকে পূর্ব্বে একবার বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, মুরারি গুপ্তের কড়্‌চা পাঠে জানা যায় যে, শ্রীশ্রীমহাপ্রভু তাঁহাকে এই নামের প্রতীক্ স্থাপন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। নামের প্রতীক্ স্থাপনা এবং তাহার পূজা করা শাস্ত্রসঙ্গত কি না, তাহাতে যাঁহাদের সন্দেহ হয়, তাঁহারা এই পুস্তকের 'ওঁকার' বিষয়ক প্রস্তাব ভাল করিয়া পাঠ করিবেন অথবা ছান্দোগ্যোপনিষদের ৪র্থ খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে ওঁকার-তত্ত্ব পাঠ করিবেন।

এক্ষণে হরিনাম জপের কথা।

গোস্বামী মহাশয় হরিনাম মহামন্ত্র জপ করিবার প্রণালী প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, হরি হরি বলিয়া লোকসাধারণ যে প্রকার হরিনাম করে, তাহাতে নাম-জপের ফল হয় না, কেন না, সমগ্র বেদে বিশেষতঃ ছান্দোগ্যোপনিষদের চতুর্থ খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে একটী বিস্তৃত আখ্যায়িকা প্রদর্শন করাইয়া অজ্ঞান জীবকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, ওঁকার পরিত্যাগ করিয়া কোন বৈদিক কর্ম্ম করিলে বা কোন মন্ত্র জপ করিলে কেহ কখনও সুফল প্রাপ্ত হইতে পারে না, এই সমস্ত বেদবচন ও তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা ওঁকার বিষয়ক প্রস্তাবে বলা হইয়াছে, পাঠ করিলে সবিশেষ বুঝিতে পারিবেন। এক্ষণে যাহা কিছু বলা হইল, তাহাতে বুঝিতে হইবে, হরিনাম মহামন্ত্র জপ করিতে হইলে, ওঁ অক্ষর, হরি নাম করিবার পূর্ব্বে উচ্চারণ করা বেদের বিধি বা শ্রীভগবানের আজ্ঞা। আবার অর্থবিহীন মন্ত্র একেবারে নিষ্ফল, ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রের কথা; সুতরাং হরিনামের অর্থ বুঝিতে হইবে। মহাপ্রভু হরেকৃষ্ণ নামের অর্থ করিতে গিয়া, জগৎকে

বুঝাইয়াছেন যে, হরণ করে যে, সেই "হরি"। এই হরি শব্দের সম্বোধনে "হরে" হইয়াছে, তাই মহাপ্রভু বুঝাইয়াছেন, হরেকৃষ্ণ পদের মধ্যে হরে অর্থাৎ হরণ করে শব্দ, কৃষ্ণ শব্দের পূর্ব্বে আছে বলিয়া, বুঝিতে হইবে কৃষ্ণকে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মনকে যে হরণ করে, সেই "হরি"। শ্রীরাধা ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের মন কেহ হরণ করিতে পারে না, এই অভিপ্রায়ে হরে বা হরি-শব্দে শ্রীরাধা বুঝাইয়াছে। এক্ষণে বিচার্য্য যে, যে স্থানে হরি শব্দ কৃষ্ণ শব্দের সহিত সমাবিষ্ট না থাকে, তথায় হরি শব্দের সঙ্গতি বা অর্থ কি হইবে, অর্থাৎ ভগবৎ-বাচক হরি শব্দ দ্বারা কাহাকে বা কাহার মনকে হরণ করা বুঝাইবে? বেদ এই অতি গুরুতর সন্দেহের মীমাংসা অতি পরিষ্কার রূপে করিয়াছেন, যথা—

তদেতন্মিথুনমোমিত্যেদস্মিন্নক্ষরে। সংসৃজ্যতে যদা বৈ মিথুনৌ সমাগচ্ছত আপয়তো বৈ তাবন্যোন্যস্য কাম্ ॥ ৬ ॥

ছান্দোঃ ॥ অঃ ১ খঃ ১ ॥

ইহা ছান্দোগ্যোপনিষদের বচন, ইহার বিস্তৃত অর্থ ওঁকার বিষয়ক প্রস্তাবে বলা হইয়াছে। এক্ষণে সংক্ষেপে ইহার ভাবার্থ বলা যাইতেছে যে, ঐ মিথুনীভূত বাক্ ও প্রাণ, ওঁ এই অক্ষরে সংসৃষ্ট রহিয়াছে, ঐ বাক্ ও প্রাণরূপ মিথুন যখন পরস্পর সমাগচ্ছ বা সংযুক্ত হন, তখন একটী অপরটীর কামনা পূরণ করেন; এইরূপে তৎসংসৃষ্ট ওঁকার সর্ব্বকামাপ্তিরূপ গুণদ্বারা পরিপুষ্ট হয়েন॥৬॥

তেন তং হ বৃহস্পতিরুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রে এতমু এব বৃহস্পতিং মন্যন্তে বাগ্ঘি বৃহতী তস্যা এষ পতিঃ ॥ ১১ ॥

ছান্দোঃ ॥ অঃ ১ ॥ খঃ ২॥

ইহাও ছান্দোগ্যোপনিষদের বচন, ইহার অর্থ পূর্ব্বে ওঁকার বিষয়ক প্রস্তাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। এক্ষণে সংক্ষেপে বলা যাইতেছে যে, ওঁকার-সংসৃষ্ট মিথুনদ্বয়ের মধ্যে অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষতত্ত্বের মধ্যে বাকের পতি "প্রাণ"। এক্ষণে উপরোক্ত ছান্দোগ্যোপনিষদের বচনদ্বয় হইতে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের মীমাংসা এই প্রকারে একরকম করা যায় যে, ওঁকার-তত্ত্ব, পতিপত্নীভাবে মিথুনে সমাগচ্ছ মিথুনযুগল বা মিথুনস্থ পতিপত্নী এক অপরের মন হরণ করিয়া বাসনা পূর্ণ করে; চিত্তহারিণী বা চিত্তহারক ব্যতীত কাহার কখন

সর্ব্ব-বাসনা পূর্ণ হয় না, সুতরাং এই মিথুন-সমাগচ্ছ পতিপত্নী এক অপরের "হরি" অর্থাৎ চিত্তহরণ করে, ইহা বলিতেই হইবে। এই সমস্ত বিচারে আমরা এই প্রকার সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারি যে, ওঁকার মন্ত্র যে প্রকার ভগবৎ-মিথুন-যুগলকে প্রকাশ করে, ঠিক সেই প্রকার হরিনাম মহামন্ত্রেও ভগবৎ-মিথুনযুগলকে প্রকাশ করে; অতএব ওঁকার মন্ত্র এবং হরিনাম মহামন্ত্র একই বস্তু, বরং ওঁকার মন্ত্র অপেক্ষা হরিমন্ত্রে ভগবৎ-তত্ত্বের ভাব অধিকতর বিকশিত রূপে বুঝা যায় অর্থাৎ হরিমন্ত্রে ভগবৎ-লীলা-বিলাস অধিক প্রকাশ করিতেছে। প্রবর্ত্তক, সাধক এবং সিদ্ধিভেদে ভগবৎ-ভক্ত বা সাধককে তিনটী শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। ইহার মধ্যে ভক্তের সিদ্ধ অবস্থায় শ্রীভগবানের তুরীয় এবং প্রাজ্ঞঘন বা সুষুপ্তি অবস্থার লীলা-বিলাস অধিকতর চিত্ত-হারিণী হয়। প্রবর্ত্তক এবং সাধক ভক্তগণের, শ্রীভগবানের বাহ্যপ্রাজ্ঞ এবং অন্তর্প্রাজ্ঞ অবস্থার লীলা-বিলাস অর্থাৎ শ্রীভগবানের জাগ্রত এবং স্বপ্নাবস্থার লীলা-বিলাস অধিক আদরের হয়। (পূর্ব্বে ওঁকার বিষয়ক প্রস্তাবে ইহার বিশেষ করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে) এই বিষয়টা অতি অল্প কথায় বলিতে গেলে এই প্রকার বলিতে হয় যে, ভগবৎ-তত্ত্ব বিকশিত হইয়া যতই তাঁহার লীলা-বিলাস আমাদের স্থূল জ্ঞানের বিষয় হয়, ততই প্রবর্ত্তক এবং সাধকগণ, ভগবৎলীলার রসাস্বাদন করিতে সমর্থ হন। এজন্য বুঝা যায় যে, ওঁকার-তত্ত্বের ভগবৎ-লীলা যে প্রকার তুরীয় ভাবে সপ্রকাশ আছে, "শ্রীহরি" তত্ত্বের-অবতারণায় ভগবৎ-লীলা তাহা অপেক্ষা একটু বিকশিত ভাবে সপ্রকাশ আছে; এজন্য সমস্ত বেদের এবং উপনিষদের প্রপাঠকের আরম্ভে এবং অন্তে 'ওঁ হরি' এই পরম মঙ্গলসূচক বাক্য সংযোজিত করা হইয়াছে। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এই সর্ব্বমঙ্গল হরিতত্ত্বের গূঢ়রহস্য অতি বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করিয়া জীব-নিস্তারের প্রশস্ত পথ প্রদর্শন করাইয়াছেন। এই সমস্ত বিষয় বুঝিতে গেলে দেখা যায়, তিনি

"হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে।
হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে॥"

এই বত্রিশ অক্ষর মন্ত্রস্থ হরে বা হরি শব্দে (স্ত্রীলিঙ্গে) শ্রীরাধা বলিয়া বুঝাইয়াছেন। আবার অনেক স্থানে এই হরি শব্দে (পুংলিঙ্গে) শ্রীকৃষ্ণ বা

শ্রীভগবান্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আবার নিজে ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া সাধন-ভক্ত জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য, তিনি অনেক প্রকার প্রকট-লীলা করিয়াছিলেন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই হরিনাম মহামন্ত্রের মহিমা বিস্তৃত ভাবে কার্য্যক্ষেত্রে (Practically) দেখাইয়াছেন। মহাপ্রভু বাল্যকালে যথাবয়সে বৈদিক আচার্য্যের নিকট যথাশাস্ত্র সাবিত্রী-দীক্ষা বা উপনয়ন গ্রহণ করিয়া ওঁকার-সংযুক্ত গায়ত্রী মন্ত্র যথারীতি ত্রিসন্ধ্যা জপ করিতে আরম্ভ করেন, পরে বয়োধিক্যে, উপযুক্ত সময় দেশাচার অনুসারে, গয়াক্ষেত্রে ঈশ্বরপুরীর নিকট হইতে তান্ত্রিক দশাক্ষর কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করেন। এই মন্ত্র ঐকান্তিক ভাবে জপ করিতে করিতে তিনি জগৎকে বেদের নিম্নলিখিত বচনের অর্থ বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন,—

"অন্ধংতমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভুয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ॥
ঈষপোনিষৎ ॥২॥

ইহার ভাবার্থ এই যে, পূর্ণভগবান্‌কে পরিত্যাগ করিয়া, যিনি যে দেবতার মন্ত্র জপ করিবেন, তিনি ঐ মন্ত্রের শক্তিতে সেই দেবতাভিমানী অর্থাৎ দেবতার তুল্য শক্তিশালী হইতে পারিবেন, এজন্য মন্ত্রের প্রভাব জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীশ্রীমহাপ্রভু তান্ত্রিক গুরুর নিকট তান্ত্রিক শ্রীকৃষ্ণ বা নারায়ণ-মন্ত্র গ্রহণ করিয়া মন্ত্রের শক্তিবলে তিনি পুরুষাবতার ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণাভিমানী হইয়া অর্থাৎ চতুর্ভুজ নারায়ণের সমশক্তি-সম্পন্ন হইয়া মহাপ্রকাশ করেন, অর্থাৎ ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ যে প্রকার রাম-কৃষ্ণ, নৃসিংহাদি অবতার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মহাপ্রভুও মন্ত্রশক্তিতে সময় সময় নারায়ণের ন্যায় বিভিন্ন প্রকার অবতার(আবেশ) প্রাপ্ত হইয়া তদ্‌ভক্তগণের নিকট প্রকাশ হইতেন, অর্থাৎ মুরারী গুপ্তের নিকট তিনি রাম ছিলেন, অদ্বৈত শ্রীবাসাদির নিকট তিনি "নারায়ণ" ছিলেন, কিন্তু নবদ্বীপের সহচরদিগের মধ্যে কেহ তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই; এজন্য নবদ্বীপের গৌরাঙ্গদেবের সহচরদিগকে ভক্তিগ্রন্থে বৈকুণ্ঠের সহচর বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, আর শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সহচরদিগকে গোলোকের সহচর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যাহা হউক, শ্রীশ্রীমহাপ্রভু তান্ত্রিক মন্ত্র জপ করিয়া, সিদ্ধির চরম

সীমা কতদূর, তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়া, পরে বেদমন্ত্রের মধ্যে সারের সার "ওঁ হরি" এই মহামন্ত্রের শক্তি তাঁহার সমস্ত প্রকট-লীলায় নানা-প্রকারে জগতের অন্ধ জীবকে বুঝাইয়া প্রথমে তিনি জগৎকে দেখান যে, ঈশ্বরপুরী প্রদত্ত তান্ত্রিক মন্ত্র জপ করিয়া সর্ব্বোচ্চতম অবতার ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণের ন্যায় শক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু অবতারী তুরীয় কৃষ্ণ বা স্বয়ং ভগবানের তত্ত্বের কোন প্রকার উদ্দেশ পাওয়া যায় না। পরে তিনি প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে বেদের তত্ত্ব শিক্ষা দিবার ছলে জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, "সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের প্রণব উদ্দেশ" অর্থাৎ তান্ত্রিক মন্ত্র-বলে জীবের শক্তি উৎকর্ষ লাভ করিয়া, অনিমা লাঘমাদি সর্ব্বপ্রকার শক্তি লাভ করিয়া সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয়াদি করিতে পারে বা ব্রহ্মাদি দেবতাদিগের ন্যায় ক্ষমতা হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্ব-অবতারের অবতারী সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার দূরে থাকুক, তাঁহার উদ্দেশ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না; এজন্য মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়াছেন যে, যদি কেহ শ্রীভগবানের উদ্দেশ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে সর্ব্ববেদমন্ত্রের সার "ওঁ হরি" এই প্রণব-মন্ত্রের আশ্রয়গ্রহণ করুন। তিনি ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া, এই প্রণব-মন্ত্রের দ্বারা কি প্রকারে শ্রীভগবানের উদ্দেশ পাওয়া যায়, তাহাও প্রদর্শন করিয়াছেন। এই বিষয়টী ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে মহাপ্রভুর সাধন-প্রণালী ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। মহাপ্রভু নবদ্বীপ-লীলার শেষভাগে ঈশ্বরপুরী-প্রদত্ত তান্ত্রিক মন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া তৎ-পরিবর্ত্তে প্রধানা গোপী শ্রীরাধার নাম জপ করিতে আরম্ভ করেন।

"একদিন গোপীভাবে গৃহেতে বসিয়া।
(প্রধানা) গোপী গোপী নাম লয় বিষন্ন হইয়া॥"

এই প্রকার রাধানাম জপ করিতে করিতে মহাপ্রভু গোপী-অভিমানী হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রকট-লীলার শেষ ভাগে এই প্রকার প্রধানা গোপীভাবে বা রাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার সহচরভাবে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, ইহাই জীবের পরম পুরুষার্থ; ইহাতে প্রশ্ন উত্থাপিত হইতেছে যে, রাধার ভাবে, শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করায় প্রণব আশ্রয়ে বেদের তত্ত্ব প্রকাশ করা কি প্রকারে হইল? এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর বুঝিতে গেলে এই প্রকার বুঝিতে হয়,—পূর্ব্বে বুঝান হইয়াছে, ওঁকার অক্ষর-সংস্থ মিথুনযুগলের লীলা-

বিলাস, হরি শব্দে কিছু অধিক প্রকাশ করে, কেননা, মিথুনে সমাগচ্ছ স্ত্রীলিঙ্গ হরি, পুংলিঙ্গ হরির মন হরণ করে। এই মিথুনযুগলের সম্বন্ধ আর একটু বিকশিত করিবার জন্য মহাপ্রভু, স্ত্রীলিঙ্গ হরি বা ওঁকার মিথুনের পত্নীকে শ্রীরাধা এবং পুংলিঙ্গ হরিকে বা মিথুনের পতিকে শ্রীকৃষ্ণ নামে অভিহিত করিয়াছেন; ইহার বিশদবিচার এই পুস্তকের ৮৪ পৃষ্ঠায় অবতারণা করা হইয়াছে, এক্ষণে সংক্ষেপে বলা যাইতেছে যে, সাধকের ইচ্ছানুসারে হরিশব্দ উভয়-লিঙ্গ। ইহাতে, শ্রীরাধাও বুঝায় এবং শ্রীকৃষ্ণও বুঝায়, এই জন্য মহাপ্রভু ভগবৎ-সাধনার প্রকৃষ্ট প্রণালী জগৎকে বুঝাইবার জন্য, ওঁকার আশ্রয় করিয়া মিথুনে সংস্পৃষ্ট, পুরুষ-তত্ত্ব পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রী-তত্ত্বকে রাধানামে অভিহিত করিয়া তাঁহারই নাম জপ করিয়াছিলেন। ভগবদ্ভক্ত মাত্রেরই তাঁহার অনুকরণ করা একান্ত আবশ্যক। ইহার গূঢ় অভিপ্রায় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে এই প্রকার বর্ণনা আছে—

"কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম হ্লাদিনী।
সেই শক্তি দ্বারা সুখ আস্বাদে আপনি॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥"

ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, ওঁকার-সংস্পৃষ্ট মিথুনস্থ স্ত্রী-তত্ত্ব বা শ্রীরাধা বা হ্লাদিনী দ্বারা মিথুনস্থ পুরুষ-তত্ত্ব বা শ্রীকৃষ্ণ নিজে সুখ আস্বাদন করেন, ভক্তগণও তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া বা তাঁহার দ্বারা বাঞ্ছা পূর্ণ হইয়া সুখী হন; এই বিষয়টা অন্য কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, ভক্তগণ হ্লাদিনী-শক্তি বা শ্রীরাধাকে আশ্রয় করিয়া ভগবৎ-তত্ত্ব (শ্রীকৃষ্ণ) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ভাবের ভাবুক বা রসের রসিক না হইলে কেহ বিশেষ বিশেষ রস বা ভাব গ্রহণ করিতে পারে না। যদ্রূপ বিশেষ বিশেষ রসের রসিক বা ভাবের ভাবুক হইতে হইলে রসজ্ঞ বা ভাবজ্ঞের আশ্রয়গ্রহণ করিতে হয়, তদ্রূপ ভগবৎ-তত্ত্ব বুঝিতে গেলেও ভগবৎ-ভক্তের আশ্রয়গ্রহণ করিতে হয়। ইহার মধ্যে আর একটু সূক্ষ্ম বিচার আছে,—যে ভক্তের যতদূর ভগবদ্বিষয়ের জ্ঞান আছে, তাঁহাকে আশ্রয় অবলম্বন করিলে তাহার অপেক্ষা অধিকতর ভগবৎ-জ্ঞানলাভ হয় না, তাই ভক্তি শাস্ত্রে উল্লেখ আছে:—

"কিংবা কান্তি শব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে।
কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে॥

রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ।
সর্ব্বকান্তি শব্দের এই অর্থ বিবরণ ॥”

ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে, শ্রীরাধা ব্যতীত অন্য কোন ভক্ত বা ভাবুক বা রসিক ভগবৎ-তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে ধারণা করিতে সক্ষম নহেন, এজন্য সাধন-তত্ত্বের অতিগূঢ়-তত্ত্ব প্রদর্শন করিবার জন্য মহাপ্রভু নিজে ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীরাধা-মন্ত্র জপ করিয়া, কি প্রকারে গোপীভাবে বা রাধাভাবে শ্রীরাধাভিমানী হইতে হয়, তাহা জগৎকে দেখাইয়া দিয়াছেন। ইহার ভাবার্থ এই যে, যদি কেহ শ্রীভগবানে, শ্রীরাধার ন্যায় সম্পরিষক্ত অর্থাৎ সম্যক্‌প্রকারে আসক্ত হইতে চাহেন, তবে তাঁহাকে শ্রীরাধার ভাবে মন, প্রাণ এবং সর্ব্ব-ইন্দ্রিয়গণের গঠন করিতে হয়, অর্থাৎ রাধার চক্ষে শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করিতে হয়, রাধার কর্ণে ভগবৎ বিষয় শ্রবণ করিতে হয়, রাধার মুখে ভগবৎ-প্রসঙ্গ কীর্ত্তন করিতে হয়, এই প্রকার সর্ব্বেন্দ্রিয় এবং মনপ্রাণ শ্রীরাধার ভাবে গঠন করিয়া সর্ব্বকার্য্য করিতে হয়, ইহাই মহাপ্রভু পুরীক্ষেত্রের লীলায়, বিশেষতঃ, গম্ভীরা-লীলায় প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাকেই গোপীভাব বা রাধাভাব বা রাধাভিমানী বলে। যাহা হউক, এই সমস্ত বৈদিক বিচারে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, “ওঁকারসংযুক্ত হরিনাম মহামন্ত্র এবং ওঁ এই নামব্রহ্ম বা শ্রীভগবানের পূজা বা উপাসনা করিবার প্রতীক্” সর্ব্ববেদের সারের সারতত্ত্ব, এবং ভগবৎ-সাধকের একমাত্র অবলম্বন, ইহাতে আর কোন প্রকার মতদ্বৈধ হইতে পারে না।

প্রভুপাদ শ্রীল বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়, সময়োপযোগী এই মহামন্ত্র উদ্ধার করিয়া জীবের কত ভাবে কত মঙ্গলসাধন করিয়াছেন এবং করিতেছেন, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব; আশা করি, প্রভুপাদের শিষ্যগণ, মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্যদিগের ন্যায় শাস্ত্রবিরুদ্ধ কোন প্রকার কাল্পনিক গুণের আরোপ করিয়া গোস্বামী মহাশয়ের পবিত্র জীবনী কলুষিত করিবেন না। আপন আপন শিক্ষাগুরু, শিষ্যদিগের নিকট ভগবান্‌স্বরূপ অর্থাৎ ভগবৎ-বুদ্ধিতে গুরুদেবকে দৃষ্টি না করিলে শিষ্যের পক্ষে গুরুপদ আশ্রয় করা নিষ্ফল। গুরুকে ভগবৎ-বুদ্ধিতে দৃষ্টি করা এক, আর নিজ নিজ গুরুদেবকে, সাধারণের নিকট অবতার বলিয়া প্রচার করা অন্য বিষয়। অজ্ঞানান্ধ জীবের শিক্ষার

জন্ত পরম কারুণিক শ্রীমহাপ্রভু সনাতনের শিক্ষাচ্ছলে, জগৎকে এই প্রকার শিক্ষা দিয়াছেন, যথা—

"রাজমন্ত্রী সনাতন বুদ্ধে বৃহস্পতি।
প্রভুর কৃপাতে পুছেন অসঙ্কোচ-মতি॥
অতি ক্ষুদ্র জীব মুঞি নীচ নীচাচার।
কেমনে জানিব কলিতে কোন্ অবতার॥
প্রভু কহে অন্যাবতার শাস্ত্র দ্বারা মানি।
কলি-অবতার তৈছে শাস্ত্র দ্বারা মানি॥
সর্ব্বজ্ঞ মুনির বাক্যে শাস্ত্র প্রমাণ।
আমা সবা জীবের হয় শাস্ত্র দ্বারা জ্ঞান॥
অবতার নাহি কহে আমি অবতার।
মুনি সব জানি করে লক্ষণ বিচার॥
স্বরূপ-লক্ষণ আর তটস্থ-লক্ষণ।
এই দুই লক্ষণে বস্তু জানে মুনিগণ॥
আকৃতি প্রকৃতি স্বরূপ স্বরূপলক্ষণ।
কার্য্য দ্বারা জ্ঞান হয় তটস্থ-লক্ষণ॥
ভাগবতারম্ভে ব্যাস মঙ্গলাচরণে।
পরমেশ্বর নিরূপিল এ দুই লক্ষণে॥"

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১।১),—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্,
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গো মৃষা,
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥

ইহার ভাবার্থ এই যে—বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় যে তত্ত্ব হইতে সমুৎপন্ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, অন্বয় ব্যতিরেক, দ্বারা বিচার করিলে যিনি নিখিল অর্থে ও ব্যাপারে স্বরূপতত্ত্ব বলিয়া নিশ্চিত হইয়া থাকেন, যিনি দৃশ্যমান জগতে একমাত্র স্বরাট্ (স্বতন্ত্র নৃপতি), আদিকবি ব্রহ্মাকে যিনি অন্তর্য্যামিরূপে

(বেদ) শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, যাঁহাতে সুবুদ্ধি পণ্ডিতগণেরও পুনঃপুনঃ মোহ জন্মে, যাহাতেই তেজ, জল ও ক্ষিত্যাদি ভূতগ্রামের বিনিময় হয়; চিৎউদয়রূপ সৃষ্টি, জীবপ্রকটরূপ সৃষ্টি ও মায়িক ব্রহ্মাণ্ডরূপ সৃষ্টি এই ত্রিবিধ সৃষ্টি যাহাতে সত্যরূপে বিরাজমান, সেই আত্মশক্তিদ্বারা নিত্য-কুহকবর্জ্জিত পরমসত্যতত্ত্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করি।

"এই শ্লোকে পরশব্দে কৃষ্ণ নিরূপণ।
সত্য শব্দে কহে তাঁহে স্বরূপ-লক্ষণ॥
বিশ্বসৃষ্ট্যাদিক কৈল বেদ ব্রহ্মাকে পড়াইল।
অর্থাভিজ্ঞতা স্বরূপশক্ত্যে মায়া দূর কৈল॥
এই সব কার্য্য তার তটস্থ লক্ষণ।
অন্য অবতার ঐছে জানে মুনিগণ॥
অবতার কালে হয় জগতের গোচর।
এই দুই লক্ষণে কেহ না জানে ঈশ্বর॥"

মহাপ্রভুর এই মহাবাক্যের অর্থ ভাল করিয়া বুঝিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, অবতারের বা ব্যক্তিবিশেষের আকৃতি, প্রকৃতি, গুণ, কর্ম্ম, স্বভাব এবং প্রভাব দেখিয়া নিজ নিজ বুদ্ধির প্রভাবে লোকে অবতার বলিয়া বুঝিতে পারে না অর্থাৎ বিশ্বামিত্রের ন্যায় ত্রিকালদর্শী মুনিগণ সৃষ্টি স্থিতি লয় করিবার শক্তিসম্পন্ন হইয়াও অবতার বলিয়া গণ্য হন না, পরন্তু, শাস্ত্রযুক্তি অবলম্বন করিয়া অবতার স্থির করিতে হয়, ইহাই মহাপ্রভুর শিক্ষার অভিপ্রায়।

প্রভুপাদ গোস্বামী মহোদয়ের শিষ্যদিগকে আর একটী নিবেদন করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর আর একটী উপদেশ স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, মহাপ্রভু, শ্রীল সনাতন গোস্বামী মহোদয়কে উপলক্ষ্য করতঃ গীতার একটী শ্লোক উল্লেখ করিয়া, গুরুদেবের আজ্ঞা কি প্রকারে প্রতিপালন করিতে হয়, তাহা জগৎকে বিশদভাবে বুঝাইয়া গিয়াছেন, যথা,—

"কৃষ্ণ কৃপালু অর্জ্জুনেরে লক্ষ্য করিয়া।
জগতেরে রাখিয়াছে উপদেশ দিয়া॥
পূর্ব্ব আজ্ঞা, বেদধর্ম্ম, কর্ম্ম, যোগ জ্ঞান।
সব সাধি অবশেষে আজ্ঞা বলবান॥

এই আজ্ঞাবলে ভক্তের শ্রদ্ধা যদি হয়।
সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করি সে কৃষ্ণ ভজয়॥"

ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, মহাপ্রভু গুরুদেবের শেষ আজ্ঞা বলবতী জ্ঞান করিতে উপদেশ দিয়াছেন; অতএব প্রভুপাদ গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণের একমাত্র কর্ত্তব্য-ধর্ম্ম এই যে, তাঁহাদের গুরুদেব ভগবত্তত্ত্বের উদ্দেশ করিবার জন্য নানা প্রকার ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নানাপ্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, এমন কি, নির্জ্জন পাহাড় পর্ব্বতে, যোগাদি দুঃসাধ্য সাধনা করিতেও ভয় পান নাই। কিন্তু তাঁহার শেষকর্ম্ম "নাম-ব্রহ্ম" অর্থাৎ ভগবন্নামের প্রতীক্ স্থাপনা করা এবং হরিনাম মহামন্ত্রে ওঁকার সংযোগ করিয়া জপ করা, ভগবৎ-আদেশে ইহাই তিনি জগতে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই দুইটী কার্য্য কি প্রকারে করিতে হয়, তাঁহার প্রণালী তিনি নিজে আচরণ করিয়া, জগতে প্রচার করিবার জন্য তাঁহার শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। এক্ষণে যদি তাঁহার শিষ্যগণ এই মহাপুরুষের শেষাজ্ঞা প্রতিপালন করিতে চাহেন, তবে সাধারণ প্রথানুসারে বিগ্রহ স্থাপনের পরিবর্ত্তে "নাম-ব্রহ্মের" প্রতিষ্ঠা প্রচলিত করা একান্ত কর্ত্তব্য এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে সভা সমিতি করিয়া দেশময় হরি-নামের বৈদিক অর্থ প্রচার করা, এবং কি প্রণালীতে এই মহামন্ত্র জপ করিতে হয়, তাহাও শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য; কেননা, যাঁহারা বড় বড় মালা লইয়া কেবল সংখ্যা পূর্ণ করিবার জন্য হরিনাম জপ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই নামের ব্যভিচার করিতেছেন; এবং যাঁহারা বিগ্রহের সেবায় নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের মধ্যেও অধিকাংশ স্থানে আদর্শ নিত্যসিদ্ধ গোস্বামী-দিগের প্রদর্শিত, বিগ্রহ-সেবার প্রণালী পরিবর্ত্তিত করিয়া, অতি শোচনীয় ভাবে বিগ্রহের সেবাদি কার্য্য চালাইতেছেন। ইহার বিষময় ফলে, দেশস্থ অধিকাংশ বিগ্রহের সেবাইতগণ, শাস্ত্রানুসারে প্রাকৃতিক বন্ধনে পতিত হইয়া নরকগামী হইতেছেন।

কামবীজ এবং কাম-গায়ত্রী।

এক্ষণে আর একটী গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপিত হইতেছে যে, ওঁকার বীজ এবং ব্রহ্ম গায়ত্রী বা সাবিত্রী গায়ত্রী-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া যাঁহারা স্বয়ং ভগবানের উপাসনায় নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা যদি তান্ত্রিক কোন বীজমন্ত্র এবং তান্ত্রিক গায়ত্রী-মন্ত্র গ্রহণ করিয়া বা তন্ত্রমতে দীক্ষিত হইয়া কোন তান্ত্রিক দেবতার উপাসনায় নিযুক্ত হয়েন, তবে সে ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারে নিশ্চয়ই দ্বিজাচার-ভ্রষ্ট হইয়া শূদ্রাচারী হয়েন বা শূদ্রবৎ হয়েন। এই শাস্ত্র-যুক্তি যদি সত্য হয়, তবে হরিভক্তি-বিলাস এবং শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে তান্ত্রিক কামবীজ এবং কাম-গায়ত্রী আশ্রয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বা মদনমোহনের পূজাদি করিবার ব্যবস্থা আছে কেন? ক্লীং ইহাই কামবীজ (এই অক্ষর কৃষ্ণশব্দের রূপান্তর মাত্র) এবং কামগায়ত্রী যথা—

> "ক্লীং কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায়
> ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ ॥"

ইহার অর্থ এই যে,—কামদেবকে অবগত হই, পুষ্পবাণধারী কামদেবকে ধারণা করি, সেই অনঙ্গদেব বা কামদেব (প্রচোদয়াৎ) প্রেরণা করেন অর্থাৎ আমাদিগকে তাঁহার অভিমুখে, অন্য কথায়, আমাদের ন্যায় ভগবদ্বিমুখী জীবকে তোমার (শ্রীভগবানের) অভিমুখে প্রেরণ করুন। যাহা হউক, প্রামাণ্য দশখানি উপনিষদের মধ্যে কোন স্থানে ক্লীং বা কামবীজ এবং কামগায়ত্রীর উল্লেখ নাই; সুতরাং যে মন্ত্র বা যে উপাসনা-প্রণালী উপনিষদে নাই, তাহা বেদাচারী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কি যুক্তি অনুসারে, স্বয়ং ভগবানের উপাসনায় প্রয়োগ করিলেন?

এই গুরুতর প্রশ্নের উত্তর বুঝিতে গেলে একটু নিরপেক্ষ হইয়া প্রথমতঃ বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে যে, মন্ত্রের শক্তি কি? মীমাংসা-দর্শনে মহামুনি জৈমিনী বেদমন্ত্রের বিশদভাবে বিচার করিয়া জগৎকে বুঝাইয়াছেন যে,—

> মন্ত্রাত্মিকা দেবতা

ইহার ভাবার্থ এই যে, অধ্বর্য্যু, হোতা, উদ্গাতা ও ব্রহ্মা এই চারি শ্রেণীর ঋত্বিকের দ্বারা বৈদিক সমস্ত যজ্ঞকার্য্য সমাধা হইত, ইহার মধ্যে উদ্গাতাগণ

বৈদিক মন্ত্রসকল যখন উদ্‌গান করিতেন, তখন এই মন্ত্রসকল মূর্ত্তিমান দেবতা স্বরূপে পরিণত হইয়া যজমানকে কর্ম্মফল প্রদান করিত, এজন্য মহামুনি জৈমিনী বিচার করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, 'মন্ত্রাত্মিকা দেবতা' অর্থাৎ মন্ত্রই দেবতা-রূপে পরিণত হয়। এক্ষণে যাঁহাদের বিচার-শক্তি আছে,তাঁহারা বুঝুন,মন্ত্রাত্মিকা দেবতা ইত্যাদি উপরোক্ত বিচার, বেদের ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যের বিষয়, সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের সহিত বেদের ক্রিয়াকাণ্ডের সহিত কোন সংশ্রব নাই। কেননা, একালে বেদের কোন প্রকার ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে উদ্‌গাতার অভাবেই হউক বা ক্রিয়ার উপচারের অভাব বা অশুদ্ধিপ্রযুক্তই হউক, বৈদিক মন্ত্রসকল আর মূর্ত্তিমান দেবতারূপে পরিণত হয় না। এদিকে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষাচ্ছলে জগৎকে বুঝাইয়াছেন যে,—

"কৃষ্ণ কৃপালু অর্জ্জুনেরে লক্ষ্য করিয়া।
জগতেরে রাখিয়াছে উপদেশ দিয়া॥"

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায়াং (১৮।৬৪)—

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণুমে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥

যাহা সর্ব্ববিধ গুহ্য হইতেও গুহ্য, সেই পরমশ্রেষ্ঠ বাক্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় বলিয়াই তোমাকে হিতকথা বলিতেছি, যথা—

তথা তত্রৈব (৬৫)—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, তুমি আমাতে মন অর্পণ কর, আমাকে ভজনা কর, আমার উদ্দেশে যজ্ঞ কর, আমাকে প্রণাম কর। ঐরূপ করিলে তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইবে। আমি সত্য করিতেছি, তুমি আমার প্রিয়।

"পূর্ব্ব আজ্ঞা বেদধর্ম্ম, কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান।
সব সাধি অবশেষে আজ্ঞা বলবান॥
এই আজ্ঞাবলে ভক্তের শ্রদ্ধা যদি হয়।
সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ করি সে কৃষ্ণ ভজয়॥"

মহাপ্রভু আবার স্থানান্তরে শ্রীল প্রকাশানন্দকে শিক্ষাচ্ছলে জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন যে,—

"উপনিষদ সহ সূত্র কহে যেই তত্ত্ব।
মুখ্যবৃত্তি সেই অর্থ পরম মহত্ত্ব।"

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে এই দুই স্থানের পয়ারে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, মহাপ্রভু বেদের ক্রিয়াকাণ্ড সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন, কিন্তু বেদের উপনিষদ ভাগের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়াছেন এবং এই উপনিষদের বিশেষ ব্যাখ্যা-স্বরূপ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শেষ আজ্ঞা

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"

অর্থাৎ ব্রজ-গোপীদিগের ন্যায় সর্ব্বধর্ম্ম অর্থাৎ বেদবিহিত সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানে সর্ব্ব ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক সম্পরিষক্তো বা সম্যক্ প্রকারে আসক্ত হইতে পরামর্শ দিয়া জগৎকে বুঝাইয়াছেন যে, ইহাই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলাভের চরম ভজন সাধন। আবার বৃহদারণ্যক্ উপনিষদের ৪র্থ অধ্যায়ে ২১ মণ্ডলে মহাপ্রভুর এই উপদেশের অনুরূপ বচন প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা—

তদ্‌যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষক্তো
ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরমেবায়ং
পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষক্তো ন
বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরং ॥

ইহার অর্থ পূর্ব্বে বিষদভাবে বুঝান হইয়াছে,এক্ষণে সংক্ষেপে বলা যাইতেছে যে, শ্রীভগবানে সর্ব্বতোভাবে আসক্ত হওয়াই জীবের পরম পুরুষার্থ।

মন্ত্রের শক্তি বিচার করিতে গেলে দেখা যায়, মারণ, উচাটন এবং বশীকরণ এই তিনটী মন্ত্রের প্রভাবে সংঘটন হয়। ইহাই শাস্ত্রে প্রমাণ পাওয়া যায়। যাঁহারা এক্ষণ পর্য্যন্ত ইহা বিশ্বাস করেন যে, কলিকালেও মন্ত্রের এই প্রকার প্রভাব বিলুপ্ত হয় নাই, তাঁহারা বুঝুন যে, মন্ত্রের শক্তিতে দেবতা কিম্বা কোন জীবকে আসক্ত করা যাইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া নিত্য, শুদ্ধ, সদামুক্ত বিভু ভগবান্‌কে কি মন্ত্রবলে বশ করা যায়? সর্ব্বশাস্ত্রে যে ভগবান্‌কে স্বতন্ত্র পুরুষ বলিয়া

কীর্ত্তন করিতেছে, তাঁহাকে মন্ত্রে বশ করা যায়, ইহা কল্পনা করা নিতান্ত অজ্ঞের কার্য্য। তাই সর্ব্বশাস্ত্রের সারের সার সংগ্রহ করিয়া ভক্তিশাস্ত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও তাঁহার বৃন্দারণ্যবাসী অন্তরঙ্গ ভক্তদিগের দ্বারা বহু গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া জগৎকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, বৈদিক শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম বা কোন প্রকার যজ্ঞকার্য্যের অনুষ্ঠান, জ্ঞানের বিচার, যোগের যম নিয়ম আসন প্রণায়াম প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ যোগের সাধনা ইত্যাদি কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা কিম্বা জীবের অন্য কোন প্রকার পুরুষকার দ্বারা কখন চিরস্বতন্ত্র ভগবান্‌কে বশ করা যায় না; তাই ভক্তি শাস্ত্রে উল্লেখ আছে :—

"যোগধর্ম্মে জ্ঞানকর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণ বশ হেতু এক কৃষ্ণ প্রেমরস॥"

আবার স্থানান্তরে মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়াছেন :—

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম কভু সাধ্য নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধ-চিত্তে করয়ে উদয়॥ •

এই পয়ারের "কভু সাধ্য নয়" অর্থে যাগ, যজ্ঞ, হোম এবং মন্ত্রাদির দ্বারা শ্রীভগবান্ কভু অর্থাৎ কখনও সাধ্য নহে। তবে শ্রীভগবান্ কিসে বশ হন? তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য সর্ব্বশাস্ত্রের সার সংগ্রহ করিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থকার বলিতেছেন যে,"কৃষ্ণবশ হেতু এক কৃষ্ণ প্রেমরস" অর্থাৎ তিনি কখন কোন প্রকার সাধনসিদ্ধ নহেন, পরন্তু তিনি চিরস্বতন্ত্র হইয়াও তিনি তাঁহার নিজ দয়াগুণে নিজে বাধ্য হইয়া ভক্তের নিকট পরতন্ত্র হইয়া তাঁহার সচ্চিদানন্দময় তনু প্রদর্শন করান, যথা :—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্॥ ৩॥

মুণ্ডকোপনিষৎ॥ মুঃ ৩॥ অঃ ২॥

ইহার অর্থ পূর্ব্বে বিশদভাবে বলা হইয়াছে, এক্ষণে সংক্ষেপে বলা যাইতেছে যে, সর্ব্ববেদ অধ্যয়ন বা শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ের ধারণাশক্তি থাকিলে, অথবা

শাস্ত্রজ্ঞান থাকিলে, এক কথায়, কোন প্রকার পুরুষকার দ্বারা, শ্রীভগবান্‌কে পাওয়া যায় না, পরন্তু তিনি যাঁহাকে কৃপা করিয়া আত্মদর্শনার্থ বরণ করেন, তাঁহার নিকট শ্রীভগবান্ স্বকীয়া তনু বা বিগ্রহ প্রকাশ করেন।

এক্ষণে এই সমস্ত যুক্তি দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, যাঁহারা উপনিষদের স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সাক্ষাৎ আদেশ এবং আদর্শ গোস্বামীদিগের প্রচারিত শাস্ত্রসকলের পরিষ্কার উপদেশ, হৃদয়ের সহিত ভক্তিভাবে মান্য করেন, তাঁহারা ভাল করিয়া বুঝুন যে, বিশুদ্ধভগবৎ-প্রেম ব্যতীত বিধিপূর্ব্বক মন্ত্রপাঠ করিয়া, ফোঁটা কাটিয়া, নেংটী পরিয়া, বড় বড় মালা জপ করিয়া সংখ্যা পূর্ণ করিলে অথবা অর্থবলে চব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় আদি করিয়া নানাপ্রকার ভোগের আয়োজন করতঃ প্রতিনিধি স্বরূপ পুরোহিত নিযুক্ত করিয়া অর্থাৎ ভগবান্‌কে নিজে ভক্তিশ্রদ্ধা না করিয়া দক্ষিণাভোগী বা বেতনভোগী কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া, শ্রীভগবানের পূজা ও ধ্যান ধারণাদি করিয়া কেহ কখন শ্রীভগবান্‌কে বশ করিতে পারে না। শ্রীভগবান্ কাঙ্গালের ঠাকুর। যাঁহারা শ্রীমহাপ্রভুর পদাশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, দীনতা এবং হীনতাই ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ; তামসিক এবং রাজসিক বৃত্তি বর্ত্তমান থাকিতে কেহ কখন ভক্ত হইতে পারে না। তাই মহাপ্রভু শ্রীল রঘুনাথ দাসকে শিক্ষাচ্ছলে, সাত্ত্বিক ভাবে কি প্রকারে ভগবৎ-পূজা বা সেবা করিতে হয়, তাহা জগৎকে শিখাইবার জন্য গোবর্দ্ধন শিলা এবং গুঞ্জমালা তাঁহাকে প্রদান করিয়া বলিতেছেন, যথা,—

"প্রভু কহে এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ।
ইহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ॥
এই শিলা কর তুমি সাত্ত্বিক পূজন।
অচিরাতে পাবে তুমি কৃষ্ণপ্রেমধন॥
এক কুঁজা জল আর তুলসীমঞ্জরী।
সাত্ত্বিক সেবা এই শুদ্ধ ভাবে করি॥
দুই দিকে দুই পত্র মধ্যে কোমল মঞ্জরী।
এই মত অষ্টমঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি॥
শ্রীহস্তে শিলা দিয়া এই আজ্ঞা দিলা।
আনন্দে রঘুনাথ সেবা করিতে লাগিলা॥

এক বিতস্তি দুই বস্ত্র পিঁড়া একখানি।
স্বরূপ দিলেন কুঁজা আনিবারে পানী॥
এই মত রঘুনাথ করেন পূজন।
পূজাকালে দেখে শিলা ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
প্রভুর স্বহস্তে দত্ত গোবর্দ্ধন শিলা।
এত চিন্তি রঘুনাথ প্রেমে ভাসি গেলা॥
জল তুলসী সেবায় যত সুখোদয়।
ষোড়শোপচার-পূজায় তত সুখ নয়॥"

ইহার দ্বারা বিচারক্ষম ব্যক্তি অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে, রঘুনাথ দাসকে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের একখণ্ড ভগ্ন প্রস্তর দিয়া মহাপ্রভু বলিলেন, "এই শিলা শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ।" 'গুরু আজ্ঞা মিথ্যা নহে' এই বুদ্ধিতে রঘুনাথ দাস জল-তুলসী দিয়া এই শিলা বা শ্রীভগবানের প্রতীকের পূজা সাত্ত্বিক ভাবে আরম্ভ করিলেন। পরে এই প্রতীক্ আশ্রয় করিয়া ভগবৎ-পূজায় নিযুক্ত হইয়া পূজার সময় রঘুনাথ দাসের আর শিলা-রূপী ভগবৎ-প্রতীক্ দৃষ্টিগোচর হইত না "পূজাকালে দেখে, শিলা ব্রজেন্দ্রনন্দন"। একা রঘুনাথ দাস কেন, শ্রীরূপ-সনাতন, শ্রীজীব, গোপালভট্ট, লোকনাথ প্রভৃতি বৃন্দারণ্যবাসী মহাপ্রভুর অন্ত-রঙ্গ ভক্তগণকে শ্রীভগবানের 'প্রতীকের' পূজা বা সেবায় নিযুক্ত করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, বিগ্রহের সেবা করিলেই যে প্রাকৃতিক বন্ধনে পতিত হইতে হয়, এমত নহে, বরং প্রতীক্ অবলম্বনে ভগবৎ-পূজায় নিযুক্ত হইলে ভগবৎ-প্রেমের গাঢ়ত্ব বৃদ্ধি করে। ইহার ভাবার্থ এই যে, রঘুনাথ দাস পূজাকালীন শিলাকে ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে দেখিতেন; রূপ, সনাতনাদি উপরোক্ত গোস্বামীগণ পূজাকালীন বিগ্রহকে মদনমোহন রূপে দেখিতেন। কিন্তু কোন গোস্বামী বিগ্রহকে বা প্রতীক্‌কে প্রাকৃতিক প্রতিমা বা প্রাকৃতিক কোন পদার্থ-রূপে দেখেন নাই, এজন্য নরোত্তম ঠাকুর ইঁহাদিগকে রাগমার্গের 'মহাজন' বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। মহাপ্রভু নিজে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহকে সাক্ষাৎ পদ্মলোচন শ্রীকৃষ্ণরূপে দেখিতেন। যাহা হউক, এই সমস্ত বিচার মনে রাখিয়া ভগবৎ-পূজায় মন্ত্রের আশ্রয়ের অভিপ্রায় বুঝিতে গেলে বুঝিতে হয় যে, মন্ত্রসকল ভাষার দোষে, অর্থের দোষে, ছন্দের দোষে, বা অন্য কোন প্রকারে ভগবদ্ভক্তির

যদি বাধক হয়, তবে সে প্রকার মন্ত্র সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। ইহার ভাবার্থ এই যে, আজকাল অজ্ঞান গুরু, পুরোহিত মহাশয়েরা শুকপাখীর পাঠের মত, মন্ত্রার্থ না বুঝিয়া আসনশুদ্ধি, জলশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম, অঙ্গন্যাস, করন্যাস আদি করিয়া যে প্রকারে দেব-দেবীর পূজা এবং স্তবপাঠ করিয়া থাকেন, তাহাতে কখনও কাহারও ভগবৎপ্রেম উদয় হয় না। অধিকন্তু শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিরা এই শ্রেণীর অবোধ গুরুঠাকুরদিগের পাল্লায় পড়িয়া ইহকাল পরকাল নষ্ট করিয়া থাকেন। দৃষ্টান্ত স্থলে দেখা যায় যে, যাঁহারা শ্রদ্ধাবান, তাঁহাদের অনেকে শাস্ত্রানুমোদিত ভূতশুদ্ধি এবং প্রাণায়াম করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু কলিকালে কেহ কখন ভূতশুদ্ধি করিতে পারে না, আর যে সকল শ্রদ্ধাবান লোক ভক্তির উচ্ছ্বাসে দেবপূজায় নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা শাস্ত্রানুসারে চিত্ত-বৃত্তি নিরোধ করিয়া প্রাণায়াম করিতে গিয়া, তাঁহারা তাঁহাদের পূজা করিবার পূর্ব্বে, শ্রীভগবানে যে ভক্তির উচ্ছ্বাস হয়, তাহা পর্য্যন্তও সমূলে বিনষ্ট করিয়া নিজেকেই আরাধ্য-দেবতা জ্ঞান করেন, সুতরাং প্রকৃত ভগবদ্ভক্তের পক্ষে, পূজার অনতিপূর্ব্বে ভূতশুদ্ধি বা প্রাণায়াম করিবার চেষ্টাও, ভগবদ্ভক্তির বাধক বলিয়া বুঝিতে হইবে। ইহার দ্বারা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝুন যে, শাস্ত্রের কঠোর শাসনানুসারে আসনশুদ্ধি, জলশুদ্ধি, ভূতাপসারণ, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম, আদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া শ্রদ্ধাভক্তি আদি সমস্ত চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া মানস এবং বাহ্যপূজার প্রথা যে ভাবে দেশময় প্রচলিত আছে, সেই ভাবে মন্ত্র-পাঠ এবং ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া ভগবদ্-পূজা করিতে থাকিলে, কেহ কখন ভগবৎ-প্রেম লাভ করিতে পারে না। ভক্তিভাবে ভগবৎ-পূজা, ইহা অপেক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

ভক্তির সাধনা অতি বিচিত্র, ভক্তি বিচার চাহে না, ভক্তি যুক্তি মানে না, ভক্তি নিষেধ শুনে না ; ভক্তি অনুরাগময়ী, ভক্তি প্রেমময়ী, ভক্তি চতুর্ব্বর্গ চাহে না ; ভক্তি আনন্দময়ী, ভক্তের ভগবান্‌ও ভক্তের নিকট আনন্দময়। ভক্ত স্বাধীন, সুতরাং ভক্তির সাধনার কোন বিশেষ বিধি নাই। ভক্ত আপন মনে, আপন মনের ভাবে, আপন হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে শাস্ত্রবিধিবদ্ধ উপচারের এবং শুচি অশুচির দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া অথবা দেশকালপাত্র বিচার না করিয়া, আপন ইষ্ট দেবতাকে আত্মনিবেদন-উপচারে পূজা করে। ভক্ত,

সাকার-নিরাকার বিচার করে না। ভক্ত জড়-চৈতন্যের পার্থক্য বুঝে না। ভক্ত সাম্প্রদায়িক দলাদলির ভিতর প্রবেশ করে না। প্রকৃত ভক্তগণ জগন্ময় সর্ব্বজড়ে, সর্ব্বজীবে এবং সম্প্রদায়ের উপাস্য বিগ্রহে, আপন আপন ইষ্ট দেবতার মূর্ত্তি দর্শন করে। এই প্রকার বিভুভাবে অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী বা "সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্" ভাবে আপন আপন ইষ্টদেবতাকে মনে প্রাণে দৃষ্টি করিতে অভ্যাস করিবার প্রণালীকে ভক্তের সাধনা বা পূজা-পদ্ধতি কহে। এখন তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু পাঠক! স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া বুঝুন, ভক্তের বাহ্য উপচার দ্বারা বাহ্য পূজা করা উপলক্ষ্য মাত্র। পরন্তু ভক্তি বা আধ্যাত্মিক উপচারে মানস-পূজাদ্বারা ভগবদাসক্তি, মন প্রাণের অভ্যাসগত গুণ বা ধর্ম্মমধ্যে পরিগণিত করাই ভক্তের পূজার প্রধান উদ্দেশ্য। অন্য কথায়, ভগবৎ-স্ফূর্ত্তি, সর্ব্বাঙ্গবিকশিত ভাবে, ভক্ত-হৃদয়ে সমুদিত হইতে পারে, এইরূপ ভাবে ভূতশুদ্ধি, দেহশুদ্ধি বা চরিত্রগঠনপ্রণালী অভ্যাস করা ভক্তের পূজার প্রধান উদ্দেশ্য। ভক্তির সাধনা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য, নিম্নে মহাভক্ত রামপ্রসাদের চারিটি গান উদ্ধৃত করিলাম :—

১

মন ক'রোনা দ্বেষাদ্বেষী।
আমি—বেদাগম পুরাণে, করলাম কত খোঁজতল্লাসী॥
এই যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম সকল আমার এলোকেশী॥
শিবরূপে, ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী।
ও মা—রামরূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি॥
দিগম্বরী দিগম্বর, পীতাম্বরী চির-বিলাসী।
শ্মশানবাসিনী বাসী, অযোধ্যা গোকুলনিবাসী॥
যোগিনী ভৈরবী সঙ্গে, শিশু সঙ্গে এক বয়সী।
যেমন—অনুজ ধানকী সঙ্গে, জানকী পরম রূপসী॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্ম নিরূপণের কথা দেঁতোর হাসি।
আমার—ব্রহ্মময়ী সকল ঘটে, পদে গঙ্গা, গয়া, কাশী॥

২

আর, কাজ কি আমার কাশী।

ওরে—কালীপদ-কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি।

হৃদ্‌কমলে ধ্যান কালে, আনন্দ-সাগরে ভাসি॥

কালী নামে পাপ কোথা, মাথা নাই মাথাব্যাথা,

ওরে—অনল দহন যথা, করে তুলারাশি॥

গয়ায় করে পিণ্ডদান, পিতৃঋণে পায় ত্রাণ,

ওরে—যে করে কালীর ধ্যান, তার গয়া শুনে হাসি।

কাশীতে ম'লেই মুক্তি, এই বটে সে শিবের উক্তি,

ওরে—সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী॥

নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,

ওরে—চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি।

কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণা-নিধির বলে,

ওরে—চতুর্ব্বর্গ করতলে ভাবলে এলোকেশী॥

৩

মন তোমার এই ভ্রম গেল না।

কালী কেমন তাই চেয়ে দেখ্‌লে না॥

ওরে—ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি, জেনেও কি তা জান না॥

জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা, দিয়ে কত রত্ন-সোণা।

ওরে—কোন্‌ লাজে সাজাতে চাস্‌ তায়, দিয়ে ছার ডাকের গহনা॥

জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য নানা।

ওরে—কোন্‌ লাজে খাওয়াতে চাস্‌ তায়

আলো চাল আর বুটভিজানা॥

জগৎ পালিছেন যে মা, সাদরে তাও কি জান না?

ওরে—কেমনে দিতে চাস্‌ বলি, মেষ, মহিষ আর ছাগল-ছানা॥

৪

মন তোর এ ভাবনা ক্যানে,

একবার কালী বলে ব'সরে ধ্যানে।

জাঁক জমকে কর্‌লে পূজা, অহঙ্কার হয় মনে মনে।

তুমি—লুকিয়ে তাঁরে কর্‌বে পূজা, জান্‌বে না রে জগজ্জনে॥

ধাতু, পাষাণ, মাটির মূর্ত্তি, কাজ কি রে তোর সে গঠনে।
তুমি—মনোময় প্রতিমা গড়ি, বসাও হৃদি-পদ্মাসনে॥
আলোচাল আর পাকা কলা, কাজ কি রে তোর সে আয়োজনে।
তুমি—ভক্তি-সুধা খাইয়ে তারে তৃপ্তি কর আপন মনে॥
ঝাড় লণ্ঠন বাতির আলো, কাজ কিরে তোর সে রোসনায়ে।
তুমি—মনোময় মাণিক্য জ্বেলে দাওনা জ্বলুক নিশিদিনে॥
মেষ, ছাগল, মহিষাদি কাজ কি রে তোর বলিদানে।
তুমি—জয় কালী, জয় কালী বলে, বলি দাও ষড়রিপুগণে॥
প্রসাদ বলে ঢাক ঢোলে, কাজ কিরে তোর সে বাজনে।
তুমি—জয় কালী বলি, দাও করতালি, মন রাখ সেই শ্রীচরণে॥

বেদের গূঢ়তত্ত্ব-প্রকাশক এই চারিটি গানের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে বুঝা যাইবে যে, ভক্তির আবেগ, ভগবদ্ভক্তের হৃদয়ে যত অধিক প্রবল হইতে থাকে, তাহার আরাধ্য-দেবতার পূজার বাহ্য আড়ম্বরের আসক্তিও তত অধিক শিথিলতা প্রাপ্ত হয়। ইহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, কোন বিষয়ী লোকের হৃদয়ে ভগভক্তি-উদয়ের সূত্রপাত হইতে থাকিলে, প্রথমতঃ তাঁহার বিষয়ী ভাবে যথাশক্তি সমারোহের সহিত নানা দেব-দেবীর পূজা, পাঠ, নানাবিধ তীর্থপর্য্যটন, নানাবিধ তীর্থে স্নান, তীর্থশ্রাদ্ধ, ব্রাহ্মণভোজন, কাঙ্গালীবিদায়, রাস্তা-ঘাট-পুষ্করিণী-উৎসর্গ, দেবালয়-স্থাপন, অন্ন-সত্র প্রদান, পান্থশালা নির্ম্মাণাদি নানাবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া, ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করিতে তাঁহার বড় আগ্রহ থাকে; পরে সে ব্যক্তি যদি ভগবৎ-কৃপায় প্রকৃত পক্ষে ভগবন্মুখী হইতে পারেন, তবে তাঁহার ভগবদ্ভক্তির আবেগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া উপাস্য দেবতার প্রতি রতি জন্মে। এই ভগবদ্বিষয়ে রতির গাঢ়ত্বপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ভক্তের হৃদয়ের ভাবসকল সমুদিত হইতে থাকে। তখন ভক্ত বাহ্য আড়ম্বর করিয়া দেবার্চ্চনা বা ধর্ম্মার্জ্জন করিতে ক্রমশঃ অশক্ত হইতে থাকেন। পরিশেষে ভক্তের হৃদয়ে ভগবৎ-প্রেম সমুদিত হইতে থাকিলে, তাঁহার ভাবের আধিক্য বৃদ্ধি পাইয়া ভক্ত আর কোন প্রকার বাহ্য আড়ম্বর করিয়া ভগবৎ-সাধনা করিতে সম্পূর্ণরূপ অক্ষম হইয়া পড়েন; অর্থাৎ মহাভক্ত রামপ্রসাদের ন্যায় গয়া, কাশী, বৃন্দাবনাদি পুণ্যক্ষেত্র এবং গঙ্গা, যমুনাদি সর্ব্বতীর্থ, এবং রাম, কৃষ্ণ, হরি, হরাদি

সর্ব্বপ্রকার দেবতা, ভক্তের হৃদ্‌কমলে, ভক্তের আরাধ্য-দেবতার কলেবরে (অন্তর্দৃষ্টিতে) প্রত্যক্ষ হয়।

এই কথাটা বৈষ্ণবদিগের ভাবে বলিতে গেলে, বলিতে হয় যে, ভগবদাসক্তির প্রথম বিকাশকে ভক্তি বলে; এই ভক্তি গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহাকে রতি বলে। আবার রতি গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহা প্রেম-আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে বুঝুন, ভক্তের হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির ক্রমশঃ আধিক্য হইয়া, যখন ভগবৎ প্রেমের ভাবে ভক্ত মাতোয়ারা হইয়া যান, তখন তিনি ব্রজ-গোপীদিগের ন্যায় সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মাধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানে আত্মনিবেদন করেন, অর্থাৎ বস্ত্রহরণ-লীলায় ব্রজেন্দ্র-নন্দন, বংশী-বদন, রাস-বিহারী শ্রীকৃষ্ণের, প্রেম-মাধুর্য্যের আস্বাদন করিয়া, বিভোর হইয়া, দেশাচার, কুলাচার, গুরুজন-বাক্য এবং শাস্ত্রের শাসনাদি উল্লঙ্ঘন করিয়া, কুল, মান, শীল, লজ্জা, ভয় পরিত্যাগ করিয়া, অপত্য ও দাম্পত্য স্নেহাদি সর্ব্বপ্রকার মায়া মমতায় অনাসক্ত হইয়া, এমন কি স্বীয় স্বীয় সতীত্বধর্ম্মাদি বিসর্জ্জন করিয়া সর্ব্বতোভাবে উন্মাদিনী হইয়া ব্রজগোপীগণ যে প্রকার শ্রীভগবানে আত্মনিবেদন করিয়াছেন, ঠিক সেই প্রকার প্রকৃত ভগবৎ-প্রেমিক, সেই ব্রজগোপীগণের ন্যায় ভগবদ্ভক্তির বাহিক সর্ব্বপ্রকার আড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া আরাধ্য-দেবতাকে নিবেদন করে।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"

যে দুঃসাধ্য সাধনায় শ্রীভগবানে আত্মনিবেদন করা যায়, তাহাই প্রকৃত ভক্তের পূজা-পদ্ধতি এবং এই প্রকার পূজাই কলিকালের জীবের কর্ম্মবন্ধন বিচ্ছিন্ন করিবার একমাত্র উপায়। তাই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, ভাব ও মহাভাবময় ভক্তির সাধনা ব্যতীত কলিকালে 'নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা'।

কি প্রকারের সাধনায় উক্ত প্রকার ভগবৎ-প্রেম উদয় হয়, তাহা শ্রীশ্রীমহাপ্রভু রঘুনাথ দাসকে শিক্ষাচ্ছলে জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন,—

"গ্রাম্যকথা না কহিবে গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥

অমানী মানদ্ কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে॥
এই ত সংক্ষেপে আমি কৈল উপদেশ।
স্বরূপের ঠাঞি ইহার পাবে সবিশেষ॥
*　　　*　　　*
পুনঃ সমর্পিল তারে স্বরূপের স্থানে।
অন্তরঙ্গ সেবা করে স্বরূপের সনে॥

তথাহি পদ্মাবল্যাং—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনাং মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

মহাপ্রভু রঘুনাথ দাসকে পূজা-পদ্ধতি বা সাধন-পদ্ধতি এই ভাবে শিক্ষা দিতেছেন,—তুমি গ্রাম্য কথা কহিবে না ও শুনিবে না অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ-লীলা-বিলাসাদি ব্যতীত অন্য কোন কথা শুনিবে না বা কহিবে না, ভাল পরিবে না এবং ভাল খাইবে না অর্থাৎ খাওয়া পরার আসক্তি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া, তৃণের ন্যায় সকলের নিকট বিনয়ী হইয়া এবং বৃক্ষের ন্যায় শত্রুপক্ষেরও নির্য্যাতন সহ্য করিয়া, হরিনাম কীর্ত্তন, মননাদি করিবে, তাহা হইলে অচিরাৎ-ভগবদ্দর্শন লাভ হইবে। কেবল তাহাই নহে, মহাপ্রভু নিজে ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া শাস্ত্রবিধি-অনুসারে পুষ্প, চন্দন, নৈবেদ্যাদি উপচার সহ, এবং বিধিবদ্ধ সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ইষ্টদেবতার পূজা করিতে শিক্ষা দেন নাই, তাহার বিপরীত, তাঁহার বিশেষ অন্তরঙ্গ ভক্ত রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে যে ভাবে রাধাকৃষ্ণের লীলা-বিলাস চিন্তা করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা তিনি নিজে আচরণ করিয়া তাঁহার পুরীলীলায় বিশেষতঃ গম্ভীরা-লীলায় জগৎকে বুঝাইয়াছেন। এক্ষণে একটি ঘোরতর প্রশ্ন উত্থাপিত হইতেছে যে, বৃন্দারণ্যবাসী রূপ, সনাতনাদি আদর্শ গোস্বামীগণ শ্রীগোবিন্দজী এবং শ্রীমদনমোহনাদি বিগ্রহগণকে সনৎকুমার তন্ত্রোক্ত কামবীজ এবং কামগায়ত্রী সহ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের প্রণালী অনুসারে পূজা বা সেবা করিতেন কেন? এবং মহাপ্রভুই বা ইহা নিষেধ না করিয়া অনুমোদন করিলেন কেন? তিনি সনাতন গোস্বামীকে অনুমতি করিলেন যে;—

"বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব-আচার।
ভক্তি স্মৃতিশাস্ত্র করি, করিহ প্রচার॥"

ইহাতে বুঝিতে হইবে, মহাপ্রভুর ইচ্ছানুসারেই উক্ত ভাবে বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-সেবা চলিতেছে।

এক্ষণে এই গুরুতর প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা সহজ নহে; কেন না মহাপ্রভুর ক্রিয়াকলাপ অবিচিন্ত্য, মনুষ্যবুদ্ধির গম্য নহে, তবে যুক্তি বিচারে যতদূর বুঝা যায়, তাহাতে মনে হয় যে, শ্রীভগবান্ ভক্তের অধীন অর্থাৎ ভক্ত শ্রীভগবান্‌কে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, এই পঞ্চবিধ ভাবের যে কোন ভাবে, যে কোন নামে, এবং যে কোন মূর্ত্তিতে আরাধনা করেন, ভক্তের ভগবান্‌ও সেই ভাবে ও সেই মূর্ত্তিতে দয়াপরবশ হইয়া ভক্তকে দর্শন দেন। মহাপ্রভুর জীবনী পাঠ করিলে দেখা যায় যে, এই ভগবদ্বাক্যের সত্যতা তিনি সর্ব্বস্থানে প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। অদ্বৈত, শ্রীনিবাসাদি ভক্তগণের দাস্যরতি সুদৃঢ় ছিল, তাই তাঁহাদের শ্রীভগবানের প্রতি পূর্ণৈশ্বর্য্য এবং প্রভুজ্ঞান অত্যন্ত প্রবল থাকায়, তাঁহারা মহাপ্রভুকে বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ জ্ঞান করিতেন; মহাপ্রভুও তাঁহাদের নিকট নারায়ণ ছিলেন; শ্রীমুরারি গুপ্ত এবং রূপ-সনাতনের ছোট ভাই অনুপমের নিকট মহাপ্রভু 'রাম', স্বরূপ এবং রঘুনাথ দাসের নিকট মহাপ্রভু সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন, রূপ-সনাতনাদির নিকট মহাপ্রভু সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান শৃঙ্গাররসস্বরূপ মন্মথমদন রাস-বিহারী, প্রকাশানন্দের নিকট তিনি বৈদিক রসবিগ্রহস্বরূপ, হরিদাস ঠাকুরের নিকট তিনি নামরূপী পরতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্, সার্ব্বভৌমের নিকট তিনি একাধারে রামকৃষ্ণচৈতন্য বা ষড়্ভুজ সর্ব্বাবতারের অবতারী-স্বরূপ মহাপ্রভু এবং রসতত্ত্বজ্ঞ রায় রামানন্দের তিনি রসরাজ মহাভাবরূপ ছিলেন। এই প্রকার যে ভক্তের যে ভাব, তাঁহার নিকট সেই রসের ভাবমূর্ত্তিতে বিরাজিত থাকিয়া জগৎকে বুঝাইয়া গিয়াছেন যে, শ্রীভগ-বান্ অনন্ত ঐশ্বর্য্যের বিষয় এবং তাঁহার অনন্ত ভক্তগণও বিভিন্ন প্রকৃতিযুক্ত, সুতরাং তাঁহারা অনন্তরসের এবং ভাবের আশ্রয়; কাজে কাজেই ভক্তবৎসল ভগবান্ অনন্তভাবে অনন্ত রসবিগ্রহ হইয়া, প্রত্যেক ঐকান্তিক ভক্তের নিকট তাঁহার স্বীয় তনু প্রকাশ করেন। ইহার ভাবার্থ এই যে, যে ভক্ত তাঁহাকে যে মূর্ত্তিতে এবং যে রসে ভজন করেন, তাঁহার নিকট তিনি সেই রসে এবং সেই মূর্ত্তিতে প্রকাশ হন। এই শাস্ত্রীয় যুক্তি বৈদিক ভাবে বুঝিতে গেলে বুঝিতে

হয় যে, শ্রীভগবান্ পূর্ণ, আর সৃষ্ট পদার্থসকলকে ব্যষ্টি অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ধরিয়া বিচার করিতে গেলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক সৃষ্টবস্তু অণু পরমাণু মাত্রায় শ্রীভগবানের এক একটী বিশিষ্ট গুণের আশ্রয় হইয়া তাঁহারই মহিমা প্রকাশ করিতেছে। গুণী ব্যতীত গুণের অস্তিত্ব সাধারণ মনুষ্যে কল্পনা করিতে পারে না, এজন্য প্রত্যেক জীবে বা জড়ে, এক কথায়, প্রত্যেক তত্ত্ব-অবয়ব বা পরমাণুকে এই বিশিষ্ট গুণের আশ্রয় বলিয়া আমরা আরোপ করি। বাস্তবিক পক্ষে, কোন তত্ত্ব অবয়বের অর্থাৎ জড়ের কিম্বা জীবের শক্তি বা গুণ প্রকাশ করিবার উপায় নাই, এক কথায়, সকলই আশ্রয় স্থানীয়। এক্ষণে শ্রীভগবানের এই বেদ-প্রতিপাদ্য বিভুত্ব যাঁহারা হৃদয়ে ধারণা করিতে সক্ষম বা অধিকারী, তাঁহারা সর্ব্বভূতের মধ্যে আপনাপন ভাবের অনুকূল শ্রীভগবানের প্রতীক্ নির্ব্বাচন করতঃ তাহাতে ভগবদ্বুদ্ধি আরোপ করিয়া, ভগবৎ-সাধন-তত্ত্বের চরমসীমায় পৌছিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা সম্ভূতিকে অর্থাৎ সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে কোন জড় বা জীবকে আশ্রয় স্থানীয় না করিয়া, বিষয়-শ্রেষ্ঠ পরতত্ত্ব মনে করিয়া তাহার উপাসনায় নিযুক্ত হন, তাঁহারা উক্ত জীব বা জড়ের যতদূর শক্তি, তত পরিমাণ শক্তি লাভ করিতে পারেন; কিন্তু পূর্ণতত্ত্বের জ্ঞাতা হইতে পারেন না, ইহাই পরমকারুণিক মহাপ্রভু নিজে ভক্ত সাজিয়া এবং তাঁহার শিষ্যগণ দ্বারা জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন; এই সমস্ত তত্ত্ব মনে রাখিয়া কাম-গায়ত্রীর অর্থ বিচার করিতে গেলে দেখা যায় যে, রাধাতন্ত্রোক্ত সম্ভূতি বা দেবতা উপাসনায় প্রযোজ্য "হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ" ইত্যাদি তারক-ব্রহ্ম নামের অর্থ বা অভিপ্রায় পরিবর্ত্তন করিয়া মহাপ্রভু যদ্রূপ ব্রহ্ম বা সাবিত্রী গায়ত্রীরূপে পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তদ্রূপ কাম-বীজ এবং সনৎকুমার কল্পোক্ত বা তন্ত্রোক্ত সম্ভূতি অর্থাৎ প্রাকৃতিক্ সৃষ্টপদার্থ বা দেবতা উপাসনা করিবার জন্য প্রযোজ্য কাম-গায়ত্রী মন্ত্রের অভিপ্রায় বা অর্থ পরিবর্ত্তন করিয়া সাবিত্রী গায়ত্রীরূপে পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, এই বিষয়টা বুঝিতে গেলে একটু নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া বুঝিতে হয়, যথা—ওঁ এই অক্ষর এবং ক্লীং এই অক্ষর একই অর্থ বোধক, ইহাদের বিশ্লেষণ করিলে এই প্রকার হয়, যথা :—

ওঁ = বাক্-প্রাণ (মিথুনে সমাগচ্ছ) = রাধাকৃষ্ণ (এই বিষয়ের বিচার পূর্ব্বে ৮৪ পৃষ্ঠায় বিশদভাবে করা হইয়াছে) অর্থাৎ উভয় অক্ষরই ভগবদ্বাচক।

ক্লীং = কৃষ্ণ = রাধাকৃষ্ণ (মিথুনে সমাগচ্ছ), ইহার ভাবার্থ এই যে, একক পুরুষ-তত্ত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করা বেদবিরুদ্ধ। বেদ পরিষ্কার ভাষায় জগৎকে বুঝাইয়াছেন যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে "স্বধয়া" অর্থাৎ স্বধার দ্বারা বা স্ত্রীতত্ত্বের দ্বারা একটী প্রাণ বা পুরুষতত্ত্ব বিরাজিত বা প্রকাশিত ছিল (৯১ পৃষ্ঠায় ইহার বিশদবিচার প্রদর্শন করান হইয়াছে), সুতরাং কৃষ্ণ বা পুরুষ-তত্ত্বের স্বত্ত্বা বলিলে ইহার সঙ্গে স্ত্রীতত্ত্ব উহ্য থাকিবেই থাকিবে। সুতরাং কৃষ্ণ = রাধাকৃষ্ণ, ইহার সংক্ষিপ্ত শব্দ ক্লীং; অতএব ওঁ অর্থে যাঁহাকে বুঝাইতেছে, ক্লীং অর্থেও তাঁহাকেই বুঝাইতেছে।

এক্ষণে তন্ত্রানুসারে কামগায়ত্রীর অর্থ করিতে গেলে দেখা যায়, যে যে তন্ত্রের যে যে স্থানে কৃষ্ণের ধ্যান আছে, সেইগুলি মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া অর্থ গ্রহণ করিলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, অবতার-প্রাপ্ত মায়াগন্ধযুক্ত বাসুদেব কৃষ্ণ বৃন্দাবনের রাসস্থলীতে সাক্ষাৎ কামদেব রূপে রাস করিয়াছিলেন। এই ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণকে তন্ত্রে তাঁহার পূজা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র নামে, দশ অক্ষর, ত্রয়োদশ অক্ষর, অষ্টাদশ অক্ষর, বিংশতি অক্ষর, দ্বাবিংশতি অক্ষর, চতুর্দ্দশাক্ষর, একাক্ষর, অষ্টাক্ষর, দ্বাদশাক্ষর, ষোড়শাক্ষর ইত্যাদি, বিবিধ মন্ত্রানুযায়ী পূজার বিধি এবং ধ্যান-মন্ত্র দেখা যায়, কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের আরাধ্য পরম কৃষ্ণ বা অবতারী কৃষ্ণ বা স্বয়ং ভগবানের পূজার বিধি কোন তন্ত্রের কোন স্থানে নাই। কৌতূহলাক্রান্ত পাঠকদিগের অবগতির জন্য তন্ত্র হইতে শ্রীকৃষ্ণের একটি ধ্যান-মন্ত্র উদ্ধৃত করা হইল, যথা :—

স্মরেদ্বৃন্দাবনে রম্যে মোহয়ন্তমনারতম্।
গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ॥
আত্মনো বদনাম্ভোজে প্রেরিতাক্ষিমধুব্রতাঃ।
পীড়িতাঃ কামবাণেন চিরমাশ্লেষণোৎসুকাঃ॥
মুক্তাহারলসৎপীনতুঙ্গস্তনভরানতাঃ।
স্রস্তধম্মিল্লবসনা মদস্খলিতভাষণাঃ॥
দন্তপঙ্‌ক্তি-প্রভোদ্ভাসি-স্পন্দমানাধরাঞ্চিতাঃ।
বিলোভয়ন্তীর্ব্বিবিধৈর্ব্বিভ্রমৈর্ভাবগর্ব্বিতৈঃ॥

ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ং,
শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্ ॥
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং গোগোপসংঘাবৃতং,
গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে ॥

ইহার অর্থ যথা :—রমণীয় বৃন্দাবনস্থানে পুণ্ডরীকাক্ষ গোবিন্দ সহস্র সহস্র গোপকন্যাকে মোহিত করিতেছেন। ঐ সকল গোপ-বালিকারা শ্রীকৃষ্ণের বদন-কমলে স্বীয় নয়নস্বরূপ ভ্রমরগণকে প্রেরণ করিতেছে এবং তাহারা কামবাণে পীড়িত ও শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনের নিমিত্ত সাতিশয় সমুৎসুক। তাহাদের স্থূল ও উচ্চতর স্তনোপরি মুক্তাহার লম্বিত আছে এবং স্তনভারে গোপিকাগণ কিঞ্চিৎ নম্রভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহাদের পরিধেয় বসন ও কবরীবন্ধন বিগলিত হইতেছে এবং মদভরে বাক্যস্খলিত হইতেছে। দন্তপংক্তি-প্রভা অধরে পতিত হইয়া অধরের শোভা-বর্দ্ধিত করিতেছে। গোপীগণ বিলাসপূর্ণ ভাবভঙ্গীদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রলোভন দেখাইতেছেন। প্রফুল্ল ইন্দীবরের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের দেহকান্তি, চন্দ্রের ন্যায় শোভাপূর্ণ বদন, শিরোদেশ ময়ূরপুচ্ছভূষণে বিভূষিত, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস-চিহ্ন, কণ্ঠে কৌস্তুভমণি, পরিধান পীতবস্ত্র। গোপীদিগের নয়নোৎপল দ্বারা সর্ব্বশরীর অর্চ্চিত এবং গো ও গোপগণে পরিবৃত। ইনি করে বেণু ধারণ করিয়া সেই বেণুবাদনে তৎপর আছেন; ইঁহার সর্ব্বশরীর দিব্য অলঙ্কারে বিভূষিত।

এই ধ্যান শ্রীবৎস-চিহ্ন এবং কৌস্তুভমণিধারী কৃষ্ণের, সুতরাং এই কৃষ্ণ শ্রীনারায়ণের অবতার, মায়াগন্ধযুক্ত গুণময় সত্ত্বৃতি। এইরূপ অনেক ধ্যান-মন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্রে আছে; কিন্তু 'স্বয়ং ভগবানের' ধ্যান কোনস্থানে কোন তন্ত্রে নাই। যাঁহারা ইহার বিশেষ তত্ত্বানুসন্ধান করিতে চাহেন, তাঁহারা 'হরিভক্তি-বিলাসের' পঞ্চম বিলাস পাঠ করুন, তাহাতে বুঝিতে পারিবেন যে, 'সম্মোহন তন্ত্রে' শিব-উমা সংবাদে উক্ত আছে, মহাদেব উমাকে বলিতেছেন যে, প্রিয়ে এই মন্ত্র অর্থাৎ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী তুমি এবং গোপবেশ-ধারী শ্রীকৃষ্ণ ইহার দেবতা। আরও লেখা আছে, এই কামবীজের 'ন্যাস'

করিবার সময় সকল অঙ্গুলিদ্বারা পঞ্চাঙ্গ ন্যাসের সহিত (কামদেবের) পঞ্চবাণ এবং পঞ্চ অনঙ্গের ন্যাস করিবে। পঞ্চবাণ যথা,—দ্রাবণ, ক্ষোভণ, আকর্ষণ, বশী-করণ, এবং স্রাবণ; পঞ্চ অনঙ্গ যথা,—শোষণ, মোহন, সন্দীপন, তাপন, এবং মাদন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গের ফলপ্রাপ্তির জন্য এই মন্ত্র প্রয়োগ করিবে। এক্ষণে যাঁহাদের কোনপ্রকার বিচার শক্তি আছে, তাঁহারা বুঝুন যে, সম্মোহন তন্ত্রোক্ত গোপবেশধারী কৃষ্ণ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের উপাস্য নহেন, এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাদি প্রাপ্তির জন্য সর্ব্বপ্রকার সকাম পূজা, কৃষ্ণভক্তির বাধক। সাধারণ লোককে কৃষ্ণতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে এই প্রকার বর্ণনা করা হইয়াছে যে:—

"স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পরতত্ত্ব।
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব॥
নন্দসুত বলি যাঁরে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঞি॥"

চৈঃ চঃ।

ভাগবতের বর্ণনানুসারে মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্‌কে, শ্রীকৃষ্ণ, নন্দসুত বা যশোদা-নন্দন ইত্যাদি নামে অভিহিত করিতেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে অন্ত্যলীলায় বর্ণনা আছে যে, বল্লভাচার্য্যের কথার প্রত্যুত্তরে মহাপ্রভু বলিয়া-ছিলেন যে:—

"প্রভু কহে কৃষ্ণনামের বহু অর্থ না মানি।
শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন মাত্র জানি॥
এই অর্থমাত্র আমি জানিয়ে নির্দ্ধার।
আর সব অর্থে মোর নাহি অধিকার॥"

চৈঃ চঃ।

এক্ষণে যাঁহারা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুকে শিক্ষাগুরু পদে বরণ করিয়া আত্ম-নিবেদন করিয়াছেন, তাঁহারা ভাল করিয়া বুঝুন যে, মহাপ্রভু যখন শ্রীভগবান্‌কে শ্যাম-সুন্দর যশোদানন্দন অর্থে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তখন যাঁহারা এই শ্রীভগ-বান্‌কে অন্য অর্থে বা অন্য বুদ্ধিতে বুঝিবেন, ধ্যান করিবেন বা পূজা করিবেন, তাঁহারা মহাপ্রভুর আজ্ঞার বিরুদ্ধ কার্য্য করিবেন বলিয়া বুঝিতে হইবে।

যাহা হউক, এই সমস্ত বিচারে বুঝিতে হইবে যে, তান্ত্রিকগণ এই সকল তন্ত্র মহাভারত যুদ্ধের পর হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই জন্যই মহাপ্রভু সনাতনকে শিক্ষাচ্ছলে জগৎকে বুঝাইয়া গিয়াছেন যে, জীবগণকে মোহান্ধ করিবার জন্য পুরাণ ও তন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে।(১০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) ইহার দ্বারা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে, মহাভারত যুদ্ধের পর হইতে মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সময় পর্য্যন্ত,এই সুদীর্ঘকাল, এদেশ জৈন, বৌদ্ধ, তান্ত্রিক ও পৌরাণিকদিগের লীলাভূমি ছিল, ইহারা সকলেই সম্ভূতি অর্থাৎ দেবদেবীর উপাসনায় নিযুক্ত হইয়া ভগবৎ-বিমুখী হইয়া পড়িয়াছিল; পরে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব হওয়ায় তাঁহার ঐশ্বরিক শক্তি প্রভাবে তিনি নিজে এবং তাঁহার শিষ্যদিগের দ্বারা তন্ত্র ও পুরাণের প্রতিপাদ্য দেবদেবীর এবং তাঁহাদের পূজার মন্ত্রসকলের অর্থ পরিবর্ত্তন করিয়া ভগবন্মুখী হইবার পন্থা প্রদর্শন করান অর্থাৎ তন্ত্র ও পুরাণে বর্ণিত দেবদেবীবাচক শব্দসকলের অর্থ, মহাপ্রভু শাস্ত্রবিচার দ্বারা 'ঈশ্বরবাচক' বলিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন এবং দেব-দেবী-পূজার মন্ত্রের অর্থ পরিবর্ত্তন করিয়া ভগবৎপূজার অর্থে পরিণত করিয়াছিলেন। এই সমস্ত বিচার মনে রাখিয়া পুনরায় আমরা কামগায়ত্রীর অর্থের বিচার করিতে গেলে বুঝিতে পারিব যে, শ্রীভগবানের তুরীয় অবস্থায় তুরীয়-মিথুন-সমাগচ্ছ বাক্-প্রাণ বা স্বধা-প্রাণ বা তুরীয়-রাধা-কৃষ্ণ যে নিত্যলীলা করেন বা করিতেছেন, তাহা বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে রাসলীলার অবতারণা করা হইয়াছে। এক্ষণে এই তুরীয় ভগবান্ বা রাসবিহারী অবতারীকৃষ্ণকে তান্ত্রিক কামগায়ত্রীর দ্বারা কামদেব বলিয়া প্রাকৃতিক মায়াতে আবদ্ধ করিলে, তাঁহার মহিমা কি অধিক বৃদ্ধি হয়? তাই পরমকারুণিক মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণের এবং তাঁহার উপাসনার গায়ত্রী-মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ জগৎকে নিম্নলিখিত প্রকারে বুঝাইয়াছেন এবং সনাতনাদি তাঁহার প্রিয়শিষ্যগণও শ্রীগোবিন্দ, মদনমোহনাদি বিগ্রহ স্থাপন করিয়া, এই রাসবিহারী কৃষ্ণের সেবা কি প্রকারে করিতে হয়, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন :—

"বৃন্দাবনে যোগপীঠ কল্পতরুবনে।
রত্নমণ্ডপ তাহে রত্ন-সিংহাসনে॥

শ্রীগোবিন্দ বসিয়াছেন ব্রজেন্দ্রনন্দন।
মাধুর্য্য প্রকাশি করেন জগৎ-মোহন ॥
বামপার্শ্বে শ্রীরাধিকা সখিগণ সঙ্গে।
রাসাদিক লীলা প্রভু করে কত রঙ্গে ॥
যাঁর ধ্যান নিজ লোকে করে পদ্মাসন।
অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রে করে উপাসন ॥
চৌদ্দভুবনে যাঁর সবে করে ধ্যান।
বৈকুণ্ঠাদ্যে যাঁর লীলাগুণ করে গান ॥”

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে স্থানান্তরে এই প্রকার বর্ণনা আছে :—

“বৃন্দাবনে কল্পদ্রুমে সুবর্ণ-সদন।
মহাযোগপীঠ তাহা রত্ন-সিংহাসন ॥
তাতে বসি আছে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
শ্রীগোবিন্দদেব নাম সাক্ষাৎ মদন ॥
রাজসেবা হয় তাহা বিচিত্র প্রকার।
দিব্য সামগ্রী দিব্য বস্ত্র দিব্য অলঙ্কার ॥
সহস্র সেবক সেবা করে অনুক্ষণ।
সহস্র বদনে সেবা না যায় বর্ণন ॥
সেবার অধ্যক্ষ শ্রীপতি হরিদাস।
তাঁর যশ গুণ সর্ব্বজগতে প্রকাশ ॥
সুশীল সহিষ্ণু শান্ত বদান্য গম্ভীর।
মধুর বচন মধুর চেষ্টা অতি ধীর ॥
সবার সম্মানকর্ত্তা করে সবার হিত।
কৌটিল্য মাৎসর্য্য হিংসা না জানে তাঁর চিত ॥
কৃষ্ণের যে সাধারণ সদ্‌গুণ পঞ্চাশ।
সেই সব ইঁহার শরীরে প্রকাশ ॥
অনন্ত কৃষ্ণের গুণ চৌষট্টি প্রধান।
এক গুণ শুনি জুড়ায় ভক্তের প্রাণ ॥”

ইহার ভাবার্থ এই যে, শ্রীভগবানের অনন্ত গুণ-মধ্যে চৌষট্টি গুণ প্রধান।

এই চৌষট্টি গুণের মধ্যে পঞ্চাশটী গুণকে শাস্ত্রে সামান্য গুণ বলিয়া উল্লেখ করেন, কেন না, ঐ পঞ্চাশটী গুণ কমবেশী পরিমাণে ভক্তের শরীরে প্রকাশ পায়, আর শ্রীভগবানের বাকী চৌদ্দটী বিশেষগুণ জীবশরীরে প্রকাশ পায় না। শ্রীভগবানের পঞ্চাশটী গুণ, যথা :—

অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ।
রুচিরস্তেজসা যুক্তো বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ॥
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ম্বদঃ।
বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান প্রতিভান্বিতঃ॥
বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচির্ব্বশী॥
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ।
বদান্যো ধার্ম্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ॥
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগতপালকঃ।
সুখী ভক্তসুহৃৎ প্রেম-বশ্যঃ সর্ব্বশুভঙ্করঃ॥
প্রতাপী কীর্ত্তিমান্ রক্তলোকঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ।
নারীগণমনোহারী সর্ব্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান্॥
বরীয়ান্ ঈশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
সমুদ্রা ইব পঞ্চাশৎ দুর্ব্বিগাহা হরেরমী॥

ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্বজনের নায়ক, মনোহরাঙ্গ, নিখিল সুলক্ষণবিশিষ্ট, রুচির, তেজস্বী, বলিষ্ঠ, কিশোরবয়স্ক, নানাবিধ ভাষাবিৎ, সত্যভাষী, বাগ্মী, পণ্ডিত, বুদ্ধিমান, প্রতিভাশালী, সুরসিক, চতুর, দক্ষ, কৃতজ্ঞ, দৃঢ়ব্রত, দেশকালপাত্রজ্ঞ, শাস্ত্রদৃষ্টি, পবিত্র, জিতেন্দ্রিয়, স্থির, দান্ত, ক্ষমাবান, গম্ভীর, ধৃতিশীল, সাম্য-পরায়ণ, বদান্য, ধর্ম্মশীল, শূর, দয়ালু, মানদ, বিনয়বান্, লজ্জাশীল, শরণাগত-রক্ষক, সুখী, ভক্তসুহৃৎ, প্রেমবশ, সর্ব্বজনমঙ্গলকারী, মহাপ্রতাপবান্, কীর্ত্তি-শালী, লোকানুরঞ্জক ও সাধুগণের আশ্রয়। তিনি রমণীমনোরঞ্জন, সর্ব্ব-

জনারাধ্য, মহাসমৃদ্ধিমান, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও স্বতন্ত্র ঈশ্বর। ভগবান্ কৃষ্ণের গুণরাশি অগাধ সাগরবৎ গভীর; তন্মধ্যে এই পঞ্চাশৎসংখ্যকমাত্র বর্ণিত হইল।

ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে, শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দদেব-বিগ্রহের সেবাইত হরিদাস পণ্ডিতের শরীরে এই পঞ্চাশ প্রকার ভগবদ্গুণ প্রকাশিত হইয়াছিল। ভক্তির এতদূর উৎকর্ষ বা গাঢ়ত্ব হইয়াছিল বলিয়া, গোবিন্দ-বিগ্রহকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের স্থানান্তরে রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের এই প্রকার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে:—

"ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব-অবতারী সর্ব্বকারণ-প্রধান॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার॥
সচ্চিদানন্দ-তনু শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সর্ব্বশক্তি-সর্ব্বরস পূর্ণ॥"

এই স্বয়ং ভগবান্ যখন ভক্তাধীন হইয়া বিগ্রহ স্বীকার করেন, তখন তিনি তাঁহাকে ঐকান্তিক ভক্তের নিকট অতি প্রিয়বস্তু হন, ইহা প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে এই প্রকার বর্ণনা আছে, যথা—

"বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন॥
পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন॥"

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ॥
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্॥

এই সকল পয়ার ভাল করিয়া বিচার করিয়া বুঝিতে গেলে বুঝা যায় যে, মহাপ্রভু ভাগবতের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, রাসবিহারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, এবং বৃন্দাবনের বিগ্রহরূপ নবীন মদন ও (শ্রীগোবিন্দ ও মদনমোহনাদি বিগ্রহ) স্বয়ং ভগবান্, এই স্বয়ং ভগবান্‌কে অপ্রাকৃত মদন বলা

হইয়াছে এবং মন্মথ-মদনও বলা হইয়াছে। অপ্রাকৃত মদন অর্থে চিন্ময় বা কারণ-স্থানীয় মদন বুঝায়, প্রাকৃতিক মদনকে কার্য্যস্থানীয় মদন বুঝায়। যেহেতু শ্রীভগবান্‌কে তুরীয়াবস্থায় তুরীয় মিথুনে স্বধা বা বাকের পতিভাবে সর্ব্বকারণ-কারণ স্থানীয় চিন্ময় মদন ভাবে বিরাজিত থাকেন বলিয়া বর্ণনা আছে; এজন্য ভক্তিগ্রন্থে এই তুরীয় ভগবান্‌কে মন্মথমদন বলা হইয়াছে। এই সমস্ত বিচার দ্বারা, ওঁকার এবং বৈদিক গায়ত্রী দ্বারা যে তুরীয় ব্রহ্ম বা কৃষ্ণকে বুঝায়, ক্লীং বীজ এবং কাম গায়ত্রী দ্বারাও সেই তুরীয় ব্রহ্ম বা তুরীয় কৃষ্ণকেই বুঝায়, সুতরাং উভয়ে একার্থবোধক বা এক। যে সমস্ত বিধিমার্গীগণ বুঝেন যে, শব্দ, অক্ষর, বীজ-মন্ত্র ইত্যাদিতে এক একটী শক্তি নিহিত আছে, সেইজন্য এই সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে কোন অক্ষর, শব্দ বা কোন প্রকার পাঠের পরিবর্ত্তন করিলে মন্ত্র বা বীজ নিষ্ফল হয়, তাঁহারা ভাল করিয়া বুঝুন যে, ইহা তাঁহাদের নিতান্ত ভ্রম; শ্রীশ্রীমহাপ্রভু নিজে ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া সর্ব্বশাস্ত্র বিচার করিয়া তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়া গিয়াছেন, ইহাতে সকলকে বুঝিতে হইবে যে, শ্রীভগবান্ ভক্তির অধীন, কিন্তু মন্ত্রের অধীন নহেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটী বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইবে যে, বৃন্দাবনের শ্রীশ্রীগোবিন্দ ও মদনমোহন বিগ্রহকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া আদর্শ গোস্বামীগণ বুঝিয়াছিলেন এবং বর্ণনাও করিয়াছেন; ইহাতে অনেকে আপত্তি করিয়া বলিতে পারেন যে, ইহা বেদ-বিরুদ্ধ, কেননা, যজুর্ব্বেদ পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন যে:—

> অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
> ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ॥
>
> যজুঃ। অঃ ৪০। মঃ ৯॥

ইহার অর্থ পূর্ব্বে অনেকবার বলা হইয়াছে। ইহার অভিপ্রায় এই যে, যে ব্যক্তি অসম্ভূতি অর্থাৎ প্রকৃতি এবং সম্ভূতি অর্থাৎ প্রাকৃতিক পদার্থকে উপাসনা করে, তাহাকে তমসাবৃত স্থানে অর্থাৎ নরকে * যাইতে হয়। এই

---

* অনেকে সন্দেহ করিতে পারেন যে, "নরক" নামে কোন একটী স্থান বেদে উল্লেখ নাই; তাঁহাদের এই সন্দেহ-ভঞ্জনার্থে ঈশোপনিষদ হইতে একটি বচন উদ্ধৃত করা হইল, যথা:—

বেদ-বচনের অর্থ জানিবার জন্য অর্থাৎ সম্ভূতির এবং অসম্ভূতির উপাসনার ফল জানিবার জন্য বেদ-প্রকাশক ঋষিগণ সমাধিস্থ হইয়া আবেশ প্রাপ্তে যাহা বুঝিয়াছিলেন, তাহাই ঈশোপনিষদে এই প্রকার প্রকাশ আছে :—

অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥১৩॥
সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে ॥১৪॥

ইহার অভিপ্রায় এই যে, বেদার্থ-প্রকাশক ঋষিগণ প্রথমতঃ বুঝিলেন, অসম্ভূতি ও সম্ভূতি (এবং সর্ব্বকারণ-কারণ ভগবানের) উপাসনায় পৃথক্ পৃথক্ ফল হয় অর্থাৎ অসম্ভূতিকে উপাসনা করিলে অধিক তমসাচ্ছন্ন প্রদেশে বা নরকে যাইতে হয়; আর সম্ভূতির উপাসনায় তাহাপেক্ষা অধিকতর তমসাচ্ছন্ন নরকে যাইতে হয় (ভগবৎ-উপাসনায় ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ হয়) ॥১৩॥

আবার উক্ত উপনিষদের বচনে প্রকাশ যে, ভগবদ্-প্রাপ্তির অনুসরণ করিবার জন্য যদি কেহ সম্ভূতি বা অসম্ভূতির উপাসনা করে, তবে সে ব্যক্তি এই অসম্ভূতি বা প্রকৃতি এবং সম্ভূতি বা প্রাকৃতিক পদার্থের উপাসনা দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অমৃতত্ব লাভ করে অর্থাৎ ভগবৎ-প্রাপ্তি হয়। এক্ষণে এই বেদ এবং উপনিষদ্ বচন যাঁহারা ভালরূপ বিচার করিয়া বুঝিতে পারিবেন, তাঁহাদের আর এই প্রকার কোন সন্দেহ থাকিবে না যে, শ্রীমহাপ্রভু এবং আদর্শ-গোস্বামীগণ কখন বেদ-বচনের বিরুদ্ধ কোন কার্য্য করেন নাই। অতএব আদর্শ গোস্বামীদিগের দ্বারা স্থাপিত বিগ্রহ বা সম্ভূতির উপাসনা বেদোক্ত ভগবদনুসরণ অর্থাৎ ভগবদ্-প্রাপ্তির উপায় বলিয়া বুঝিবেন।

অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥৩॥

আলোকবিহীন (বা অসুরাবাসভূত) অজ্ঞানরূপ অন্ধকারাবৃত লোকসমূহ আছে। যাহারা আত্মঘাতী, অর্থাৎ যাহারা অবিদ্যাবশতঃ আত্মাকে অস্বীকার করে, তাহারা এই দেহান্তে সেই সমুদায় লোকে গমন করে ॥৩॥

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এবং বেদ।

"স্বতঃপ্রমাণ বেদ প্রমাণ শিরোমণি ॥"

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বেদ প্রমাণকে স্বতঃপ্রমাণ বলিয়া মান্য করিতেন, এক্ষণে এই বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে, ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে গেলে, অথর্ব্ববেদ, যজুর্ব্বেদ, শতপথ ব্রাহ্মণ এবং মনু-সংহিতার এই কয়েকটী বচন প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা :—

যস্মাদৃচো অপাতক্ষন্ যজুর্যস্মাদপাকষন্। সামানি যস্য লোমান্যথর্ব্বাঙ্গিরসো মুখম্। স্কম্ভস্তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ।

অথর্ব্ব। কা ১০। প্রপাঃ ২৩। অনু ৪। মং ২০।

ইহা অথর্ব্ব বেদের বচন ; ইহার ভাবার্থ এই,— যে পরমাত্মা হইতে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ব্ববেদ প্রকাশিত হইয়াছে, তিনি কোন দেবতা ? ইহার উত্তর এই যে, যিনি সকল উৎপন্ন করিয়া ধারণ করিতেছেন, সেই পরমাত্মা।

স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।

যজুঃ। অঃ ৪০। মঃ ৮॥

ইহা যজুর্ব্বেদের বচন, ইহার ভাবার্থ এই যে, যিনি স্বয়ম্ভূ, সর্ব্বব্যাপক, শুদ্ধ, সনাতন এবং নিরাকার পরমেশ্বর, তিনি সনাতন জীবরূপ প্রজাদিগের কল্যাণার্থ বেদ দ্বারা রীতিপূর্ব্বক সমস্ত বিদ্যার উপদেশ করেন।

কোন্ কোন্ ঋষিকে আশ্রয় করিয়া শ্রীভগবান্ বেদ-প্রচার করিয়াছেন, তাহার বর্ণনা শতপথ ব্রাহ্মণে এইরূপ আছে, যথা :—

অগ্নেঋর্গ্বেদো বায়োর্যজুর্ব্বেদঃ সূর্য্যাৎ সামবেদঃ।

শতঃ। ১১। ৪। ২। ৩॥

ইহা শতপথ ব্রাহ্মণের বচন ; ইহার ভাবার্থ এই যে, প্রথমে সৃষ্টির আদিতে পরমেশ্বর অগ্নি, বায়ু, আদিত্য এবং অঙ্গিরা এই কয় ঋষির আত্মায় এক এক বেদ প্রকাশ করিয়াছেন।

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।

শ্বেতাশ্ব:। অ: ৬। ম: ১৮॥

ইহা উপনিষদের বচন। এই বচনে কথিত হইতেছে যে, শ্রীভগবান্ ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন; এই বিরোধের পরিষ্কার মীমাংসা মনুসংহিতায় আছে এবং শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এই মনুর মত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, যথা:—

অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনম্।
দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমৃগ্‌যজুঃসামলক্ষণম্॥

মনু: ।১।২৩॥

ইহা মনুসংহিতার বচন, ইহার ভাবার্থ এই যে, পরমাত্মা আদিসৃষ্টি-সময়ে মনুষ্যদিগকে উৎপন্ন করিয়া, অগ্নি আদি চারি মহর্ষি দ্বারা ব্রহ্মাকে চারিবেদ প্রাপ্ত করাইয়াছেন এবং উক্ত ব্রহ্মা, অগ্নি, বায়ু, আদিত্য এবং অঙ্গিরা হইতে ঋক্, যজুঃ, সাম এবং অথর্ব্ব বেদের গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণে বিচার্য্য যে, শ্রীভগবান্ এই চারিজন ঋষির নিকট যে বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই মৌলিক বেদ বলিলে আমরা কি বুঝিব? বৈদিক পণ্ডিতেরা অনেক গবেষণা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ঋক্, যজু, সাম এবং অথর্ব্ব বেদের মন্ত্র-সংহিতার নাম মূলবেদ; আর ব্রাহ্মণাদি বেদান্তভাগ মূলবেদ নহে, পরন্তু বেদের এই অন্তভাগকে বেদাঙ্গ বলে। এই বেদ এবং বেদাঙ্গের পার্থক্য ভাল করিয়া বুঝিতে যাওয়া একটু বিচার সাপেক্ষ। মূলবেদে অর্থাৎ মন্ত্র-সংহিতায় কোন প্রকার আখ্যায়িকা নাই, আর বেদাঙ্গে বেদার্থ প্রকাশ করিবার জন্য নানাপ্রকার আখ্যায়িকা আছে; এই যুক্তি অনুসারে উপরোক্ত বেদ, উপনিষদ্ এবং মনু স্মৃতিবচনের দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, সৃষ্টির আদিতে শ্রীভগবান্ অগ্নি, বায়ু, আদিত্য ও অঙ্গিরা এই চারিজন ঋষির হৃদয়ে, এবং তাঁহাদের দ্বারা তৎপশ্চাৎ ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ প্রকাশ করেন; এজন্য বুঝিতে হইবে, সৃষ্টির আদিতে কোন প্রকার আখ্যায়িকা বা কোন ইতিহাস সম্ভবে না। কাজে কাজেই মন্ত্র-সংহিতায় কোনস্থানে, কোন আখ্যায়িকা বা

ইতিহাসের অবতারণা নাই। ইহা দ্বারা বেদজ্ঞ পণ্ডিতদিগের সহিত একমত হইয়া বুঝিতে হইবে যে, মন্ত্র-সংহিতাই সৃষ্টির প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং ইহাই মূল বেদ; আর বেদাঙ্গ নানাপ্রকার আখ্যায়িকা ও ইতিহাসে পূর্ণ, তাহাতে বুঝিতে হইবে যে, বেদাঙ্গসকল সৃষ্টির অনেক পরে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে আর একটী বিচার করিতে হইবে যে, মূলবেদের প্রত্যেক মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত মন্ত্র-প্রকাশক এক একটী ঋষির নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে অনেকে মনে করিতে পারেন, যে যে বেদ-মন্ত্রের সহিত, যে যে ঋষির নাম সংযুক্ত আছে, সেই সেই বেদমন্ত্র সেই সেই ঋষি-প্রণীত, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, কারণ নিরুক্ত গ্রন্থে ইহার একটী মীমাংসা দেখিতে পাওয়া যায়, যথা :—

ঋষয়ো মন্ত্রদৃষ্টয়ঃ মন্ত্রান্ সম্প্রাদদুঃ ॥

নিরুঃ ।১।২০॥

ইহার অভিপ্রায় এই যে, বেদ-মন্ত্রের অর্থ জানিবার জন্য ধর্ম্মাত্মা ঋষিগণ সমাধিস্থ হইয়া ঈশ্বরের ধ্যান করিতে করিতে, যে যে ঋষির দ্বারা যে যে বেদ-মন্ত্রের প্রকাশ হইত, সেই সেই ঋষির নাম স্মরণার্থ তাঁহাদের নাম উক্ত মন্ত্রের সহিত যুক্ত হইত। তাই নিরুক্ত শাস্ত্র উক্ত বচনে জগৎকে বুঝাইতেছেন যে, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ, বেদমন্ত্রের প্রণেতা নহেন, বেদমন্ত্রের প্রকাশক মাত্র। যাহা হউক, ভগবদাবেশপ্রাপ্ত ঋষিদিগের দ্বারা বেদার্থ-প্রকাশক গ্রন্থ ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ এবং উপনিষদাদি নামে খ্যাত হইয়াছে। বেদের এক অর্থে 'ব্রহ্ম' বুঝায়, এই ব্রহ্ম বা বেদের ব্যাখ্যান যে গ্রন্থে আছে, তাহাকে ব্রাহ্মণ বলে। যাহা হউক, মহাত্মা কাত্যায়নাদি ভগবত্তত্ত্বজ্ঞগণ বলেন যে :—

"মন্ত্র ব্রাহ্মণয়ো র্বেদনামধেয়ম্ ॥"

অর্থাৎ বেদের মন্ত্রসংহিতা, এবং ব্রাহ্মণ, উপনিষদ বেদান্তাদি সমস্তকে এক কথায় বেদ বলা যায়, আমাদের মহাপ্রভুও এই মত সমর্থন করেন। অবশ্য মহাপ্রভুর মত বা ইচ্ছা অবিচিন্ত্য, তবে যুক্তিতর্কের দ্বারা যাহা বুঝা যায়; তাহাতে মনে হয়, তিনি শ্রীল প্রকাশানন্দকে শিক্ষাচ্ছলে আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, যথা :—

"প্রভু কহে বেদান্ত-সূত্র ঈশ্বর বচন।
ব্যাসরূপে কহিল যাহা শ্রীনারায়ণ॥
ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব।
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব॥
উপনিষৎ সহ সূত্র কহে যেই তত্ত্ব।
মুখ্যবৃত্তি সেই অর্থ পরম মহত্ত্ব॥"

ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, মহাপ্রভু যে কেবল মূলবেদ অর্থাৎ মন্ত্র-সংহিতাকে অপৌরুষেয় বা ঈশ্বরবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এমত নহে, উপনিষৎ এবং ব্রহ্মসূত্র পর্য্যন্তও তিনি ঈশ্বরবাক্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, কেমনা উপনিষৎ এবং ব্রহ্মসূত্র, ঋষিগণ নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা রচনা করেন নাই, পরন্তু ইহারা ভগবদাবেশপ্রাপ্ত হইয়া মূল-বেদার্থ প্রকাশ করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। আবার স্থানান্তরে এই প্রকাশানন্দকে শিক্ষাচ্ছলে জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, মূল-বেদ-প্রমাণ হইতে উপনিষদ্-প্রমাণ কখন শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না, যথা :—

"প্রণব সে মহাবাক্য বেদের নিদান।
ঈশ্বরস্বরূপ প্রণব সর্ব্ববিশ্বধাম॥
সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের প্রণব উদ্দেশ,
তত্ত্বমসি বাক্য হয় বেদের একদেশ॥
প্রণব মহাবাক্য তাহা করি আচ্ছাদন।
মহাবাক্যে করি তত্ত্বমসির স্থাপন॥
সর্ব্ববেদসূত্রে কহে কৃষ্ণের অভিধান।
মুখ্যবৃত্তি ছাড়ি কৈল লক্ষণা ব্যাখ্যান॥
স্বতঃ প্রমাণ বেদ প্রমাণ-শিরোমণি।
লক্ষণা করিলে স্বতঃ প্রমাণতা হানি॥"

ইহার ভাবার্থ এই যে, "তত্ত্বমসি" বাক্যকে মহাপ্রভু বেদের একদেশ অর্থাৎ প্রাদেশিক বাক্য বলিয়া লক্ষণা-দোষে দোষী করিতেছেন, কেন না, মূলবেদের কোন স্থানে এই তত্ত্বমসি বাক্য নাই, পরন্তু বেদের প্রাদেশিক অংশে অর্থাৎ উপনিষদে (ছান্দোগ্য) ইহা আছে, আর ওঁকার মূলবেদের

এবং উপনিষদের সর্ব্বস্থানেই আছে। মহাপ্রভু জগৎকে বুঝা-ইয়াছেন যে, মূলবেদের মুখ্যবৃত্তি অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া উপনিষদের "লক্ষণ" বা গৌণ অর্থ ধরিতে যাও কেন? ইহা দ্বারাই বুঝা যায় যে, মহাপ্রভু উপনিষদ অপেক্ষা মূল-বেদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতেছেন। যাঁহারা ইহা ভাল করিয়া বুঝিতে চাহেন, তাঁহারা উপরোক্ত পয়ারের মধ্যে যে যে স্থানে 'বেদ' শব্দ আছে, সেই সেই স্থানে বেদ অর্থে 'মূলবেদ' বলিয়া অর্থ করিলে, ইহার ভাব সহজে বোধগম্য হইবে।

এই প্রসঙ্গে যে সকল পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তি নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধির শক্তিতে অথবা সায়ন, মহীধরাদি অপর বিদ্বানের বিদ্যাবুদ্ধি-অনুমোদিত মূলবেদের ভাষ্যানুসারে বেদের ক্রিয়াকাণ্ডের মূল তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া, মূল-বেদকে অশ্লীল এবং জীবহিংসা-দোষে দোষী করেন, আর মূলবেদের ব্যাখ্যা স্বরূপ উপনিষৎ বেদান্ত দর্শন এবং তাহার বিস্তৃত ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থকে প্রামাণ্য বলিয়া প্রচার করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, কেননা, মূলবেদই যদি অসিদ্ধ হইল, তবে তাহার ভাষ্যও অসিদ্ধ হয়, এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্র ও মহাপ্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়, যেহেতু সমগ্র বেদের এক অংশ সত্য অপর অংশ মিথ্যা বলিলে, লক্ষণা করা হয়; এই প্রকার লক্ষণা করিলে বেদের স্বতঃপ্রমাণতা নষ্ট করা হয়, সুতরাং ইহা শাস্ত্রের ও মহাপ্রভুর বাক্যের বিরুদ্ধ। যাহা হউক, শ্রীমহাপ্রভু ইহার অতি পরিষ্কার মীমাংসা করিয়া জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন:—

"কৃষ্ণ কৃপালু অর্জ্জুনেরে লক্ষ্য করিয়া।
জগতেরে রাখিয়াছে উপদেশ দিয়া॥
পূর্ব্বে আজ্ঞা বেদ ধর্ম্ম কর্ম্ম যোগ জ্ঞান।
সব সাধি অবশেষে আজ্ঞা বলবান্॥
এই আজ্ঞাবলে ভক্তের শ্রদ্ধা যদি হয়।
সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করি সে কৃষ্ণ ভজয়॥"

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবদগীতা উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীসনাতনকে শিক্ষাচ্ছলে বেদের গূঢ় তাৎপর্য্য জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ অর্জ্জুনকে বেদ-বিহিত ধর্ম্ম-কর্ম্ম, পরে যোগ, পরে জ্ঞান ইত্যাদির বিষয় শিক্ষা দিয়া পরি-

শেষে ইহাদের মধ্যে সকল শিক্ষাকে যোবাযোগ করিয়া সর্ব্ব-ধর্ম্ম-কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবান্‌কে ভজনা করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। মূলবেদ সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ ঠিক এই প্রকার উপদেশ দিয়াছেন। বেদ-প্রকাশক ঋষিগণ মন্ত্রসংহিতার অর্থ জানিবার জন্য সমাধি-যোগে প্রথমতঃ যখন শ্রীভগবানের ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন ঋষিগণ শ্রীভগবানের নিকট হইতে মন্ত্রসংহিতার অর্থ যে প্রকার বুঝিয়াছিলেন, তাহাই কর্ম্মকাণ্ড অর্থাৎ তাহা হইতেই কর্ম্মের প্রাধান্য বুঝিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সময় যখন ঋষিগণ পুনরায় বেদার্থ বুঝিবার জন্য সমাধি-যোগে ঈশ্বরের ধ্যানে নিযুক্ত হন, তাহাতে তাঁহারা বুঝিলেন যে, মূলবেদের অর্থে যোগ-সাধনাই উক্ত সময়ের উপযুক্ত সাধনা এবং তাহার পরবর্ত্তী সময়ে ঋষিগণ উক্ত প্রকার সমাধিযোগে ধ্যানস্থ হইয়া বুঝেন যে, মূলবেদের অর্থে জ্ঞানই প্রধান। উপনিষদ্ এবং ষড়দর্শনাদি গ্রন্থ ঋষিদিগের ঐ প্রকার সমাধিযোগের ফল বলিয়া বুঝিতে হইবে; এজন্য এই সকল গ্রন্থ বেদের অঙ্গ এবং উপাঙ্গ নামে অভিহিত হইয়াছে। পরিশেষে বেদব্যাস শ্রীভগবানের আবেশে সর্ব্ববেদের বিশদব্যাখ্যা স্বরূপ, বিশেষতঃ বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া সর্ব্ববেদধর্ম্মের সারস্বরূপ ভগবদ্ধর্ম্মের মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিষয় ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ বিশেষ মনোযোগের সহিত পড়িতে হইবে। কৌতূহলাক্রান্ত পাঠকদিগের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে উহার কিছু উদ্ধৃত করা হইল, যথা :—

"প্রভু কহে আমি জীব অতি তুচ্ছজ্ঞান।
ব্যাসসূত্রের গম্ভীরার্থ, ব্যাস ভগবান্॥
তাঁর সূত্রের অর্থ কোন জীব নাহি জানে।
অতএব আপনে সূত্রার্থ করিয়াছে ব্যাখ্যানে॥
যেই সূত্রকর্ত্তা সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান।
তবে সূত্রের মূল অর্থ লোকের হয় জ্ঞান॥
প্রণবের যে অর্থ গায়ত্রীতে সেই হয়।
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবরিয়া কয়॥

ব্রহ্মাকে ঈশ্বর চতুঃশ্লোকী যে কহিল।
ব্রহ্মা নারদে সেই উপদেশ কৈল॥
নারদ সেই অর্থ ব্যাসেরে কহিল।
শুনি বেদব্যাস মনে বিচার করিল॥
এই অর্থ আমার সূত্রের ব্যাখ্যারূপ।
শ্রীভাগবত করির সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ॥
চারিবেদ উপনিষদ্ যত কিছু হয়।
তার অর্থ লঞা ব্যাস করিল সঞ্চয়॥
যেই সূত্রে যেই ঋক্ বিষয় বচন।
ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোক নিবন্ধন॥
অতএব সূত্রের ভাষ্য শ্রীভাগবত।
ভাগবত শ্লোক উপনিষদ্ কহে এক অর্থ॥"

ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে, মহাপ্রভু নিজে জগৎকে বুঝাইতেছেন যে, বেদের অর্থ মনুষ্যে বিদ্যা-বুদ্ধি-বলে বুঝিতে পারে না, কেন না, বেদ ভগবদ্বাক্য, বেদের অর্থ বেদ অর্থাৎ শ্রীভগবানের বাক্যে প্রকাশ হইবে। মন্ত্র-সংহিতা অর্থাৎ মূলবেদের অর্থসকল উপনিষদ প্রকাশ করিবে। এবং সমগ্র বেদের ভাষ্য-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের সহিত উপনিষদের কখন বিরোধ হইবে না, ইহাই মহাপ্রভুর ইচ্ছা বলিয়া মনে হয় *। এক্ষণে যাহা কিছু বলা হইল, তাহার সার কথা এই যে,শ্রীশ্রীমহাপ্রভু জীবদিগকে শিক্ষা দিতেছেন—"শেষ আজ্ঞা বলবতী"; এই মহানীতির অনুবর্ত্তী হইয়া সকলেরই কার্য্য করা একান্ত কর্ত্তব্য, তাই মহাপ্রভু প্রদর্শন করিতেছেন যে, শ্রীভগবান্ বেদপ্রদর্শক ঋষিগণ দ্বারা আমাদিগকে প্রথমতঃ বেদের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান, আদির শিক্ষা দিয়া, পরিশেষে তাঁহার "শেষ আজ্ঞা" অর্থাৎ "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকম্ শরণং ব্রজ" অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মকর্ম্ম যোগজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া ব্রজগোপিকাদিগের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে শ্রীভগবানে সম্পরিষক্ত অর্থাৎ সম্যক্ প্রকারে আসক্ত হইতে হইবে, ইহাই ভাগবতধর্ম্ম এবং জীবের পরম পুরুষার্থ।

---

* ১৪০ পৃষ্ঠায় 'বাদ প্রতিবাদ' শীর্ষক প্রস্তাবে বেদসম্বন্ধে অনেক বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহার সহিত এই প্রস্তাব মিলাইয়া পাঠ করিবেন।

বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়।

ভারতবর্ষের নানাপ্রকার উপাসক-সম্প্রদায়ের মধ্যে বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ও একটী বৈষ্ণব-সম্প্রদায়। শ্রীবল্লভাচার্য্য নামক একজন তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণ এই সম্প্রদায় প্রথম গঠন করেন। এই মহাপুরুষের জীবনী এবং ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে অনেক প্রকার অলৌকিক কিংবদন্তী আছে; সে সমস্ত বিষয়ের অবতারণা করা এই প্রস্তাবের বিষয় নহে। যাহা হউক, এই বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায় বাসুদেব কৃষ্ণকে ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণের অবতার জ্ঞান করিয়া তাঁহার উপাসনায় রত আছেন। এই বাসুদেব কৃষ্ণই বৃন্দাবনে গোপগোপীগণ সহ সমস্ত বৃন্দাবন লীলা করিয়াছেন এবং এই বাসুদেব কৃষ্ণই বৃন্দাবন হইতে আসিয়া কংস-বধ করিয়া মথুরায় রাজা হইয়াছিলেন বলিয়া ইঁহারা বিশ্বাস করেন। এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-বিলাস, স্মরণ-মনন করিবার জন্য গোকুল, বৃন্দাবন, রাধাকুণ্ড আদি স্থানে এবং অন্যান্য স্থানেও এই সম্প্রদায়ের লোকেরা দোল, ঝুলন, রাস ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের সকল প্রকার লীলার অনুসরণ করিয়া সেবার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অজ্ঞানতার দোষে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে বেদাদি সৎশাস্ত্র এবং সুসভ্য সমাজ-বিরোধী অনেক প্রকার অশ্লীল এবং বীভৎস আচরণ প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু বড়ই সুখের বিষয় এই যে, অনেক প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত এবং সুশিক্ষিত সুপণ্ডিতগণের প্রভাবে এই সম্প্রদায় দুইটী শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। এক শাখার লোকেরা এক্ষণ পর্য্যন্ত এত নির্ব্বোধ এবং এত সৎশাস্ত্রার্থানভিজ্ঞ যে, তাহারা তাহাদের গোঁসাইদিগকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান করিয়া, নিজেদের স্ত্রী, কন্যা এবং পুত্রবধূদিগকে সম্ভোগ করিতে দেয়; এই সমস্ত বিবরণ ১৬৮ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় শাখার লোকেরা অনেক সুশিক্ষিত, তাঁহারা প্রথম শাখাস্থ ব্যক্তিদিগকে বা তাঁহাদের গোঁসাইদিগকে "পুষ্টিমার্গী" বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দৃষ্টি করেন। এই দ্বিতীয় শাখার বল্লভাচারীগণ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থকে এবং বেদাদি সৎশাস্ত্রকে প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করেন। "অনুভাষ্য" নামে বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের একখানি বেদান্তের ভাষ্য দেখিতে পাওয়া যায়; যদি এই ভাষ্য স্বয়ং বল্লভাচার্য্যের রচিত হয়, তবে অনায়াসে অনুমান করা যায় যে, পুষ্টি-

মার্গীদিগের ব্রহ্ম-সম্বন্ধ এবং সমর্পণের যে সকল সংস্কৃত মন্ত্র উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা এক ব্যক্তির রচিত নহে অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন ব্যক্তির দ্বারা লিখিত নহে। কেননা, উক্ত মন্ত্রের রচনায় অনেক প্রকার ভাষার দোষ আছে। বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের লোকেরা যদি ইহা ভাল করিয়া বুঝিয়া থাকেন, তবে সভাসমিতি গঠন করিয়া, যাহাতে এই পুষ্টিমার্গিগণের কদাচার দূর হয়, তাহায় সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে,এই দ্বিতীয় শাখার অন্তর্গত যাঁহারা সুপণ্ডিত, তাঁহারাও গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের সিদ্ধান্ত, এক্ষণ পর্য্যন্ত ভাল করিয়া বুঝেন না। আশা করি, যদি বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ভগবত্তত্ত্ব-নিরূপণের বিচার ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, বেদাদি সৎশাস্ত্র বিশেষ ভাবে জগৎকে বুঝাইয়াছেন যে, ক্ষীরোদ-সমুদ্রশায়ী নারায়ণ স্বয়ং ভগবান্ নহেন, সুতরাং ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ অবতারপ্রাপ্ত হইয়া, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম-লক্ষ্মণ, কৃষ্ণ-বলরাম, বুদ্ধাদি যে কোন নামে আখ্যাপ্রাপ্ত হউন না কেন, বস্তুতঃ ইঁহারা ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণের মায়াবদ্ধ অংশ বা কলা মাত্র ; পরন্তু এই সকল অবতারগণ কখন মায়ার অধীশ্বর শ্রীভগবান্ আখ্যা প্রাপ্ত হইতে পারেন না। তাই বল্লভাচারী পণ্ডিতগণ ভাল করিয়া বুঝুন যে, যজুর্ব্বেদ পরিষ্কার ভাবে জগৎকে বুঝাইয়াছেন যে :—

অন্ধংতমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ।

ইহার বিশদার্থ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ; সংক্ষিপ্ত অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি পরমেশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতি অথবা প্রাকৃতিক পদার্থ বা মায়াবদ্ধ কোন জীব কিম্বা কোন দেবতার উপাসনা করে, তাহাকে ঘোর নরকে পতিত হইতে হয়।

এক্ষণে যাঁহারা বেদবাক্যকে ভগবৎ-বাক্য বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করেন অথবা যাঁহারা যুক্তিবিচার প্রামাণ্য বলিয়া বুঝেন, তাঁহারা বুঝুন যে,একমাত্র অবতারী শ্রীভগবান্ ব্যতীত অন্য কোন অবতার বা জীব বা দেবতা, জীবের উপাস্য হইতে পারে না—ইহাই স্বয়ং ভগবান্ জীবের প্রতি কৃপা করিয়া বেদে প্রকাশ করতঃ জগজ্জনকে শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্রীল শিশিরকুমার ঘোষ।

আধুনিক ভগবদ্ভক্তদিগের মধ্যে শ্রীল শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। প্রকৃত ভগবদ্ভক্তসুলভ, একমাত্র লোভের পরবশ হইয়া তাঁহাকে নানাপ্রকার সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভগবত্তত্ব অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ন্যায় তিনিও ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াও তৃপ্ত হইতে পারেন নাই, পরে তিনি ভগবৎ-কৃপা প্রাপ্ত হইয়া বুঝেন যে, একমাত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের মধ্যে পরমেশ্বরের নিগূঢ় সাধন-ভজনের প্রকৃষ্ট প্রণালী নাই। কিন্তু আজকাল বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের সূক্ষতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা নিতান্ত কঠিন কার্য্য। কেনারা, আউল, বাউল, সাহী, দরবেশ, সহজরসিক, কিশোরীসাধক ও কর্ত্তাভজা ইত্যাদি বহু সম্প্রদায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের সহিত বিমিশ্রভাবে থাকাতে, বিশুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মকে মলিনীকৃত করিয়া রাখিয়াছে। কি উপায়ে উক্ত ধর্ম্মকে উদ্ধার করিতে হইবে, কৃপালব্ধ শিশিরকুমার তাহার একজন পথ-প্রদর্শক। তাঁহার জীবনের অনেক কথা উল্লেখ করিয়া, একটী প্রবন্ধ লিখিয়া শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্ব-প্রচারিণী সভায় এই গ্রন্থকার পাঠ করেন, পরে উহা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দ-বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পাঠকগণের অবগতির জন্য উক্ত প্রবন্ধের অবিকল নকল এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা হইল, যথা—

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকা।

১৯শে মাঘ, ১৩১৭।

ডাঃ শ্রীপ্রিয়নাথ নন্দী মহাশয়ের প্রবন্ধ।

শ্রীল শিশিরকুমারের তিরোভাব।

গত ৮ই মাঘ রবি বার তারিখে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্ব-প্রচারিণী সভার সম্পাদক ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ নন্দী মহাশয় কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি উক্ত সভায় পঠিত হয়।

বিগত ২৬শে পৌষ মঙ্গলবার বেলা ১॥ ঘটিকায় পরে পরম ভাগবত শ্রীল শিশিরকুমার, বৈষ্ণব চূড়ামণি হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণের অনুরূপ, সজ্ঞানে, ধীর ও শান্ত মানসিক অবস্থায়, গৌরহরির নাম করিতে করিতে এবং তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে করিতে ও হস্তোত্তোলন করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে করিতে চিন্ময়রাজ্যে গমন করিয়াছেন। শ্রীল শিশিরকুমারের প্রাকৃতিক জগৎ হইতে চিন্ময় জগতে গমনের সময় তাঁহার হস্তের নাড়ী বা হৃৎযন্ত্রের বা শ্বাসযন্ত্রের কিম্বা মস্তিকের ক্রিয়ার কোন প্রকার ব্যতিক্রম হয় নাই; ইহাতে পণ্ডিত মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে, মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড এবং ফুসফুস্ এই তিনটী যন্ত্রের মধ্যে কোন একটীর ক্রিয়াহীন হইয়া লোকের মৃত্যু হয়, কিন্তু এই মহাপুরুষের তিরো-ভাবের এক মিনিট পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই তিনটী যন্ত্রের মধ্যে কোনটীরও ক্রিয়ার লোপ হয় নাই। ইহাতে বুঝিতে হইবে, শ্রীল শিশিরকুমার জীবকে "পরকাল-তত্ত্বজ্ঞান" শিক্ষা দিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আজীবন নানাভাবে এই পরকাল-তত্ত্ব শিক্ষা দিয়া তাঁহার একাত্তর বৎসর ছয়মাস বয়সে জীর্ণ শীর্ণ রুগ্ন প্রাকৃতিক দেহ, ভগবৎপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া কি প্রকারে ত্যাগ করা যায়, তাহাও তিনি অধম জীবগণকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। ইহা দ্বারা আমরা এই বিষয় শিক্ষা করিতে পারি যে, মনের ভগবন্মুখী মহান্ শক্তি বর্ত্তমান থাকিলে, প্রাকৃতিক বা দৈহিক শক্তি সে মনকে অভিভূত বা আয়ত্ত করিতে পারে না।

যাহা হউক, অদ্য রবিবার; অদ্য সেই মহাভাগবত শিশিরকুমারের শ্রাদ্ধের

দিন। শ্রাদ্ধ অর্থে, অধিকারী ভেদে শ্রদ্ধা করা, ভক্তি করা, উপাসনা করা বা গুণ বর্ণনা করা বুঝিতে হয়। শিশিরকুমারের এই মরজগৎ হইতে তিরোভাবের পর হইতে, দেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোকে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সর্ব্বস্থানে নানা-প্রকারে শোক-প্রকাশ করিতেছেন। সংবাদপত্র পাঠে জানা যায় যে, এই মহাপুরুষের জীবনী উল্লেখ করিয়া কেহ তাঁহাকে কর্ম্মবীর, কেহ ধর্ম্মবীর, কেহ রাজনীতিজ্ঞ, কেহ সুপণ্ডিত, কেহ সংবাদপত্রের শ্রেষ্ঠ সম্পাদক বলিয়া উল্লেখ করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেছেন। বাস্তবিক পক্ষে মহাপুরুষের জীবনী অবিচিন্ত্য, অর্থাৎ কোন বিশেষ ব্যক্তি কোন মহাপুরুষের সম্যক্ গুণ প্রকাশ করিতে পারে না। যাহা হউক, আমরা দীর্ঘকাল তাঁহার সহিত নিতান্ত নৈকট্যভাবে থাকিয়া বুঝিয়াছি, তিনি শ্রীভগবানের ঐকান্তিক ভক্ত ছিলেন। তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, দেশানুরাগাদি সর্ব্বগুণ, এই ভগবদ্ভক্তির আনুষঙ্গিক ছিল। যাঁহারা ভক্তিশাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জ্ঞাত আছেন যে, জীবে দয়া এবং নামে রুচি, ইহাই ভক্তের প্রথম ও প্রধান বিকাশ, অর্থাৎ যাঁহার জীবে দয়া নাই এবং সুস্থাসুস্থ অবস্থায় কালাকাল বিচার না করিয়া শ্রীভগবানের নাম স্মরণ করিতে যাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছা না হয়, তিনি ভগবদ্ভক্ত হইতে পারেন না। আবার ভক্তিশাস্ত্রের আর একটী উপদেশ এই যে,—

"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম কভু সাধ্য নয়।"

ইহার ভাবার্থ এই যে, যাঁহারা মনে করেন, বহিরঙ্গার সহিত মিশ্রিত না হইয়া, অন্তরঙ্গার সহিত ভজন সাধন করিলে, অথবা নির্জ্জন পাহাড় পর্ব্বতে গিয়া ভগবচ্চিন্তা করিলে অথবা প্রতিষ্ঠার ভয়ে সংবাদপত্রে বা পুস্তক লিখিয়া, কিম্বা সাধারণ সভাসমিতিতে বক্তৃতা প্রদান না করিলে, ইত্যাদি কোন প্রকারের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতে না পারিলে, শ্রীভগবানের অধিক কৃপা পাওয়া যায় না; ইহা ভক্তিশাস্ত্রবিরুদ্ধ; বস্তুতঃ ভগবৎপ্রেম সর্ব্বকালেই কৃপাসাধ্য। আমাদের আলোচ্য মহাপুরুষের জীবনী পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, তিনি শ্রীভগবানের কৃপালব্ধ পুরুষ ছিলেন। কৃপালব্ধ জীবের প্রথম বিকাশ—জীবে দয়া; এই দয়া হইতে দ্বিতীয় বিকাশ—নামে রুচি। এইজন্য শাস্ত্রে উল্লেখ আছে:—

"দয়া ধর্ম্ম মূলং"

কৃপালব্ধ শিশিরকুমারের যৌবন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রথমেই তাঁহার কৃপালব্ধ

ভক্তসুলভ দাস্যভক্তি বিকশিত হয়, তাই তিনি তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতি—বিশেষতঃ তাঁহার মাতার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিমান্ ছিলেন, এবং অনুরূপ কার্য্যও করিতেন। পরে তাঁহার মন, স্বীয় পরিবার এবং স্বীয় মাতৃসেবার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকে নাই। স্বগ্রামবাসী দরিদ্রদিগের কষ্ট দেখিয়া শিশিরকুমার নিতান্ত দুঃখিত হইতেন। গ্রামে ভাল বাজার ছিল না, ডাকঘর ছিল না, পীড়িতের ঔষধ প্রদান করিবার উপযুক্ত চিকিৎসক ছিল না। শিশিরকুমার সামান্য বেতনের স্কুল মাষ্টারের কার্য্য করিতেন, কিন্তু তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায়গুণে রাত্রদিন অকাতর পরিশ্রম করিয়া নানাপ্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করতঃ নিজ গ্রামে তাঁহার ভক্তিময়ী জননীর নামের স্মৃতিরক্ষা করিবার জন্য অমৃতবাজার নামে বাজার, ডাকঘর এবং একটী দাতব্য ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। পরে শ্রীল শিশিরকুমারের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভগবদ্দাস্যবৃত্তি আরও বিকশিত হইতে থাকে। তাই তাঁহার মন আর নিজ গ্রামের সামান্য গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রহিল না; তখন তিনি জেলা যশোহরের লোকের অবস্থায় নিতান্ত কাতর হইলেন। নীলকরদিগের অত্যাচারে লোক নিতান্ত প্রপীড়িত হইতেছিল, জমিদারদিগের কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য অত্যাচার, পুলিশের জুলুম ইত্যাদি নানা প্রকারে লোকের আর শান্তি ছিল না। সেই ঘোর দুর্দ্দিনে এই মহাপুরুষ স্কুলের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। তিনি বুঝিলেন, প্রজার শক্তি বৃদ্ধি করিতে না পারিলে, এই দুর্ব্বিসহ অত্যাচার হইতে কেহই নিস্তার পাইবে না। মহাপুরুষের এই চিন্তার ফলে প্রজাবর্গের মুখপত্র স্বরূপ "অমৃতবাজার" পত্রিকার সৃষ্টি হয়, এবং তিনি ঝিকরগাছায় মহামেলা করিয়া প্রজাশক্তি কি প্রকার মহান্ শক্তি, তাহা দেশস্থ লোকদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। যাঁহারা রাজনীতিক্ষেত্রে শিশিরকুমারের অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়াছেন এবং অমৃতবাজার পত্রিকার প্রজাতন্ত্র-নীতির ঘোষণা শ্রবণ করিয়া শতমুখে প্রশংসা করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহারা ভাল করিয়া বুঝুন যে, শ্রীল শিশিরকুমারকে রাজনীতিজ্ঞ বলিলে তাঁহার কোন প্রশংসা করা হয় না।

তিনি প্রকৃত ভগবৎ-সেবক ছিলেন। শিশিরকুমারের মহাপ্রভু, জগতের প্রভু,তাঁহার জীবের মঙ্গল বিধান করা শিশিরকুমারের জীবনের ব্রত ছিল। তাই

তিনি পার্থিব রাজসেবী বা চাকুরী-জীবী হইতে পারেন নাই। তিনি যৌবন-উপযোগী জীব-সেবায় নিযুক্ত হন, তাহাতে লোকসাধারণ তাঁহাকে রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া বুঝিয়াছিল। আর ইহার মধ্যে তিনি প্রেমানুরাগে পরম দেবতা শ্রীভগবানের দর্শন-লালসায় আকুলি ব্যাকুলি করিয়া, নানা প্রকার সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্বের ভিতর প্রবেশ করিতে করিতে, যখন একমাত্র শ্রীভগবানের উপাসনা বলিয়া আজকাল যে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচলন হইয়াছে, তাহাতে প্রবেশ করিলেন। তখন অনেকে তাঁহাকে ব্রাহ্ম বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীভগবানের চিরদাস শ্রীল শিশিরকুমার, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। তাহার প্রকৃত কারণ, বহুকাল পরে এই প্রবন্ধ-লেখকের প্রণীত এই পুস্তকের অবতরণিকায় এই মহাপুরুষ স্বহস্তে এই প্রকার লিখিয়াছেন, যথা—

"আমরা এক সময় পাকা ব্রাহ্ম ছিলাম; পরে দেখিলাম; ব্রাহ্মধর্ম্মে যাহা আছে, তাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মে আছে, কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্মে ব্রজের যে নিগূঢ় রস এবং মধুর সাধনা আছে, তাহা কোন ধর্ম্মে নাই।"

ইহার দ্বারা আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারি যে, শ্রীল শিশিরকুমার ভগবতত্ত্ব-পিপাসু হইয়া সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পরিশেষে যখন তিনি তাঁহার প্রাণনাথ শ্রীভগবানের জন্ত উৎকণ্ঠার চরমসীমায় পৌঁছিয়াছিলেন, দীনদয়াল দয়া করিয়া তখন তাঁহাকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন, তখন তিনি বুঝিতে পারেন যে,—

"নিত্যশুদ্ধ সদা মুক্ত বিভু ভগবান্"

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের একমাত্র উপাস্য। কিন্তু আউল, বাউল, সাঁই, দরবেশ এবং অজ্ঞান গুরু ও পুরোহিতগণ, নানাপ্রকার দুষ্কার্য্যের প্রশ্রয় দিয়া এই বৈষ্ণবধর্ম্ম এবং সমাজকে এপ্রকার কলুষিত করিয়াছে যে, নিতান্ত প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত, শুদ্ধ বৈষ্ণবতা, কি অপার্থিব পদার্থ, তাহা বুঝিতে সক্ষম হইতে পারেন নাই। এই জন্যই মহাত্মা রামমোহন রায় বহুভাষা শিক্ষা করিয়া, বহু সাম্প্রদায়িক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্বের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিয়া, ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে যে ধর্ম্মের স্থাপনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম উদ্ধারের অনেক সুবিধা হইয়াছিল। পরে তাঁহার

পরবর্ত্তী ব্রাহ্মাচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নানাপ্রকার শ্রুতি-প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বেদের ভিত্তির উপর ব্রাহ্মধর্ম্মকে যে প্রকার স্থাপন করয়া গিয়াছে, তাহাতেও আধুনিক শিক্ষিত লোকদিগকে বৈষ্ণব ধর্ম্ম বুঝাইবার অনেক সুবিধা হইয়াছে। কেন না, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্পূর্ণ বেদমূলক, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আমাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে যে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের অন্তর্গত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি; কেননা, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর এই পঞ্চবিধ ভাবের সাধনার অধিকার আছে, তাহার মধ্যে আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মদিগকে শান্তদাস্য-বিমিশ্রিত রসের অধিকারী বলিলে কোন দোষ হয় না।

মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভক্তিমার্গের উপদেশ তাঁহার শিষ্যগণ যে ভাবে প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে বুঝা যায় যে, পরমহংসদেব বিশুদ্ধ ভক্তিমার্গী ছিলেন না। পরন্তু তিনি জ্ঞানমিশ্র-ভক্তিপন্থী ছিলেন। তবে তাঁহার শিষ্যগণ ঘোষণা করেন যে, তিনি গোপীভাবের সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ শ্রীভগবানের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলেন। মহাপুরুষদিগের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নাই, তবে তাঁহার শিষ্যগণ যে ভাবের সাধনাকে গোপীভাব বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন, ভক্তিশাস্ত্রে তাহাকে গোপীভাব বলে না। পরমহংসদেবের শিষ্যদিগের মধ্যে যাঁহারা তাঁহার নিকট থাকিতেন, তাঁহারা এক্ষণে প্রচার করেন যে, পরমহংসদেব যখন গোপিভাবে সাধনা করিতেন, তখন স্ত্রীলোকসুলভ তাঁহার 'মাসিক ঋতু' হইত, এবং যখন তিনি হনুমানমন্ত্রে সাধনা করিতেন, তখন তিনি গাছে থাকিতেন, এবং সেই সময়ে তাঁহার একটী ছোট লেজ হইয়াছিল। পরমহংসদেবের একজন প্রধান শিষ্য শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ স্বামী বা 'পাহাড়িয়া বাবা' আমাদিগকে অনেকবার বলিয়াছেন যে, তিনি পরমহংসদেবের সঙ্গে থাকিয়া নিজে বরাবর ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। যাহা হউক, পরমহংসদেবের ভক্তগণ, যদি ভক্তিশাস্ত্রজ্ঞ হইতেন, তবে তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন যে, রাধাকৃষ্ণ প্রাকৃতিক ধীরললিত নায়কনায়িকা ভাবে আসক্ত নহে; বস্তুতঃ ইহা ভক্ত ভগবান্ ভাব অর্থাৎ—

"না সো রমণ না হাম রমণী"

এই প্রকার প্রেম-বিলাস বিবর্ত্তভাব।

এই প্রকার পরবর্ত্তী আধুনিক যে সমস্ত বৈষ্ণবাচার্য্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রচারিত উপদেশ, বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের উপদেশ বলিয়া গণ্য করা যায় না, কিন্তু আমাদের আলোচ্য মহাপুরুষ শ্রীল শিশিরকুমারের অমিয়-মাখা "অমিয় নিমাই-চরিত" এবং তাঁহার "কালাচাঁদ গীতা" যাঁহারা বিচার করিয়া পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন, শ্রীল শিশিরকুমার বিশেষ ঐশ্বরিক শক্তিপ্রভাবে তন্ত্র, পুরাণ, আউল, বাউল, পঞ্চরসিক, কিশোরী সাধক, ইত্যাদি বেদাদি সৎশাস্ত্র-বিরোধীদিগের কুহক-জাল হইতে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মকে উদ্ধার করিবার পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীল শিশিরকুমার সঙ্গীত-শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, তাই তাঁহার জীবনের শেষাংশ গৌরনাম-কীর্ত্তনে অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। মহা-পুরুষের জীবনী অনন্ত, তাই আমি একমুখে কত কি বলিব? এই মহাত্মা বৃন্দারণ্যবাসী গোস্বামিদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে গিয়া, গোপীভাবে কৃষ্ণ-প্রেম-রসপানে একেবারে মাতোয়ারা হইয়া উঠেন, তাই তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

পরে তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহার প্রাণনাথের মধুর হইতে সুমধুর রস একাকী আস্বাদন করিয়া তাঁহার মন তৃপ্ত হইতেছে না, এজন্য যাহার সহিত যে স্থানে দেখা হইত, তাহাকেই—দেশ, কাল, এবং পাত্রের বিচার না করিয়া—তাঁহার প্রাণেশ্বরের অমিয়মাখা প্রেম বিতরণ করিবার জন্য কত ব্যগ্র হইতেন, কত আর্ত্তি দেখাইতেন, কখন কাহারও গলা ধরিয়া কত রোদন করিতেন, কখন মান-লজ্জা-ভয় ত্যাগ করিয়া প্রকাশ্য রাজপথে আনন্দে নৃত্য করিতেন।

শ্রীল শিশিরকুমার শাস্ত্রের জটিল সিদ্ধান্তের মধ্যে সহজে প্রবেশ করিতে চাহিতেন না। তিনি ব্রজগোপিকাদিগের ন্যায় রাগমার্গের ধর্ম্মকর্ম্মত্যাগী সাধক ছিলেন। তাঁহার প্রাণেশ্বরের প্রেমরস পান করাই তাঁহার সর্ব্ব-ধর্ম্ম-কর্ম্মের সার ছিল। যিনি তাঁহার সহিত একবার আলাপ করিয়াছেন, তিনিও জ্ঞাত আছেন যে, তাঁহার প্রাণেশ্বর কি মধুর বস্তু, তাহা সর্ব্বসাধারণকে জানাইবার জন্য অহর্নিশ কত ব্যস্ত থাকিতেন। এই ব্যগ্রতা নিবন্ধন, তাঁহাকে রাজনীতি-ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। তাঁহার এই প্রকার ব্যগ্রতার

ফলে, তাঁহার প্রাণনাথের গুণ কর্ম্ম এবং স্বভাব, লোক সাধারণকে বুঝাইবার জন্য অতি সরল এবং সুমধুর ভাষায় "অমিয়নিমাই-চরিত" এবং "কালাচাঁদ গীতা" প্রচারিত হয় এবং সাময়িক সংবাদপত্রের স্তম্ভে অনেক প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল, অনেক সভা সমিতি করিতে হইয়াছিল, অনেক কীর্ত্তনের দল গঠন করিতে হইয়াছিল, বহুব্যক্তির শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু হইতে হইয়াছিল, এবং সহস্র সহস্র লোকের উপদেষ্টা হইতে হইয়াছিল। ইহা দ্বারা কেহ যেন মনে না করেন যে, শ্রীল শিশিরকুমার সাধারণ গুরুগিরি ব্যবসায়ীদিগের ন্যায় গুরুত্ব ব্যবসা করিতেন।

তিনি তাঁহার প্রাণনাথের নাম স্মরণকীর্ত্তনে সদাই প্রমত্ত থাকিতেন এবং সর্ব্বসাধারণকে বুঝাইয়া বলিতেন যে, তাঁহার প্রাণনাথের দর্শনপ্রাপ্তির জন্য যাগযজ্ঞ, যোগ-সাধনা, মন্ত্রপাঠ, সাধনা, জপ, তান্ত্রিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান, দীক্ষাগ্রহণ ইত্যাদি কোনও কার্য্যের অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই। তাঁহার প্রাণনাথ ভক্তাধীন, ঐকান্তিক-ভক্ত প্রাণের উচ্ছ্বাসে যে ভাবে তাঁহাকে স্মরণ, মনন, ধ্যান, ধারণাদি করিবে, তাঁহার প্রাণনাথ তাঁহার নিকট সেইভাবে দর্শন দিবেন।

এক্ষণে যাঁহারা সৎ-গুরুর কৃপায় বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা এই মহাপুরুষের জীবনী পাঠে বুঝুন যে, পরম ভাগবত শ্রীল শিশিরকুমার, বাস্তবিক ধর্ম্মকর্ম্মবর্জ্জিত ছিলেন, ভ্রমে পতিত হইয়া কেহ তাঁহাকে কর্ম্মবীর, কেহ ধর্ম্মবীর, কেহ বা দেশ-সেবক বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। প্রকৃত পক্ষে ইহা তাঁহার মুখ্য কর্ম্ম নহে, পরন্তু ইহা তাঁহার প্রাণনাথের প্রেম-সেবার আনুষঙ্গিক গৌণ ফল মাত্র। কেননা, তিনি কখন কর্ম্মের অনুরোধে কর্ম্ম করেন নাই, বা ধর্ম্মার্জ্জনের জন্য ধর্ম্ম করেন নাই। তবে তিনি তাঁহার প্রাণনাথের প্রেমানুরাগে তাঁহার মনোবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া যে সমস্ত চেষ্টা হইত বা করিতেন, লোক-সাধারণ তাহাই তাঁহার ধর্ম্ম বা কর্ম্মের অনুষ্ঠান বলিয়া বুঝিত।

শ্রীল শিশিরকুমার তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে 'Hindu Spiritual Magazine' নামক পরলোক-তত্ত্ব সম্বন্ধে একটী মাসিকপত্র প্রচার করেন। ইহাও তাঁহার প্রাণনাথের সুমধুর সেবার একটী আনুষঙ্গিক কার্য্য। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে,

ক্ষেত্র উর্ব্বরা না হইলে, তাহাতে বীজ বপন করিলে কখন বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া সুফল জন্মে না। আজকাল পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে দেশস্থ লোক-সাধারণের প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া জীবের নিত্যত্ব এবং শ্রীভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস হারাইয়াছে, তাই শ্রীল শিশিরকুমারের মনে এক অব্যক্ত ত্রাস বিদ্যমান থাকিত। জীবের নিত্যত্ব এবং পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মিলে, কেহ তাঁহার প্রাণনাথকে বুঝিতে পারিবে না, পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতার কর্ত্তৃক অনর্পিত তাঁহার প্রাণনাথের অযাচিত মধুর প্রেম কেহ গ্রহণ করিবার অধিকারী হইবে না, এই কারণে আমাদের আলোচ্য মহাপুরুষ, লোক সাধারণের দুর্ব্বোধ্য প্রাচ্যদর্শনশাস্ত্রের জটিল বিচারের ভিতর প্রবেশ না করিয়া, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণের সাহায্যে লোক সাধারণের বুঝিবার উপযোগী ভাষায়, অতি সহজ কথায়, এই পরলোকতত্ত্ব প্রচার করিতেছিলেন। ইহাতে তাঁহার কোন প্রকার অর্থ উপার্জ্জন হইত না, বরং প্রতি মাসে তাঁহাকে অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহন করিতে হইত।

যাহা হউক, অদ্য সেই মহাপুরুষের শ্রাদ্ধ অর্থাৎ শ্রদ্ধা করিবার দিন—শোক করিবার দিন। আমি অতি শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে জ্ঞাত করিতেছি যে, আমাদের এই "শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্ব-প্রচারিণী সভা" তাঁহারই সম্পূর্ণ সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাঁহারই সাহায্যে এই সভা প্রতিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়, তিনি জীর্ণ শীর্ণ রুগ্ন শরীরেও অসাধারণ অধ্যবসায় এবং যৌবনসুলভ উৎসাহের সহিত এই সভার সম্পাদকের কার্য্য করিতেন, এবং এই প্রাকৃতিক জগৎ হইতে তাঁহার তিরো-ধানের পূর্ব্বরাত্র পর্য্যন্ত এই সভা কি প্রকারে পরিচালিত করিতে হইবে, তাহার পরামর্শ প্রদান, ব্যক্তিবিশেষকে বিশেষ বিশেষ কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া, আমাদিগকে শোক-সাগরে নিমগ্ন করিয়া, যাঁহার নিকট হইতে তিনি জীব-শিক্ষা দিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাঁহার সেবার জন্য তাঁহার নিকট পুনর্গমন করিয়াছেন। এক্ষণে এই মহাপুরুষের সমস্ত মহৎ কার্য্যের অনুকরণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

সমাপ্ত।

বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব।

(সমালোচনা।)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-তত্ত্ব-প্রচারিণী সভার সম্পাদক

ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ নন্দী-প্রণীত।

মূল্য ১৲ টাকা, পরিশিষ্ট যন্ত্রস্থ।

একটী পরম ভাগবত এই পুস্তক পাঠ করিয়া লিখিয়াছেন, যথা—

"পৃথিবীতে যত রকম ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব থিয়সফিকেল সোসাইটী (Theosophycal Society) শিক্ষিত সমাজকে বিশদভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহার মধ্যে স্বামী দয়ানন্দ প্রমুখ আর্য্য সমাজ এই হিন্দুধর্ম্মের মূল ভিত্তিস্বরূপ বৈদিক শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব, জ্ঞানের বিচারে জগৎকে বিশদ ভাবে বুঝাইয়াছেন, কিন্তু প্রায় ৪৫০ শত বৎসর অতীত হইতে চলিল, শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সুদৃঢ় দার্শনিক যুক্তি দ্বারা এই বৈদিক শাস্ত্রের সারের সার জ্ঞানের চরমোৎকর্ষ ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠত্ব নানা রকমে জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন এবং পরাভক্তির "সাধন-প্রণালী" কি প্রকার প্রকৃষ্ট উপায়ে সাধন ভজন করিতে হয়, তাহাও তিনি নিজে ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া অযাচিত ভাবে জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন; কিন্তু এতকাল পর্য্যন্ত জৈন, বৌদ্ধ এবং তান্ত্রিকাদি সৎশাস্ত্র-বিরোধী মতের কুহকে তাহা সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছিল, তাই এতদিন পরে ডাক্তার নন্দী, তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা বলে অকাট্য বৈজ্ঞানিক যুক্তি, নির্ব্বিরোধ দার্শনিক বিচার এবং প্রচলিত অপৌরুষেয় বেদ প্রমাণ দ্বারা, এই সকল বেদাদি সৎশাস্ত্র-বিরোধী সম্প্রদায়ের কুহকজাল, যে প্রকার খণ্ড বিখণ্ড করিয়া, বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসকল উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে, তাঁহাকে মহাপ্রভুর কৃপাসিদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।"

বৈষ্ণব দাসানুদাস—

শ্রীপ্রেমানন্দ সরস্বতী।

ভক্তিপন্থীদিগের মধ্যে একটী উজ্জ্বলরত্নস্বরূপ দেশপূজ্য শ্রীল শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় বিশেষ আনন্দ সহকারে "বৈষ্ণবধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব" পাঠ করিয়া এই গ্রন্থের "সূচনা"-পত্রে নিজ হস্তে যে সমস্ত কথা লিখিয়াছেন, তাহার শেষ কথা এই যে,—

"যাঁহারা কৃপা করিয়া শ্রীমান্ প্রিয়নাথের গ্রন্থ পাঠ করিবেন, তাঁহারা বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের বুদ্ধির প্রভাব ও প্রাখর্য্য দেখিতে পাইবেন। দেখিবেন যে, অতি সূক্ষ্মতম তত্ত্বগুলি তাঁহাদের খেলার সামগ্রী ছিল। এই অকাট্য তত্ত্বগুলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শ্রীমান্ প্রিয়নাথের দ্বারা এই প্রথমে বাঙ্গালা-সাহিত্যে প্রচারিত হইল। সুতরাং আমি কর্ত্তব্যানুরোধে বাধ্য হইয়া স্বেচ্ছায় এই প্রস্তাব লিখিলাম। অনুরোধ করি যে, সাধারণে এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন।

বৈষ্ণব-দাসানুদাস—শিশিরকুমার ঘোষ।

শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শনাদি শাস্ত্রের সুবিখ্যাত অধ্যাপক, মাধ্বগৌড়েশ্বরাচার্য্য, বৃন্দাবনবাসী গোপালভট্টের পরিবার শ্রীশ্রীরাধারমণজীউর সেবাইত শ্রীল মধুসূদন গোস্বামী মহোদয় এই পুস্তক পাঠ করিয়া এই পত্র লিখিয়াছেন. যথা,—

"ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ নন্দী

ভক্তবরেষু—

অনেক আশীর্ব্বাদ। আপনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর একান্ত দাস। আপনার গুণগণ স্মরণ করিয়া সর্ব্বদাই আনন্দ-সাগরে ভাসিতে থাকি। আপনি যে "শ্রীবৈষ্ণব-ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব" নামক গ্রন্থ লিখিয়া জগতের উপকার করিয়াছেন, তাহা ভগবৎ-কৃপা ভিন্ন অসম্ভব। বিশেষতঃ স্মৃতি, তন্ত্রাদি শাস্ত্রকে অবহেলা করিয়া, বিশুদ্ধ বৈদিক ভাবে আপনি যে শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য! কারণ সমস্ত জীবন বেদের আলোচনা করিয়াও লোকে এই ভাবে বেদার্থের মীমাংসা করিতে পারেন না। বেদার্থ সম্বন্ধে আমার যেরূপ ভাবনা, আপনারও ঠিক সেইরূপ ভাব, বাস্তবিক শ্রীশ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্মই বেদার্থ, যাঁহারা শ্রীশ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্মে অবিশ্বস্ত, তাঁহাদের বেদার্থ বুঝিবার ক্ষমতা হয় না।"

* * * * *

শ্রীমধুসূদন গোস্বামী।

(এই পত্র অতি বিস্তীর্ণ, অপর জ্ঞাতব্য অংশ পরিশিষ্টে প্রকাশ করা হইয়াছে।)

শ্রীল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রিয়শিষ্য, আদি ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রধান আচার্য্য এবং আজীবন বেদ-উপনিষদ্-সেবী-ভক্তবর শ্রীল প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় এই পুস্তক পাঠ করিয়া লিখিয়াছেন, যথা—

"প্রিয় সুহৃৎ নন্দী মহাশয়!

আপনি বহু পরিশ্রমে বেদের প্রমাণ ও চৈতন্যচরিতামৃতের তত্ত্ব বিচার করিয়া আপনার "বৈষ্ণব ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব" গ্রন্থ লিখিয়াছেন। উপনিষদের "বাক্‌প্রাণে" রাধাকৃষ্ণের সূক্ষ্মতত্ত্ব স্থাপন আপনার এক নূতন সৃষ্টি। স্থূলদর্শী বৈষ্ণবগণ যদি

মনোনিবেশ পূর্ব্বক ইহা অবধারণ করেন, তবে তাঁহারা সাকার বিগ্রহাদির পূজা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের স্বরূপ তত্ত্বে উপনীত হইয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতে পারিবেন। উপাস্য উপাসকভেদে ব্রাহ্ম বৈষ্ণবে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। কেবল সচ্চিদানন্দ ও মৃৎবিগ্রহ লইয়া যে বিবাদ, আপনি সে বিবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যদি তুরীয় ব্রহ্ম হন এবং "স সেতুর্ব্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়" এই অর্থে তাঁহার ধাতৃত্ব বুঝায়, তবে আমার ব্রহ্ম ও আপনার কৃষ্ণ একই বস্তু,কেবল নামভেদ মাত্র। ঈশ্বরের ত কোন নাম নাই, তবে তাঁহার কথা ব্যক্ত করিতে একটা নাম না দিলে ব্যক্ত করা যায় না বলিয়াই কোন অর্থযুক্ত নামের অবলম্বন করিতে হয়। যাঁহার যে নামে রুচি, তিনি সেই নামেই ঈশ্বরকে ডাকিতে পারেন। আপনার সাধন-তত্ত্ব ও বৃন্দাবন-লীলার বর্ণনা এখনও বিশদ হয় নাই বলিয়াই বোধ হইল। দ্বিতীয় সংস্করণে ইহা আরও সরল করিলে সুখী হইব। আপনার বিজ্ঞান-চক্ষু বড়ই তেজস্কর বলিয়া আপনার গ্রন্থপাঠে আমোদিত হইয়াছি। আশীর্ব্বাদ করি, আপনার ধীশক্তি আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক।"

শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী।

"পল্লীবাসী"-সম্পাদক পরম ভাগবত শ্রীল শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই পুস্তক পাঠ করিয়া লিখিয়াছেন, যথা—

"ডাক্তার বাবু !

আমি পীড়িত ছিলাম। এক্ষণ পর্য্যন্ত নিতান্ত দুর্ব্বল আছি. এই অবস্থায় জনৈক পাঠক দ্বারা আপনার পুস্তক খানি পাঠ করাইয়া শুনিয়াছি। আপনি চিরবৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞানের দিক্ দিয়াই গৌর আপনাকে দেখা দিয়াছেন। ভক্তের প্রতি তাঁর এমনই কৃপা। একবার স্ফটিকস্তম্ভ ভেদ করিয়া তিনি দেখা দিয়াছিলেন। যে উদ্দেশ্যে পুস্তক রচিত হইয়াছে, তাহাতে কোন ত্রুটীই লক্ষিত হইল না। যুক্তি-বাদীর ভিতর০শ্রীগৌরভক্তি প্রচারের পক্ষে ইহা যে অতি মূল্যবান্ হইয়াছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। স্থানে স্থানে আপনার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া এই রুগ্ন শরীরে কতই না অশ্রুপাত করিয়াছি। আপনি ধন্য ! দীর্ঘজীবী হইয়া এইভাবে গৌরতত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন।"

শ্রীশশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আজীবন ভাগবত-সেবী শ্রীল লক্ষ্মীকান্ত গোস্বামী মহাশয় বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া) হইতে লিখিয়াছেন :—

"ডাক্তার ভায়া!

বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব" নামক গ্রন্থ আপনার একটি নূতন আবিষ্কার। দর্শন, বিজ্ঞান এবং বেদের এই প্রকার অকাট্য প্রমাণ দ্বারা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতা-

মৃত গ্রন্থকে সমর্থন করা যায়, ইহার পূর্ব্বে কেহ জানিতেন না ; আপনি মহাপ্রভুর কৃপালব্ধ, নচেৎ ইহা সম্ভবপর হয় না। শ্রীল শিশির বাবুর অমিয়-মাখা "অমিয় নিমাই চরিত" মহাপ্রভুর লীলা-বিলাস বর্ণনায় যে প্রকার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, আপনার "বৈষ্ণব ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব" আধুনিক সময় উপযোগী ঠিক সেই প্রকার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রন্থ। জাতি ধর্ম্ম বিচার না করিয়া শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রকেই অনুরোধ করি যে, শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কি অপার্থিব অনর্পিত কৃপা জীবগণকে দান করিয়া গিয়াছেন, তাহার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই গ্রন্থ পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন।

বৈষ্ণব-চরণ-প্রার্থী—

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত গোস্বামী।

অহর্নিশি সংকীর্ত্তন-রঙ্গে উন্মত্ত, আধুনিক সময়ের ভক্তকুলতিলক শ্রীল বসন্তকুমার দে মহাশয় ত্রিশ (ত্রিপুরা) হইতে লিখিয়াছেন :—

"সীতা দেবী অবিচারে এক ছড়া মুক্তাহার হনুমানকে উপহার দিয়া যেমন আপন মহানুভবতা দেখাইয়াছিলেন। আপনিও সেইরূপ ভবাদৃশ মূর্খকে মহারত্ন গ্রন্থখানি উপহার দিয়া আপন মহত্ত্ব দেখাইলেন।

আমাকে সম্বোধন করিয়াছেন—"দাদা ভাই," ইহা দেখিয়া চক্ষে জল আসিল, বুঝিলাম, ইহা আপনার ব্রজের ডাক।

শ্রীকৃষ্ণ নামের অর্থ যাহা বিজ্ঞান যুক্তিতে মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন, পাঠ করিয়া আনন্দে আমার পাঠ বন্ধ হইল, ক্ষণপরে ভাবিলাম, আজ প্রভু শিশির কুমার ঘোষ এই গ্রন্থ পড়িলে, প্রত্যেক যুক্তিতে ও অঁথরে অাঁথরে নাচিতেন। এই গ্রন্থের সমালোচনা তিনি করিলে গ্রন্থের উপযুক্ত মর্য্যাদা হইত।"

অধম—

শ্রীবসন্তকুমার দে।

Printed by Phanindra Kumar Banerjee.
At the Mohan Press.
2, Corries Church Lane, Calcutta.

ডাঃ পি, এন, নন্দী কৃত পুস্তকাবলী।

প্রাচ্য-তত্ত্ব-সমালোচনা।

আর্য্যঋষিগণ বহু সহস্র বৎসর গবেষণা করিয়া, মনুষ্যের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত, যে সমস্ত রীতিনীতি, আচার, ব্যবহার অবশ্যপ্রতিপাল্য বলিয়া স্থির করিয়া হিন্দুসমাজে প্রচলন করিয়া গিয়াছেন, এবং পাশ্চাত্য সংস্রবে ইহার মধ্যে যে সমস্ত রীতিনীতি আদি পরিবর্ত্তন হইয়া ব্যক্তিগত এবং সমাজগত স্বাস্থ্যভঙ্গ এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে, তাহার বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক বিচার দ্বারা প্রাচ্যের সহিত পাশ্চাত্যের তুলনায় সমালোচনা করিয়া, এই পুস্তকে বিশেষ ভাবে প্রদর্শন করা হইয়াছে। বঙ্গ-ভাষায় এই প্রকার গ্রন্থ এই প্রথম প্রকাশিত হইল। প্রায় ৬।৭ বৎসর অতীত হইতে চলিল, এই পুস্তকের অনেক বিষয় প্রবন্ধাকারে দৈনিক হিতবাদী সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

মূল্য—১৲ এক টাকা। ডাকমাশুল সহিত ১।০ এক টাকা চারি আনা।

উপদেশ-পত্রিকা ও পূজাপদ্ধতি।

যাঁহারা ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্বানুসন্ধান করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই অমূল্য পুস্তক শক্তি-সঞ্চারিণী রূপে কার্য্য করে। সাম্প্রদায়িক নির্ব্বিশেষে এই পুস্তক পাঠ করিলে সকলের ভগবদ্ভক্তির উদয় হইবেই হইবে। এই পুস্তক ১২ পেজি ডিমাই আকারে ২০৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

বিনামূল্যে বিতরিত, মাত্র ডাকমাশুলের জন্য ৵০ আনা গ্রহণ করা যায়।

শিশুর এবং রোগীর খাদ্যের

বৈজ্ঞানিক বিচার।

বিনামূল্যে বিতরিত। ডাকমাশুল ৴১০ অর্দ্ধ আনা মাত্র।

জ্বর-রোগ-চিকিৎসা সমালোচনা।

(যন্ত্রস্থ)

পুরাকালের আর্য্য-চিকিৎসকগণের মতের সহিত আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসকদিগের মতের তুলনায় সমালোচনা। বঙ্গভাষায় এই প্রকার পুস্তক এই প্রথম প্রকাশিত হইল।